বুদ্ধদেব গুহ সম্পাদিত

২৫টি ভয়ংকর বাঘ

গা-ছমছমে ভয়ংকর বাঘের গল্প শুনতে কে-না ভালোবাসে!

বনের রাজা বাঘ না হলেও, বাঘের চেহারা ও হাঁটা-চলার মধ্যে আছে আশ্চর্য রাজকীয় ব্যাপার। 'বাঘ' শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক শিহরণ জাগানো রোমাঞ্চ। সুন্দর রায়ের পুরুত ঠাকুরের মশাল হাতে বাঘের দিকে তেড়ে যাওয়া, কলমের কেরামতিতে সাপ-ব্যাং দিয়ে মজাদার বাঘ শিকার, যোশিপুরের ফরেস্ট অফিসার সরোজবাবুর খৈরি নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে আনা বাঘের বাচ্চা, ঋজুদার বন্দুকে লাওয়ালঙের বাঘ শিকার, বিধু দারোগার সেই কদম গাছে বেঁধে রাখা লাজুক বাঘের গল্পে ঠাসা এই বই।

শিবরাম চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, শৈলেন ঘোষ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বেদ রায়, এরকম পঁচিশজন লেখকের কলমে রোমাঞ্চকর পঁচিশটি মনকাড়া বাঘের গল্পের এই সংকলন।

জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলে থাকুক, অভয়ারণ্যের বাঘ থাকুক অভয়ারণ্যে। আমরা দুই মলাটের মধ্যে বন্দি পঁচিশটি বাঘের গল্প তুলে দিলাম মরমি পাঠকের হাতে।

২৫টি ভয়ংকর বাঘ

২৫টি ভয়ংকর বাঘ

সম্পাদনা

বুদ্ধদেব গুহ

পা রু ল

পারুল

পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ ২০১৩

© বুদ্ধদেব গুহ

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো
ধরনেরই প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না।
এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি
ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্য কোনোরকম বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এই বইটি কোনো ব্যক্তি অন্য
কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন না এবং বইটির অন্য
কোনো গ্রহীতার ক্ষেত্রেও তাঁকে এই একই
শর্ত আরোপ করতে হবে।

ISBN 978 93 82300 72 4

বর্ণ সংস্থাপন পারুল প্রকাশনী
জ্যোতি এন্টারপ্রাইজ ৩০এ ক্যানেল ইস্ট রোড কলকাতা ৭০০ ০১১ থেকে মুদ্রিত

১৫০.০০

সূচি

হর্ষবর্ধনের বাঘ শিকার ৭
কুঁদপুরের বাঘ ১৫
বুকের ওপরে বাঘ ২০
লাওয়ালঙের বাঘ ২৮
কানকাটা বাঘ ৩৯
বিধু দারোগা ৪৮
বাঘ মারি ৫৮
আতাপুরের বাঘ ৬৬
ডনের বাঘ ৭৮
ঘণ্টায় একশো ৮৪
মাস্টার প্রিন্স ৯২
ভুলের ওজন পঁচিশ পাউন্ড ১০৫
বুরুডিপাসের আতঙ্ক ১১৪
হালুম হুলুম ১২১
কিশোরীমোহনপুরের রয়েল বেঙ্গল ১২৭
তিনি যখন বাইরে ১৩৫
ঠাকুরদার বন্দুক ১৪৪
বান্ধবগড়ের রাজাসাহেব ১৫৩
নবীনের প্রতিশোধ ১৬৩
সেয়ানে সেয়ানে ১৭১
বাঘের বাড়ি ১৮৪
ফকির আলির হাত ১৯১
যেখানে বাঘের ভয় ১৯৭
বাঘের শখ ২০৮
মাছগুলো কোথায় পালিয়ে গেল ২১৬

শিবরাম চক্রবর্তী

হর্ষবর্ধনের বাঘ শিকার

হর্ষবর্ধনকে আর রোখা গেল না তারপর কিছুতেই। বাঘমারবার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন।

'আরেকটু হলেই তো মেরেছিল আমায়।' তিনি বললেন, 'ওই হতভাগা বাঘকে আমি সহজে ছাড়ছি না।'

'মারব ওকে। আমাকে মেরেছে আর ওকে আমি রেহাই দেব তুই ভেবেছিস?'

'তোমাকে আর মারল কোথায়? মারতে পারল কই?'

'একটুর জন্যই বেঁচে গেছি না! মারলে তোরা বাঁচাতে পারতিস আমায়?' গোবর্ধন চুপ করে থাকল, সে কথার কোনো জবাব দিতে পারল না।

'এই গোঁফটাই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে বলতে কী!' বলে নিজের গোঁফ দুটো তিনি একটু মুচড়ে নিলেন—'এই গোঁফের জন্যই বেঁচে গেছি আজ। নইলে ওই লোকটার মতোই হাল হত আমার।...'

গোবরা সে-কথারও কোনো সদুত্তর দিতে পারে না।

'এই চৌকিদার!' হঠাৎ তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'একটা বন্দুক যোগাড় করে দিতে পারো আমায়? যত টাকা লাগে দেব।'

'বন্দুক নিয়ে কী করবেন বাবু?'

'বাঘ শিকার করব, আবার কী? বন্দুক নিয়ে কী করে মানুষ?' বলে আমার প্রতি ফিরলেন: 'আমার এই বীরত্ব কাহিনিটাও লিখতে হবে আপনাকে। যত সব আজেবাজে গল্প লিখছেন আমাকে নিয়ে। লোকে পড়ে হাসে কেবল। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে শুনেছি।'

'তার কী হয়েছে? লিখে দেব আপনার শিকার-কাহিনি। এই বাঘ মারার গল্পটাই লিখে দেব আপনার। কিন্তু তার জন্য বন্দুক ঘাড়ে এত কষ্ট করে প্রাণপণে বাঘ মারতে হবে কেন? বনেবাদাড়েই বা যেতে হবে কেন? বাঘ মারতে এত হাঙ্গামার কী মানে আছে? বন্দুকের কোনো দরকার নেই। সাপ ব্যাং একটা হলেই হল। কলমের কেরামতিতে সাপ ব্যাং দিয়েই বাঘ মারা যায়।'

'মুখেন মারিতং বাঘং?' গোবরা টিপ্পনী কাটে।

'আপনি টাকার কথা বলছেন বাবু।' চৌকিদার এতক্ষণ ধরে কী যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, মুখ খুলল এবার—'তা টাকা দিলে এনে দিতে পারি একটা বন্দুক—দু-দিনের জন্য। আমাদের দারোগা সাহেবের বন্দুকটাই চেয়ে আনতে পারি। বাঘের ভারি উপদ্রব হয়েছে এধারে—মারতে হবে বাঘটাকে—এই বললেই তিনি ওটা ধার দেবেন আমায়। ব্যাভারের পর আবার ফেরত দিয়ে আসব!'

'শুধু বন্দুক নিয়ে কী করব শুনি? ওর সঙ্গে গুলি কার্তুজ টোটা ইত্যাদি এসবও তিনি দেবেন তো? নইলে বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে কি বাঘ মারা যায় নাকি? তেমনটা করতে গেলে তার আগেই বাঘ আমায় সাবড়ে দেবে।'

'তা কি হয় কখনো? বন্দুকের সঙ্গে কার্তুজ-টার্তুজ দেবেন বই কী বাবু।'

'তাহলে যাও, নিয়ে এসো গে চটপট। বেশি দেরি কোরো না। বাঘ না মেরে নড়ছি না আমি এখান থেকে। জলগ্রহণ করব না আজ।'

'না না, বন্দুকের সঙ্গে কিছু খাবার-টাবার নিয়ে এসো ভাই।'

আমি বাতলাই, 'খালি পেটে কি বাঘ মারা যায়? আর কিছু না হোক, একটু গাঁজা খেতে হবে অন্তত।'

'আনব নাকি গাঁজা?' সে শুধায়!

'গাঁজা হলে তো বন্দুকের দরকার হয় না। বনেবাদাড়ে ঘুরে মরতে হয় না। বন্দুকের বোঝা বইবার প্রয়োজন করে না। ঘরে বসেই বাঘ মারা যায় বেশ।' আমি জানাই।

'না না, গাঁজা-ফাঁজা চাই না। বাবু ইয়ার্কি করছে তোমার সঙ্গে। তুমি কিছু রুটি মাখন বিস্কুট চকোলেট—এইসব এনো, পাও যদি।' গোবরা বলে দেয়।

বন্দুক এলে হর্ষবর্ধন আমায় শুধাল—'কি করে বাঘ মারতে হয় আপনি জানেন?'

'বাগে পেলেই মারা যায়। কিন্তু বাগেই পাওয়া যায় না ওদের। বাগে পাবার চেষ্টা করতে গেলে উলটে নাকি বাঘেই পায়।'

'বনের ভিতর সেঁধুতে হবে বাবু।' চৌকিদার জানায়।

বনের ভিতরে পা বাড়াতে প্রথমেই যে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করল সে কোনো বাঘ নয়, বাঘের বাচ্চাও না, আস্ত একটা কোলা ব্যাং।

ব্যাং দেখে হর্ষবর্ধন ভারি খুশি হলেন, বললেন, 'এটা শুভ লক্ষণ। ব্যাং ভারি পয়া, জানিস গোবরা?'

'মা লক্ষ্মীর বাহন বুঝি?'

'সে তো প্যাঁচা।' দাদা জানান—'কে না জানে!'

'তাহলে ব্যাং বুঝি সিদ্ধিদাতা গণেশের, না, না...' বলে গোবরা শুধরে নেয়—'সে তো হল গে ইঁদুর।'

'আমি পয়া বলছি কারো বাহন-টাহন বলে নয়। নিজের অভিজ্ঞতায়। আমরা প্রথম যখন কলকাতায় আসি, তোর মনে নেই গোবরা? ধরমতলায় একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।'

'মনে আছে। পেয়েই তুমি সেটা পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিলে, পাছে কারো নজরে পড়ে। তারপর বাড়ি এসে খুলে দেখতে গিয়ে দেখলে...'

'দেখলাম যে চারটে ঠ্যাং। মানিব্যাগের আবার ঠ্যাং কেন রে? তারপর ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি কী, ওমা, ট্রাম গাড়ির চাকার তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ব্যাং একটা।'

'আর কিছুতেই খোলা গেল না ব্যাগটা।'

'গেল না বটে, কিন্তু তারপর থেকেই আমাদের বরাত খুলে গেল। কাঠের কারবারে ফেঁপে উঠলাম আমরা। আমরা এখানে টাকা উড়িয়ে দিতে এসেছিলাম। কিন্তু টাকা কুড়িয়ে থই পাই না তারপর।'

'ব্যাং তাহলে বিশ্বকর্মার বাহন হবে নির্ঘাত।' গোবরা ধারণা করে, 'যত কারবার আর কারখানার কর্তা ওই ঠাকুরটি তো। কী বলেন মশাই আপনি? ব্যাং বিশ্বকর্মার বাহনই তো বটে?'

'ব্যাংটাকে দেখে একটা গল্পের কথা মনে পড়ল।' আমি বলি—'জামপিং ফ্রগের গল্প। মার্ক টোয়েনের লেখা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম গল্পটা।'

'মার্ক টোয়েন মানে?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন।

'এক লেখকের নাম। মার্কিন মুলুকের লেখক।'

'আর জামপিং ফ্রগ?' গোবরার জিজ্ঞাসা।

'জামপিং মানে লাফানো, আর ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাং। মানে যে ব্যাং কিনা লাফায়।'

'লাফিং ফ্রগ বলুন তাহলে মশাই।'

'তাও বলা যায়। গল্পটা পড়ে আমার হাসি পেয়েছিল তখন। তবে ব্যাঙের পক্ষে ব্যাপারটা তেমন হাসির হয়েছিল কিনা আমি জানি না। গল্পটা শুনুন এবার। মার্ক টোয়েনের সময়ে

সেখানে ঘোড়দৌড়ের মতন বাজি ধরে ব্যাঙের দৌড় হত। লাফিয়ে লাফিয়ে যার ব্যাং আর সব ব্যাং-কে টেক্কা দিতে পারত সেই মারত বাজি। সেইজন্যে করত কী, অন্য সব ব্যাং-কে হারাবার মতলবে যাতে তারা তেমন লাফাতে না পারে—লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তো—সেইজন্য সবার আড়ালে এক একটাকে পাথরকুচি খাইয়ে বেশ ভারী করে দিত কেউ কেউ।'

'খেত ব্যাং সেই পাথরকুচি?'

'অবোধ বালক তো! যাহা পায় তাহাই খায়।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন।

'পরীক্ষা করে দেখলেই হয়।' গোবরা বলে: 'এই তো পাওয়া গেছে একটা ব্যাং—এখন বাজিয়ে দেখা যাক না খায় কি না।'

গোবরা কতকগুলো পাথরকুচি জোগাড় করে এনে গেলাতে বসল ব্যাংটাকে। হাঁ করিয়ে ও মুখের কাছে কুচি ধরে দিতেই, কী আশ্চর্য, তক্ষুনি সে গোপালের ন্যায় সুবোধ বালক হয়ে গেল। একটার পর একটা গিলতে লাগল টুপটাপ করে। অনেকগুলো গিলে ঢাউস হয়ে উঠল ওর পেট।

তারপর মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে রইল ব্যাংটা। ভারিক্কি দেহ নিয়ে লাফানো দূরে থাক, নড়াচড়ার কোনো শক্তি রইল না তার আর।

'খেলো তো বটে, খাওয়ালিও তো দেখলাম, ব্যাটা এখন হজম করতে পারলে হয়।' দাদা বললেন।

'খুব হজম হবে। ওর বয়সে কত পাথর হজম করেছি দাদা।' গোবরা বলে: 'ভাতের সঙ্গে এতদিন যত কাঁকর গিলেছি, ছোটোখাটো একটা পাহাড়ই চলে গেছে আমাদের গর্ভে। হয়নি হজম?'

'আলবাত হয়েছে।' আমি বলি: 'হজম না হলে তো যম এসে জমত।'

'ওই দেখো দাদা!' আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে গোবরা।

আমরা দেখি প্রকাণ্ড একটা সাপ, গোখরোই হবে হয়তো, এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

চৌকিদার বলে—'একটুও নড়বেন না বাবুরা। নড়লেই সাপ এসে ছোবলাবে। আপনাদের দিকে নয়, ব্যাংটাকে নিতে আসছে ও।'

আমরা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাই বটে। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে ব্যাংটাকে এসে আত্মসাৎ করল।

সাপটা এগিয়ে এসে ধরল ব্যাংটাকে, তারপর এক ঝটকায় লহমার মধ্যে মুখের ভেতর পুরে ফেলল। তারপর গিলতে লাগল আস্তে আস্তে।

আমরা দাঁড়িয়ে ওর গলাধঃকরণ লীলা দেখতে লাগলাম। গলা দিয়ে পুরুষ্ট ব্যাংটা তার তলার দিকে চলতে লাগল, খানিকটা গিয়ে থেমে গেল এক জায়গায়, সেইখানেই আটকে রইল, তারপর সাপটা যতই চেষ্টা করুক না, সেটাকে আর নামাতে পারল না। পেটের ভেতর ঢুকে ব্যাংটা তার পিঠের উপর কুঁজের মতো উঁচু হয়ে রইল।

উটকো ব্যাংটাকে গিলে সাপটা উট হয়ে গেল যেন শেষটায়। তার মুখখানা যেন কেমনতর হয়ে গেল। ...তারপর তার আর কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

'ছুঁচো গেলার চেয়েও খারাপ দশা হয়েছে সাপটার, বুঝলে দাদা? সাপের পেটে ব্যাং, আর ব্যাঙের পেটে যত পাথরকুচি। আগে ব্যাং পাথরকুচিগুলো হজম করবে, তারপর সে হজম করবে ব্যাংটাকে। সে বোধহয় আর ওদের এজন্মে নয়।'

'ওদের কে কাকে হজম করে দেখা যাক। আমরাও খেতে বসি এধারে।'

চৌকিদারের আনা মাখন-রুটি ইত্যাদি খবরকাগজ পেতে খেতে বসে গেলাম। সাপটার অদূরেই বসা গেল। সাপটা মার্বেলের গুলির মতন তালগোল পাকিয়ে পড়ে রইল আমাদের পাশেই।

এমন সময় জঙ্গলের ওধারে একটা খসখসানি আওয়াজ পাওয়া গেল। 'বাঘ এসে গেছে বাবু।' চৌকিদার বলে উঠল। শুনেই না আমরা তাকিয়ে দেখি সত্যিই ঝোপঝাড়ের আড়ালে বাঘটা আমাদের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে।

'রুটি মাখন-টাখন শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গেল দেখছি।' দেখে আমি দুঃখ করলাম।

'কী করে যাবে? আমরা চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছি না সব, ওর জন্যে রেখেছি নাকি?' বলল গোবরা পাঁউরুটির শেষ চিলতেটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে।

'যেমন করে পাথরকুচিগুলো সাপের পেটে গেছে ঠিক সেই ভাবে।' আমি বিশদ করি।

'এক গুলিতে সাবাড় করে দিচ্ছি না ব্যাটাকে। দাঁড়ান না।' বলে হর্ষবর্ধন হাতে কী একটা তুললেন, 'ওমা! এটা যে সাপটা।' বলেই কিন্তু আঁতকে উঠলেন—'বন্দুকটা গেল কোথায়?'

'বন্দুক আমার হাতে বাবু।' বলল চৌকিদার: 'আপনি তো আমার হাত থেকে নেননি বন্দুক। তখন থেকেই আমার হাতে আছে।'

'তুমি বন্দুক ছুড়তে জানো?'

'না, বাবু, তবে তার দরকার হবে না। বাঘটা এগিয়ে এলে এই বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে ওর জান খতম করে দেব। আপনারা ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে হাতে সাপটাকেই তিন পাক ঘুরিয়ে ছুড়ে দিয়েছেন বাঘটার দিকে।

সাপটা সবেগে পড়েছে গিয়ে তার উপর। কিন্তু তার আগেই না, কয়েক চক্কর পাক খেয়ে, সাপের পেটের থেকে ছিটকে ব্যাংটা আর ব্যাঙের গর্ভ থেকে যত পাথরকুচি তিরবেগে বেরিয়ে—ছররার মতো বেরিয়ে লেগেছে গিয়ে বাঘটার গায়ে—তার চোখে-মুখে-নাকে।

হঠাৎ এই বেমক্কা মার খেয়ে বাঘটা ভিরমি খেয়েই যেন অজ্ঞান হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আর তার নড়াচড়া নেই।

'সর্পাঘাতে মারা গেল নাকি বাঘটা?' আমরা পায়ে পায়ে হতজ্ঞান বাঘটার দিকে এগোলাম।

চৌকিদার আর দেরি না করে বন্দুকের কুঁদায় বাঘটার মাথা থেঁতলে দিল। দিয়ে বলল—'আপনার সাপের মারেই মারা পড়েছে বাঘটা। তাহলেও সাবধানের মার নেই বাবু, তাই বন্দুকটাও মারলাম তার মাথার ওপর।'

'এবার কী করা যাবে?' আমি শুধাই: 'কোনো ফোটো তোলার লোক পাওয়া গেলে বাঘটার পিঠে বন্দুক রেখে দাঁড়িয়ে বেশ পোজ করে ফোটো তোলা যেত একখানা।'

'এখানে ফোটোওলা কোথায় বাবু এই জঙ্গালে? বাঘটা নিয়ে গিয়ে আমি ভেট দেব দারোগাবাবুকে। তাহলে আমার ইনামও মিলবে—আবার চৌকিদার থেকে এক চোটে দফাদার হয়ে যাব আমি—এই বাঘ মারার দরুন। বুঝলেন?'

'দাদা করল বাঘের দফারফা আর তুমি হলে গিয়ে দফাদার।'

গোবরা বলল—'বারে!'

'সাপ-ব্যাং দিয়েই বাঘ শিকার করলেন আপনি দেখছি!' আমি বাহবা দিলাম ওর দাদাকে।

লীলা মজুমদার

কুঁদপুরের বাঘ

কলকাতা থেকে রওনা হয়ে যদি কেউ নৌকা করে, আস্তে আস্তে, থামতে থামতে, এই ধর শীতের সময়, কিংবা শীতের ঠিক আগেই, বা ঠিক পরেই, একেবারে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত যায়, তাহলে তার এমন সব অভিজ্ঞতা হবার সম্ভাবনা আছে, যার ফলে সে আর আগের মানুষ থাকবে না। বড়ো বড়ো তীর্থস্থানের কথা বলছি না; সেখানে গেলে কেউ বদলায় না। ছোটো ছোটো জায়গায় যেতে হবে, ডায়মন্ডহারবার আর ফ্রেজারগঞ্জ ছাড়িয়ে যাবার পর। ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত কলকাতার দৌড়; তারপর থেকেই জায়গাটা বদলাতে শুরু করে।

৩০০ বছর আগেও অবিশ্যি কলকাতা পর্যন্ত তার বিস্তার ছিল। চেরাঙ্গীবাবার বনের মধ্যে দিয়ে কালীঘাট যাবার পথে বাঘ এসে প্রায়ই দু-চারটে তীর্থযাত্রী ধরে নিয়ে যেত। গঙ্গাসাগর পৌঁছোবার আগেই যদি অন্ধকার হত, তো মাঝগাঙে নৌকা নোঙর করে রাত কাটাতে হত। নৌকাতে একটা বড়ো মশাল সারারাত জ্বলত। বনের জানোয়ার আগুনকে যেমন ভয় করে, তেমন আর কিছুকে নয়। তবু নাকি এক একটা দুঃসাহসিক বাঘ সাঁতার কেটে, নৌকা থেকে মানুষ টেনে নিয়ে যেত।

আমার পঞ্চুকাকা পোর্ট কমিশনারে লঞ্চে কাজ করতেন, তাঁর কাছে নানান রোমাঞ্চকর গল্প শুনতাম। একবার আমাদের পাশের বাড়ির ঠানদিদি এইসব গল্প বলার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে বসলেন, 'তা হতে পারে, কিন্তু ওগুলো সত্যি বাঘ নয়। সত্যি বাঘ বেড়ালের মতো। ওরা জল পছন্দ করে না।'

পঞ্চুকাকা বিরক্ত হলেন। 'আপনি এত কথা কী করে জানলেন? তা ছাড়া সত্যি বাঘ নয়তো কি কেউ বাঘ সেজে আসে নাকি?'

ঠানদিদি বললেন, 'কুঁদপুরে আমার বাপের বাড়ি, আমি জানব না তো কে জানবে বলো? কেউ বাঘ সাজে না; বাঘ সাজতে পয়সা লাগে, ওরা কেউ চারটে পয়সারও মালিক নয়। বাঘ সাজে না কেউ! বাঘ হয়ে যায়।'

তাই শুনে সকলে খুব হেসেছিল। ঠানদিদি চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি, বিশ্বাস হল না বুঝি? কতটুকুই বা জানো তোমরা। কুঁদপুরের ছোটো ছেলেরাও তার চেয়ে বেশি জানে। আমাদের গাঁয়ে সুন্দর রায়ের মন্দির আছে। হাজার বছরের পুরোনো। সুন্দর রায়ের মন্দিরে মূর্তি থাকে না, কিন্তু রোজ পুজো দিতে হয়। তাঁর বেজায় দাপট। তিনি যেমন বাঘদের দেশের মানুষদের দেবতা, তেমনি বাঘদেরও দেবতা। কাজেই সেখানকার মানুষ যে বাঘ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?'

'কিন্তু মানুষের বাঘ হওয়ার চেয়েও ঢের বেশি ভয়াবহ ব্যাপার বাঘের মানুষ হওয়া। কারণ তাকে চেনা যায় না। মানুষ বাঘ বেজায় বেঘো হয়। কিন্তু বাঘ-মানুষ পরম সাত্ত্বিক হয়।'

বলা বাহুল্য, ঠানদিদির কথা শুনে আমরা একেবারে থ! ঠানদিদি বলে চললেন, 'আজকাল তোমাদের বৈজ্ঞানিকরা কলের মানুষ বানিয়ে তাদের দিয়ে হিসাব কষিয়ে তোমাদের তাক লাগিয়ে দেয়! আমার কিন্তু হাসি পায়। ছোটোবেলায় আমাদের গাঁয়ে হামেশাই যা হতে দেখেছি সেসব কথা বললে তোমাদের পিলে চমকে যাবে।'

অমনি সবাই চ্যাঁচাতে লাগল, 'বলুন, বলুন।'

ঠানদিদি আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন।

'মনে থাকে যেন, এসব আমার খুব ছোটোবেলার কথা, কাজেই কিছু কিছু ভুলও হতে পারে। আমাদের পাশের বাড়িতে সুন্দর রায়ের পুরুত ঠাকুর থাকতেন। ওই মাছ-মকরের দেশ, যেখানে রুই-কাতলাকে লোকে নিরামিষ বলে, নালা-নর্দমাতে হাত গলালেই এই বড়ো বড়ো বাগদা উঠে আসে; সেইখানে ওই বুড়ো স্বপাকে হবিষ্যি রেঁধে খেতেন। তাঁর একটা ছোটো শাকের খেত ছিল। তিনি নিজে সেটার দেখাশুনো করতেন।'

একদিন সন্ধ্যেবেলায় পুজো সেরে বাড়ি ফিরছেন, দেখেন একটা বাঘ তাঁর শাকের খেতে ঢুকেছে। পুরুত ঠাকুরের কিন্তু ব্যাপার বুঝতে বাকি রইল না। অমনি তিনি মশাল হাতে বাঘের দিকে তেড়ে গেলেন। বাঘ একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই এক দৌড়ে তাঁর গোয়ালঘরে গিয়ে ঢুকল। গোয়ালঘরে পুরুত ঠাকুরের বদমেজাজি বুড়ো বলদ থাকত। পুরুত ঠাকুর অমনি মুচকি হেসে গোয়ালঘরের লোহার আগল তুলে দিয়ে এলেন। তাঁর ঘর নিকোতো পাদুর বউ; সে তো কাণ্ড দেখে অবাক। উঠিপড়ি করে গাঁয়ে গিয়ে খবরটা রটাতে তার বেশি সময় লাগেনি। পরদিন সকালে গোয়ালঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে সবাই দেখে বুড়ো বলদ যেমন ছিল তেমনি আছে; বাঘ-ফাগ কিছু নেই। পাদুর বউ গোয়ালঘরের দোর খুলে গোবর বের করে, ঘর-উঠোন নিকিয়ে, পুরুত ঠাকুরের রান্নার কাঠ জড়ো করে রেখে বাড়ি চলে গেল।

গাঁয়ে গিয়ে শুনল হরু গয়লার ছেলে নাকি পুরুত ঠাকুরের বাড়ি থেকে দুটো শাক তুলেছিল বলে, পুরুত তাকে গোয়ালঘরে বন্ধ করে 'নেই' করে দিয়েছে। হরু গঞ্জে গিয়ে নালিশ করেছে। মামলার দিন গাঁসুদ্ধু সব মজা দেখতে গেল। পাদুর বউ যেচে গিয়ে সাক্ষী দিল যে হরুর ওই ড্যাকরা ছেলেকে পুরুত মোটেই কিছু করেনি, গোয়ালে একটা বাঘকে বন্ধ করেছিল।

হাকিম বললেন, 'কোথায় সে বাঘ? তাকে দেখাও।'

পাদুর বউ বলল, 'সে তো দেখলাম নেই।'

হরু কেঁদে পড়ল, 'ওই তো হল, ধর্মাবতার, আমার ছেলে আর বাঘ কি আলাদা হল নাকি?'

হাকিম ছিলেন সায়েব। তিনি মুখ্যু গ্রামের লোকদের কথা শুনে মহা রেগেমেগে কেস বাতিল করে দিলেন। তারপর গাঁয়ের মাতব্বরদের খুব বকাবকি করলেন। হাকিমের সময়ের কি দাম নেই নাকি? আর এই বেচারা ভদ্রলোক, পুজো করে দিন কাটান, এঁকে এমন হেনস্থা করবার মানেটা কি? ওই হরুকেই সাজা দেওয়া উচিত ছিল। মানুষ কখনো বাঘ হয়? নাকি বাঘ মানুষ হয়? যত সব মুখ্যু কোথাকার—কি হল?

পুরুত ঠাকুর হঠাৎ রুখে উঠে, হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'ও-ও মানুষ বাঘ হয় না আর বাঘ মানুষ হয় না, এই তোমার বিদ্যে! গাঁউক!' এই বলে ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে, ল্যাজ দুলিয়ে, এক লাফে বনের দিকে দৌড় দিলেন। আদালত-সুদ্ধু সকলে সুন্দর রায়ের জয়ধ্বনি দিল। সেই ইস্তক পুরুত-ঠাকুরকে আর কেউ চোখে দেখেনি। আজ পর্যন্ত কুঁদপুরের সুন্দর রায়ের মন্দিরে কোনো পুরুত-টুরুত নেই। গাঁয়ের লোকে মন্দিরে রোজ দু-বেলা প্রদীপ জ্বেলে ফল-ফুল দিয়ে আসে। সুন্দর রায়ের দেশ ওটা, কে বাঘ কে মানুষ কে বলতে পারে? আজকাল নাকি আবার বাঘের চাষ হচ্ছে। শুনলেও হাসি পায়।

এই বলে ঠানদিদি উঠে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পঞ্চুকাকা বললেন, 'তাহলে হরু গয়লার ছেলের কী হল?'

'কী আবার হবে? তারপরেই একটা চুরির কেস। আসামিকে হাজির করতেই, সক্কলে চেঁচিয়ে উঠল, "ওই যে হরুর ছেলে তুটে! ব্যাটা অ্যাদ্দিন হাজতে ছিল তাহলে।'

পঞ্চুকাকা ছাড়েন না, 'তাহলে গোয়ালের বাঘটার কি হল?'

'আরে সেটা কি সত্যি বাঘ ছিল নাকি? পাদুর বউ-এর বরটা নারকেল চুরির হাঙ্গামায় পড়ে গেলে, তার-ও তো একটা গা-ঢাকা দেবার উপায় থাকা চাই।' এই বলে ঠানদিদি সত্যি সত্যি বাড়ি চলে গেলেন।

পঞ্চুকাকাও উঠে পড়ে বললেন,—'যত সব গাঁজাখুরি গল্প। তবে ওসব জায়গায় যে অসম্ভব ঘটনা ঘটাও সম্ভব, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বুকের ওপরে বাঘ

তারপর বাঘটা আমার বুকের ওপর দুটো থাবা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল! আমার মুখের ঠিক সামনেই বাঘের বিশাল মুখখানা, রয়াল গুলির মতন চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে...

আমি যদি এরকম লিখি, কেউ বিশ্বাস করবে? সবাই বলবে, ধুত, গাঁজাখুরি গল্প! কিংবা যদি সত্যি হয়, তা হলে তুমি বেঁচে আছ কী করে? বাঘ তোমার বুকের ওপর থাবা তুলে দাঁড়াল, অথচ তোমাকে কামড়াল না, এ আবার হয় নাকি? সেই বাঘটা কি মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য?

কিন্তু এটা গল্পও নয়, মিথ্যে কথাও নয়। খাঁটি সত্যি। এবং আমি যে বেঁচে আছি, সে-কথাও ঠিক। ভূত হয়ে তো আর এসব লিখছি না! আমার গায়ে চিমটি কাটলে ব্যথা লাগে, হোঁচট খেলে উঃ করি, খুব অন্ধকারের মধ্যে বেশিক্ষণ একা থাকলে গা ছমছম করে, সুতরাং আমি মানুষ হয়েই বেঁচে আছি।

খাঁচার বাঘ কিংবা সার্কাসের বাঘ নয়, আমি বেশ কয়েকবার জঙ্গলের বাঘ দেখেছি। সুন্দরবনে, উত্তরবঙ্গের গোরুমারা ফরেস্ট, মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায়। আফ্রিকায় দেখেছি সিংহ আর গণ্ডার, সেখানে বাঘ নেই। অবশ্য এ-সবই দেখেছি কিছুটা দূর থেকে। শুধু একবারই বাঘ এসেছিল খুব কাছাকাছি, একেবারে আমার বুকের ওপর থাবা তুলে দিয়েছিল। আমি আমার গল্পের কাকাবাবুর মতন শক্তিশালী বা ভাগ্যবানও নই, তবু বেঁচে গেলাম কী করে?

তাহলে গোড়া থেকে সব খুলে বলতে হয়।

আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রায়ই এখানে-সেখানে বেড়াতে যাই। আগে থেকে কিছু ঠিক থাকে না, হঠাৎ ঝোঁক উঠল আর বেরিয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে যেন জঙ্গল কিংবা পাহাড় আমাকে ডাকে। শহরের এত ভিড় আর ধুলো-ধোঁয়া আর কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে হঠাৎ এক-এক সময়

চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে। ঘন বনের মধ্যে তরতরিয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা চঞ্চলা নদী, বড়ো পাথরের চাঁই, অসংখ্য প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে...সেই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে মনে হয় এক্ষুনি ওরকম জায়গায় ছুটে যেতে হবে।

সেবারে আমরা গিয়েছিলাম ঝাড়গ্রাম। ঝাড়গ্রাম বেশ সুন্দর জায়গা, তবে এমন কিছু দূর নয়। সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে বসে আড্ডা দিতে দিতে ঠিক হল, সিমলিপাল জঙ্গালে ঘুরে এলে বেশ হয়!

একটা গাড়ি জোগাড় করে বেরিয়ে পড়া হল। সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং একজন বড়ো সরকারি অফিসার ও কবি পার্থসারথি চৌধুরি এবং আরও কয়েকজন। আমাদের যাওয়ার সময় কোনও তাড়াহুড়ো থাকে না, রাস্তার ধারে কোনো আকর্ষক জায়গা দেখলে নেমে পড়ি। হোটেল-রেস্তরাঁয় না খেয়ে কিছু খাবারদাবার কিনে নিয়ে কোনো জঙ্গালে ঢুকে পিকনিক করি। সেবারে আদিবাসীদের একটা চমৎকার হাটে আমরা অনেক সময় কাটালাম।

সন্ধ্যের একটু পরে আমরা পৌঁছোলাম যোশিপুর ডাকবাংলোয়। এই বাংলোটা পাহাড়ের নীচের দিকে, এরপর থেকেই জঙ্গালের শুরু।

আমরা যে-গাড়িতে এসেছি, সে-গাড়িটা পাহাড়ে ওঠার পক্ষে খুব সুবিধের নয়। যোশিপুর বাংলোতে জিপগাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। আমাদের গাড়িটা ওখানে রেখে জিপ নিয়ে জঙ্গালে যেতে হবে। আমরা ঠিক করলাম, রাত্তিরটা ওই বাংলোয় কাটিয়ে খুব ভোর-ভোর যাত্রা করব পাহাড়ের দিকে। ভোরের সময় জঙ্গালের পথে অনেক হরিণ, হাতি, এমনকী বাঘও দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

যোশিপুর বাংলোটি বেশ সুন্দর। গেট দিয়ে ঢোকার পর অনেকখানি বাগানমতন, তারপর বাংলোবাড়িটির সামনের দিকে একটা বেশ বড়ো গোলমতন ঢাকা বারান্দা, সেখানে একসঙ্গে অনেক লোক বসতে পারে। ওখানকার জেলার ফরেস্ট অফিসার, যাঁদের বলে ডি. এফ. ও., তাঁর নাম সরোজ চৌধুরি, তিনি ওই বাংলোতেই থাকেন।

আমাদের দলের পার্থ চৌধুরি আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওই সরোজবাবুর আগে থেকেই খানিকটা আলাপ-পরিচয় ছিল। তিনি আমাদের খাতির করে বসালেন। আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা হল।

সবেমাত্র চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিয়েছি, এমন সময় একটা বাঘের হুঙ্কার শুনতে পেলাম!

চমকে তাকিয়ে দেখি, বেশ কাছেই বাগানে একটা বাঘ শুয়ে আছে। ছোটোখাটো বাঘ নয়, মস্ত বড়ো বাঘ, জঙ্গালেও সচরাচর দেখা যায় না।

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাঘটা এখানে ঢুকে পড়েছে নাকি?

সরোজবাবু বললেন, 'ভয় পাবেন না, ও আমার পোষা বাঘ!'

শক্তি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'ওরে বাবা, সেটা এত বড়ো হয়ে গেছে নাকি?'

পার্থ বলল, 'এই বাঘটার কথা আগে শুনেছি, এটা এখানে খোলা থাকে নাকি? খাঁচায় থাকে না?'

এই বাঘটার অনেক ইতিহাস-ভূগোল আছে।

এই অঞ্চলে খৈরি নামে আছে একটা ছোট্ট নদী। সরোজবাবু একদিন বনের পথে যেতে যেতে নদীর ধারে দেখতে পান একটি বাঘের বাচ্চা খেলা করছে একা একা। বাচ্চা বাঘকে ফুটফুটে বেড়ালের মতনই সুন্দর দেখায়। কাছাকাছি মা বাঘিনী কিংবা বাবা বাঘ নেই দেখে সরোজবাবু সেই বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে এলেন। তিনি ঠিক করলেন পুষবেন ওই বাচ্চাটাকে। নদীর নামে ওরও নাম দেওয়া হল খৈরি।

কিন্তু বাঘ তো কুকুর-বেড়ালের মতন পোষ মানে না। কুকুরের মতন বাঘের গলায় চেন বেঁধে রাখলে কিছুদিন পরে সে মরে যায়। খাঁচায় বন্দি করে রাখলেও কীরকম করুণ হয়ে যায় তাদের চেহারা। সার্কাসে যেসব বাঘ খেলা দেখায় তাদের আফিং খাইয়ে খাইয়ে নির্জীব করে ফেলা হয় আর ইলেকট্রিকের চাবুক মেরে মেরে খেলা দেখাতে বাধ্য করা হয় তাদের।

সরোজবাবু বাঘটাকে পোষ মানানোর একটা পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি খৈরি নামের সেই বাচ্চা বাঘটাকে চেন দিয়ে না বেঁধে কিংবা খাঁচায় বন্দি না করে খোলা রেখে দিলেন। প্রত্যেকদিন তাকে দশ কেজি করে দুধ আর মাংস খাওয়ানো হয়। বনের বাঘকে অনেক পরিশ্রম, অনেক দৌড়োদৌড়ি করে শিকার করে খেতে হয়। আর এই বাঘটা বসে-বসে খাচ্ছে, তাই দু-তিন বছরের মধ্যেই সে বিরাট মোটাসোটা আর থলথলে হয়ে গেছে, সেইজন্যই বনের বাঘের চেয়েও তাকে বড়ো দেখায়।

এইসব ইতিহাস-ভূগোল শুনেও আমাদের ভয় ভয় করতে লাগল, এত কাছ থেকে একটা বাঘ দেখার অভিজ্ঞতা তো আমাদের নেই! খুব বড়ো চেহারার কুকুর দেখলেও আমার ভয় হয়, সে পোষা হোক আর যাই হোক!

আমরা চা খেতে-খেতে গল্প করছি আর বারবার তাকাচ্ছি বাঘটার দিকে। নীহার নামে একজন মহিলা বাঘটাকে মাংস খাইয়ে দিচ্ছে, আর পেছনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে একজন রক্ষী। বাঘটা মাঝে মাঝে হুঁ-উ-ম, হুঁ-উ-ম শব্দ করছে। মনে হচ্ছে যেন, রোজ রোজ ওই দুধে ডোবানো মাংস খাওয়া তার পছন্দ নয়।

একসময় বাঘটা চলে এল বারান্দায়।

সরোজবাবু বললেন, 'ও মানুষজন খুব ভালোবাসে, ঠিক যেন আড্ডা দিতে চায়!'

বাঘটা মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আমাদের সবাইকে দেখল। তার লেজটা একটু একটু নড়ছে। চাপা গ-র-র গ-র-র শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।

আমাদের এক বন্ধু নাম নিমাই, সে বসেছিল বারান্দাটার দরজার কাছে। বাঘটা কেন যেন নিমাইকে পছন্দ করে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নিমাই কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এ কী, এ কী, আমার কাছে আসছে কেন?'

সরোজবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'ভয় পাবেন না, ভয়ের কিছু নেই!'

যাদের বাড়িতে বিরাট-বিরাট পোষা কুকুর থাকে, তারাও এই কথা বলে।

বাঘটা এবার মস্ত বড়ো হাঁ করে নিমাইবাবুর একটা কনুই মুখে ভরে ফেলল!

নিমাই আঁ-আঁ করে আর্তনাদ করে উঠল।

সরোজবাবু বললেন, 'অত বড়ো চেহারা হলে কি হয়, ও তো আসলে বাচ্চা। তাই খেলা করছে।'

আমার মনে হল, দুধে-ডোবানো মাংস খেয়ে-খেয়ে অরুচি ধরে গেছে বলেই বাঘটা আজ বুঝি টাটকা মাংস খেতে চাইছে। চোয়ালের একটু চাপ দিলেই নিমাইয়ের একখানা হাত শেষ হয়ে যাবে!

নিমাইয়ের মুখখানা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে, মাথার চুলগুলো সব খাড়া। ভয় পেলে মানুষের মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়, একথা আগে শুনেছি। এই প্রথম স্বচক্ষে দেখলাম। সত্যিই, তাহলে এরকম হয়!

বাঘটা শেষ পর্যন্ত নিমাইকে কামড়াল না।

ওকে ছেড়ে দিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল সবার সামনে দিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে থামল আমার সামনে। কেন সে আমাকে পছন্দ করল, তা কে জানে!

এরপর সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করতে লাগল। আমাকে কামড়াল না বটে, কিন্তু মুখটা তুলে আমার এক বগলের কাছে ঢুঁসো মারল দু-বার।

আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'এ কী! এ কী!'

সরোজবাবু বললেন, 'ও কিছু হবে না। ও ঘামের গন্ধ ভালোবাসে। আপনারা গরমের মধ্যে খুব ঘেমে এসেছেন তো!'

আমার সারা শরীর দিয়ে তখন গলগল করে আরও ঘাম বেরোচ্ছে। যদিও জানি পোষা বাঘ, তাহলেও ভয়ে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।

বাঘটা আর-একবার ঢুঁসো মারতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম!

সরোজবাবু বলে উঠলেন, 'দাঁড়াবেন না, দাঁড়াবেন না, দৌড়োবেন না, তাহলে খুব খারাপ হবে।'

কিন্তু ততক্ষণে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি।

আর বাঘটাও দাঁড়িয়ে আমার বুকে দুই থাবা চেপে ধরেছে। আমার ঠিক মুখের সামনে ওর মুখ!

সরোজবাবু বললেন, 'নড়বেন না সুনীলবাবু, আপনি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিন!'

সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। আমি তখন এত ভয় পেয়ে গেছি যে, হাত তোলারও ক্ষমতা নেই। সারা শরীর কাঁপছে। নিমাইয়ের মতন আমারও মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল কিনা কে জানে!

একটা কথাই তখন আমার মনে হচ্ছে। আমি যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই, তাহলে বাঘটাও আমার ওপর পড়বে। ও যদি আমাকে নাও কামড়ায়, ওর অত বড়ো শরীরের চাপেই আমি মরে যেতে পারি।

কত মুহূর্ত কাটল জানি না! আর একটুক্ষণ থাকলে আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতাম। বাঘটার চোখের দিকে আমার চোখ। সরোজবাবু আরও কত কী বলে যাচ্ছেন, আমার কানে যাচ্ছে না।

এবার সেই বাঘ হঠাৎ ফ-র-র শব্দ করল। আর অমনই একরাশ বাঘের থুতু এসে লাগল আমার মুখে আর জামায়।

বাঘটা এবার আমাকে ছেড়ে গদাইলশকরি চালে দুলতে দুলতে চলে গেল বাগানে।

আমি ধপাস করে বসে পড়লাম চেয়ারে। তাকিয়ে দেখি, শক্তি, পার্থ ও অন্য বন্ধুরা কেউ সেখানে নেই। সবাই সরে পড়েছে। আমার যেন জীবনীশক্তি আর একটুও বাকি নেই। নড়তে চড়তে পারছি না, গলা শুকিয়ে কাঠ!

সরোজবাবু বললেন, 'আপনাদের থাকার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কোনো অসুবিধে হবে না। তবে রাত্তিরে ঘরের দরজা বন্ধ করবেন না। খৈরি তো সারারাত এখানে ঘুরে বেড়ায়। কোনো ঘরের দরজা বন্ধ দেখলে ধাক্কা মারে। আমরা তো দরজা খুলে শুই। ও বড়োজোর দু-একবার ভেতরে ঢুকে গায়ের গন্ধ শুঁকে চলে যায়।'

আমি আবার তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। মাথা খারাপ! এই বাংলোয় কেউ আর রাত্তিরে থাকে? রাত্তির বেলা বাঘ এসে ঢুঁসো মারবে।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমি গুটিগুটি পায়ে চলে এলাম গেটের বাইরে। দেখি যে, অন্য বন্ধুরাও সেখানে সবাই জড়ো হয়েছে। সবাই বলল, 'রাস্তার ধারে কোথাও শুয়ে থাকব সেও ভালো, কিন্তু এই বাংলোতে রাত কাটাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না!'

সেই রাতেই আমরা উঠে গেলাম পাহাড়ের দিকে।

তাহলে, আমার বুকে যে একটা মস্ত কেঁদো বাঘের থাবার ছাপ আছে, একথাটা মিথ্যে নয়!

এই ঘটনা ঘটেছিল বেশ কিছু বছর আগে।

সেই খৈরি কিন্তু এখন আর বেঁচে নেই। খুব কম বয়সেই সে মারা গেছে। বাঘ নয়, সে ছিল

একটা বাঘিনী। আমাদের সে কামড়ায়নি বটে, কিন্তু এর পর দু-একজন মানুষকে জখম করেছে। বোঝা যাচ্ছিল যে, তাকে ওইভাবে পোষ মানিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা।

তখন তাকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছিল কয়েকবার।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, প্রত্যেকবারই সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে এসেছে। মানুষের কাছাকাছি থাকার জন্য তার গায়ে বোধহয় অন্যরকম গন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই বনের বাঘরা তাকে সহ্য করতে পারত না। অমন একটা মোটাসোটা সুন্দরী বাঘিনী, তবু কোনো বনের বাঘ তাকে পছন্দ করেনি! বারবার অন্য বাঘেরা তাকে আঁচড়ে-কামড়ে মেরে জঙ্গলের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছে। একবার সেই ক্ষত থেকে সেপটিক হয়ে যায়। তাতেই সে মারা যায়।

বেচারি মানুষের সঙ্গেও থাকতে পারেনি, আবার জঙ্গলেও ঠাঁই পেল না। নদীর ধার থেকে ওকে কোলে করে নিয়ে আসাটাই ভুল হয়েছিল। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'—এই কথাটা কত সত্যি!

বুদ্ধদেব গুহ

লাওয়ালঙের বাঘ

ঋজুদার সঙ্গে সীমারীয়ার ডাকবাংলোয় আজ রাতের মতো এসে উঠেছি। আমরা যাচ্ছিলাম কাড়গুতে, চাত্‌রার রাস্তায়; কিন্তু কলকাতা থেকে একটানা জিপ চালিয়ে এসে গরমে সবাই কাবু হয়ে পড়েছিল বলে রাতের মতো এখানেই থাকা হবে বলে ঠিক করল ঋজুদা।

সবাই বলতে ঋজুদা, অমৃতলাল আর আমি।

এখন রাত আটটা হবে। শুক্লপক্ষ। বাইরে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। চৌকিদার হ্যারিকেন জ্বালাবার তোড়জোড় করছিল, ঋজুদা বলল, তুমি বাবা আমাদের একটু খিচুড়ি আর ডিমভাজা বানিয়ে দাও। অমৃতলালও গিয়ে বাবুর্চিখানায় জুটেছে। আলুকা ভাত্তা বড়ো ভালো বানায় অমৃতলাল, ওর নানীর কাছ থেকে শিখেছিল। আলুসিদ্ধ, তার মধ্যে ঘি, কুচিকুচি কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে এমন করে রগড়ে রগড়ে মাখত যে, তার নাম শুনলেই আমার জিভে জল আসত।

ঋজুদা ঝাঁকড়া সেগুন গাছের নীচের কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে নিজেই লাটাখাম্বাতে জল তুলে ঝপাং ঝপাং করে বালতি বালতি জল ঢেলে চান করছিল। চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে-যাওয়া বারান্দার ইজিচেয়ারে বসেছিলাম আমি একা। ঋজুদা বলেছিল, তোর আর রাতে চান করে দরকার নেই। কোলকাত্তীয়া বাবু, শেষে সর্দি-ফর্দি লাগিয়ে ঝামেলা বাধাবি।

সামনে লালমাটির পথটা চলে গেছে ডাইনে টুটিলাওয়া-বানদাগ হয়ে হাজারিবাগ শহরে। বাঁয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে গেলেই বাঘড়া মোড়। সেখান থেকে বাঁ-দিকে গেলে পালামোর চাঁদোয়া—টোড়ি। ডানদিকে গেলে চাতরা। এই সীমারীয়া থেকেই একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে চাত্‌রাতে। আরও একটা পথ টুটিলাওয়া আর সীমারীয়ার মাঝামাঝি মূল পথ থেকে বেরিয়ে গেছে লাওয়ালঙ।

বাইরে নানারকম রাত-চরা পাখি ডাকছে। সকলের নাম জানি না আমি। ঋজুদা জানে। আমি শুধু টী-টী পাখির ডাক চিনি। আসবার সময় সন্ধে হওয়ার আগে জঙ্গলের মধ্যে যে জায়গাটায় জিপ খারাপ হয়ে গিয়েছিল ঠিক সেখানে একদল চাতক পাখি ফটিক-জল-ফটিক-জল করে ঘুরে ঘুরে একটা পাতা-ঝরা ফুলে-ভরা শিমুল গাছের ওপরে পড়ছিল। ওই শিমুল গাছের সঙ্গে ওদের আত্মীয়তাটা কীসের তা বুঝতে পারিনি। আত্মীয়তা নিশ্চয়ই কিছু ছিল।

এরকম হঠাৎ-থামা, হঠাৎ-থাকা জায়গাগুলোর ভারি একটা আকর্ষণ আছে আমার কাছে। এরা যেন পাওয়ার হিসেবের মধ্যে ছিল না, এরা যেন ঝড়ের আমের মতো; পড়ে-পাওয়া। অথচ কত টুকরো টুকরো ভালোলাগা এই সমস্ত হঠাৎ পাওয়ায়—ঝিনুকের মধ্যে নিটোল সুন্দর মুক্তোর মতো।

একটা হাওয়া ছেড়েছে বনের মধ্যে। শুকনো শালপাতা উড়িয়ে নিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে নালায়-টিলায়; ঝোপে-ঝাড়ে। দূরের পাহাড়ে দাবানল লেগেছে। আলোর মালা জ্বলছে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে দেখা যায় পাহাড়ে পাহাড়ে মালা বদল হচ্ছে। এমনি করে কি পাহাড়দের বিয়ে হয়? কে জানে?

হওয়ায় হাওয়ায়, ঝরে-যাওয়া পাতায়, না-ঝরা পাতায় কত কী ফিসফিসানি উঠছে, চাঁদের আলোয় আর হাওয়ায় কাঁপা ছায়ায় কত কী নাচ নাচছে এই রাত—সাদা-কালোয়, ছায়া-আলোয়। কত কী গাছ উঠছে। গাছের তো প্রাণ আছে, ওদের গানও আছে, কিন্তু ওদের ভাষা তো আমরা জানি না—কোনো স্কুলে তো ওদের ভাষা শেখায় না। কেন যে শেখায় না! ভারি খারাপ লাগে ভাবলে।

ঋজুদা স্নান করছে তো করছেই। কতক্ষণ ধরে যে স্নান করে ঋজুদাটা! যখন ঋজুদার স্নান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—বাবুর্চিখানা থেকে অমৃতলালের গুরুমুখী গানের নীচু গুনগুনানি ভেসে আসছে খিচুড়ি রান্নার শব্দ ও গন্ধের সঙ্গে, এমন সময় মশাল হাতে একদল লোককে আসতে দেখা গেল টুটিলাওয়ার দিক থেকে। লোকগুলো হাজারিবাগী—টাঁড়োয়া-গাড়োয়া ভাষায় উঁচু গলায় কী সব বলতে বলতে আসছিল।

চেয়ার ছেড়ে ওঠে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে, উৎকর্ণ হয়ে ওই দিকে চেয়ে রইলাম।

লোকগুলো যখন বাংলোর সামনাসামনি এল, তখন ঋজুদা বারান্দায় এসে ওদের হিন্দিতে শুধোল, কী হয়েছে ভাই?

ওরা সমস্বরে বলল, বঁড়কা বাঘোয়া।

ব্যাপারটা শোনা গেল।

বড়ো একটা বাঘ, গোরু চরাতে যাওয়া একটা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে ঠিক সন্ধ্যের আগে আগে একটা নালার মধ্যে ধরে নিয়ে গেছে।

গোরুগুলো ভয়ে দৌড়ে গ্রামে ফিরতেই ওরা ব্যাপার বুঝতে পেরে ছেলেটার খোঁজে যায়।

গাঁয়ের শিকারি তার গাদা বন্দুক নিয়ে জনাকুড়ি লোক সঙ্গে নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে রক্তের দাগ দেখে নালার কাছে যেতেই বাঘটা বিরাট গর্জন করে তেড়ে আসে নালার ভিতর থেকে। তাতে ওই শিকারি গুলি করে। গুলি নাকি লাগেও বাঘের গায়ে—কিন্তু বাঘটা শিকারির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথাটা একেবারে তিলের নাড়ুর মতো চিবিয়ে, সকলের সামনে তাকে মেরে ফেলেই সঙ্গেসঙ্গে আবার নালার অন্ধকারে ফিরে যায়।

ওরা বলল, ছেলেটাকে তো এতক্ষণে মেরে ফেলেছেই, খেয়েও ফেলেছে হয়তো। ওরা কী করবে ভেবে না পেয়ে এখানে ফরেস্টারবাবুকে খবর দিতে এসেছে।

ঋজুদা চুপ করে ওদের কথা শুনছিল। জনা-কয় লোক বাংলোর সামনে দাঁড়িয়েছিল, অন্যরা ফরেস্টারবাবুর বাংলোর দিকে চলে গেল।

আমার আর তর সইল না। আমি ঋজুদাকে দেখিয়ে ওদের বলে ফেললাম, কোই ডর নেহি—ঈ বাবু বহত জবরদস্ত শিকারি হ্যায়।

একথা বলতে-না-বলতেই ওদের মধ্যে কিছু লোক ফরেস্ট অফিসে দৌড়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফরেস্টারবাবুকে সঙ্গে করে ফিরে এল সকলে। ওঁরা সকলে মিলে ঋজুদাকে বার বার অনুরোধ করলেন। ছেলেটা গ্রামের মাহাতোর ভাতিজা। মৃতদেহের কিছু অংশ না পেলে দাহ করা যাবে না এবং তাহলে ছেলেটার আত্মা চিরদিন নাকি জঙ্গলে-পাহাড়ে টাঁড়ে-টাঁড়ে ঘুরে বেড়াবে, ভূত হয়ে যাবে।

আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। ঋজুদার সঙ্গে এ পর্যন্ত ওড়িশার জঙ্গলে অনেক ঘুরলেও কখনো এমন সদ্য মানুষমারা বাঘের সঙ্গে মোলাকাতের অভিজ্ঞতা হয়নি।

গোলমালটা হল ঋজুদাকে নিয়েই। ঋজুদা বলল রুদ্র, তুমি যাবে না। তুমি আর অমৃতলাল দু-জনেই থাকবে এখানে।

অমৃতলাল বলল, নেহি বাবু, ঈ ঠিক নেই হ্যায়। এক্কেলা যানা নেই চাহিয়ে। দুসরা বন্দুক রহনা জরুরি হ্যায়।

তখন ঋজুদা অধৈর্য গলায় অমৃতলালকে বলল, কিন্তু রুদ্র যে বড়ো ছেলেমানুষ—ওর কিছু হলে ওর বাবা-মাকে কী বলব আমি?

আমি সকলের সামনেই ঋজুদার পা জড়িয়ে ধরে বললাম, ঋজুদা, আমাকে নিয়ে চলো, প্লিজ। তুমি তো সঙ্গেই থাকবে। তোমার যা হবে আমারও তাই হবে।

ঋজুদা কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। বলল, তুই ভারি অবাধ্য হয়েছিস। তারপরই বলল, আচ্ছা চল।

জিপে যে ক-জন লোক ধরে, তাদের নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লাওয়ালঙের রাস্তায়। অমৃতলাল জিপ চালাচ্ছিল তখন। ঋজুদা ফোরফিফ্‌টি-ফোর হান্ড্রেড দোনলা রাইফেলটা নিয়েছিল।

আমার হাতে দোনলা বারো বোরের বন্দুক। দুটো অ্যালফাম্যাকস্ এল. জি. আর দুটো লেথাল বল নিয়েছি সঙ্গে।

গরমের দিন। জঙ্গল একেবারে পাতলা হয়ে গেছে পাতা ঝরে। বর্ষার শেষে বড়ো বড়ো গাছের নীচে নীচে যেসব আগাছা, ঝোপঝাড়, লতাপাতা গজিয়ে ওঠে এবং শীতে যেগুলো ঘন হয়ে থাকে—যাদের ঋজুদা বলে 'আন্ডারগ্রোথ'— সেসব এখন একেবারেই নেই। জিপের আলোর দু-পাশে প্রায় এক-শো আশি ডিগ্রি চোখ চলে এখন।

একটা খরগোশ রাস্তা পেরুলো ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে। পর পর দুটো লুমরির জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ দেখা গেল। একটু পরেই আমরা পথ ছেড়ে একটা ছোটো পায়ে-চলা পথে ঢুকে গ্রামটাতে এসে পৌঁছোলাম। জিপের আওয়াজ শুনেই লোকজন ঘরের বাইরে এল। জিপটা ওখানেই রেখে দেওয়া হল। তারপর গ্রামের যে মাহাতো, তাকে ঋজুদা বলল পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের।

যে শিকারিকে বাঘ মেরে ফেলেছে, তাকে খাটিয়ার ওপর একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। মাটির দেওয়াল আর খাপরার চালের বাড়িগুলো থেকে মেয়ে ও বাচ্চাদের কান্না শোনা যাচ্ছিল। ঋজুদা সেই মৃতদেহের কাছে গিয়ে চাদর সরিয়ে লণ্ঠন দিয়ে কী যেন দেখল ভালো করে। তারপর ফিরে এসে বলল, চল রুদ্র।

গ্রামের লোকেদের যথাসম্ভব কম কথা বলতে ও আওয়াজ করতে অনুরোধ করে ঋজুদা আর আমি মাহাতোর সঙ্গে এগোলাম। উত্তেজনায় আমার গা দিয়ে তখনই দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছিল, হাতের তেলো ঘেমে যাচ্ছিল। বারবার খাকি বুশ শার্টের গায়ে ঘাম মুছে নিচ্ছিলাম।

জঙ্গলের বেশিরভাগই শাল। মাঝে মাঝে আসন, কেঁদ, গন্হার এসবও আছে। আমলকি গাছ আছে অনেক। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এক এক ফালি চাষের জমি। হয়তো শীতে কিতারী, অড়হর, কুলথী বা গেঁহু লাগিয়েছিল। এখন কোনো চিহ্ন নেই তার। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে আছে।

আলো না জ্বালিয়ে, আমরা নিঃশব্দে শুকনো পাতা না মাড়িয়ে, পাথর এড়িয়ে হাঁটছি। বন্দুকে গুলি ভরে নিয়েছি। ঋজুদার কথামতো দু-নলেই এল. জি. পুরে নিয়েছি। খুব কাছাকাছি থেকে গুলি করতে হলে নাকি এল. জি.-ই ভালো। ঋজুদাও রাইফেলের দু-ব্যারেলে সফট্ নোজড্ বুলেট পুরে নিয়েছে। ঋজুদার রাইফেলের সঙ্গে একটা ক্ল্যাম্পে ছোটো একটা টর্চ লাগানো আছে—ক্ল্যাম্পের সঙ্গে আটকানো একটা লোহার পাতে নিশানা নেবার সময় বাঁ-হাতের আঙুল ছোঁয়ালেই টর্চটা জ্বলে ওঠে। আমার বন্দুকে আলো নেই। এমন জ্যোৎস্না-রাতে বন্দুক ছুড়তে আলো লাগে না। বন্দুক ছোড়া রাইফেল ছোড়ার চেয়ে অনেক সহজ।

কিছুদূরে গিয়ে আমরা একটা উপত্যকায় এসে পৌঁছোলাম। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে শান্ত উদোম উপত্যকা। দূরে পিউ-কাঁহা পিউ-কাঁহা করে রাতের বনে শিহর তুলে পাখি ডাকছে। কী চমৎকার সুন্দর পরিবেশ! ভাবাই যায় না যে, এই আলোর মধ্যে ছায়ার আড়ালে মৃত্যু লুকিয়ে

আছে—অমন মর্মান্তিক মৃত্যু। দু-দুজন লোক আজ সন্ধ্যে থেকে এখানে মারা গেছে, বলতে গেলে খুন হয়েছে, অথচ কী সুন্দর পাখি ডাকছে; হাওয়ায় মহুয়া আর করৌনজ্ ফুলের গন্ধ ভাসছে কী দারুণ!

মাহাতো আঙুল দিয়ে দূরে যে জায়গাটা থেকে বাঘ নালা ছেড়ে উঠে এসে শিকারিকে আক্রমণ করেছিল, সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিল। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, সামনে যে পিপুল গাছটা আছে, তাতে তুমি চড়ে বসে থাকো। আমরা ডান দিকে গিয়ে বাঘের যে জায়গায় থাকার সম্ভাবনা, সে-জায়গা থেকে কম করে তিন-শো গজ দূরে নালায় নামব।

তারপর আর কিছু না বলে ঋজুদা এগিয়ে চলল। পরক্ষণেই, দাঁড়িয়ে পড়ে মাহাতোকে বলল, দিনের আলো ফোটার আগেও যদি আমরা না ফিরি, তাহলে অমৃতলালকে ও গাঁয়ের লোকদের নিয়ে আমাদের খুঁজতে এসো।

কথাটা শুনে মাহাতো খুব খুশি হল না, চাঁদের আলোয় তার মুখ দেখেই তা বোঝা গেল।

এরপর ঋজুদা আর আমি সেই চন্দ্রালোকিত উপত্যকায় দু-টি ছায়ার মতো, নিঃশব্দে দূরের শুয়ে-থাকা ঘন কালো ছায়ার মতো, নালাটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

ঋজুদা শুধু একবার ফিসফিস করে বলল, ভয় পেয়ে পিছন থেকে আমাকে গুলি করিস না যেন। নালায় নেমে আমার পাশে পাশে হাঁটবি—পিছনে নয়। একটুও শব্দ না করে। প্রত্যেকটি পা ফেলার আগে কোথায় পা ফেলছিস, তা দেখে ফেলবি—এক পা এগোবার আগে সামনে ও চারপাশে ভালো করে দেখবি। কান খাড়া রাখবি, নালার মধ্যে চোখের চেয়ে কানের ওপরই বেশি নির্ভর করতে হবে। নালার মধ্যে হয়তো অন্ধকার থাকবে। তোর বন্দুকে আলো থাকলে ভালো হত।

যাই হোক, তখন আর কিছু করার নেই। আশা করতে লাগলাম, পাতা-ঝরা গাছগুলোর ফাঁকফোঁকর দিয়ে নালার মধ্যে কিছুটা আলো হয়তো চুঁইয়ে আসবে। গুলি খাক আর না খাক, বাঘ যে নালার মধ্যেই থাকবে, এমন কোনো কথা নেই। যদি নালার মধ্যে থাকে, তাহলে নালার কোন জায়গায় থাকবে তারও স্থিরতা নেই। তা ঋজুদা ভালো করে জানে বলেই এত সাবধান হয়ে নালার প্রায় শেষ প্রান্তের দিকে আমরা এগোচ্ছি।

দেখতে দেখতে নালার মুখে চলে এলাম। শুকনো বালি, চাঁদের আলোয় ধবধব করছে। আমাকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে ঋজুদা হাঁটু গেড়ে বসে নালার বালি পরীক্ষা করে দেখল। নালা থেকে যে বাঘ বেরিয়ে গেছে তেমন কোনো পায়ের চিহ্ন দেখা গেল না। খুব বড়ো একটা বাঘের পায়ের দাগ ছাড়াও শুয়োর, শজারু, কোট্‌রা হরিণ ইত্যাদির অনেক পায়ের দাগ দেখা গেল। বাঘ ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু এদিক দিয়ে বাইরে বেরোয়নি।

নালায় পৌঁছোনোর আগে অবধি একটা টী-টী পাখি আমাদের মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে উড়ে

উড়ে টিটির-টি—টি-টি-টি-টি করে ডাকতে ডাকতে সারা বনে আমাদের আগমন বার্তা জানিয়ে দিল। আমার মন বলছিল, বাঘ একেবারে খবর পেয়ে তৈরি হয়েই থাকবে।

এবারে আমরা নালার মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

দু-পাশে খাড়া পাড়। কোথাও-বা খোয়াই, পিটিসের ঝোপ, আমলকির পত্রশূন্য ডালে থোকা থোকা আমলকি ধরে আছে। নালার মধ্যে একটি জলের ধারা বয়ে এসেছে ওপাশ থেকে। কোথাও সে-জলে পায়ের পাতা ভেজে—কোথাও বা তাও নয়—শুধু বালি ভিজে রয়েছে।

কোনো সাড়াশব্দ নেই—শুধু একরকম কটকটে ঝিঁঝির একটানা ঝাঁ-ঝাঁ আওয়াজ ছাড়া।

একটা বাঁক নিলাম। ঋজুদা এক-এক গজ পথ যেতে পাঁচ মিনিট করে সময় নিচ্ছে।

যতই এগোতে লাগলাম, ততই জলের ধারাটা গভীর হতে লাগল। কোথাও কোথাও হাঁটু-সমান জল পথের গভীরে জমে আছে, তার মধ্যে ব্যাঙাচি, কালো কালো লম্বা গোঁফওয়ালা জলজ পোকা। আমাদের পায়ের শব্দের অনুকরণে একটা ছোটো ব্যাং জলছড়া দিয়ে দৌড়ে গেল জলের মধ্যে।

যতই এগোচ্ছি ততই নিস্তব্ধতা বাড়ছে। এত জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখলাম নালায় ঢোকার সময় বালিতে, কিন্তু কারো সঙ্গে দেখা হল না এ পর্যন্ত। কোনো মন্ত্রবলে তারা যেন সব উধাও হয়ে গেছে!

ঋজুদার কান চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। ঋজুদার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে বাঘ নালার মধ্যেই আছে। বন্দুকটা শুটিং-পজিশনে ধরে সেফ্‌টি-ক্যাচে বুড়ো আঙুল ছুঁইয়েই আছি আমি—যাতে প্রয়োজনে এক মুহূর্তের মধ্যে গুলি করতে পারি।

বোধহয় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে আমরা নালাটার মধ্যে ঢুকেছি। এতক্ষণে বেশ অনেকখানি ভিতরে ঢুকে থাকব। নালার মধ্যেটাকে আলো-ছায়ার কাটাকুটি করা একটা ডোরাকাটা শতরঞ্চি বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ বুকের মধ্যে চমকে দিয়ে কাছ থেকে হুপ-হুপ-হুপ-হুপ করে একসঙ্গে অনেকগুলো হনুমান ডেকে উঠল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে পঁচিশ গজ দূরের একটা বড়ো গাছের উপরের ডালে ডালে হনুমানদের নড়ে-চড়ে বসার আওয়াজ, ডালপালার আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গেসঙ্গে ঋজুদা আমার গায়ে হাত ছুঁইয়ে আমাকে নালার বাঁ-দিকের পাড়ের দিকে সরে আসতে ইশারা করল। আমি সরে আসতেই, আমার সামনে ছায়ার মধ্যে একটা বড়ো পাথরের ওপর বসে, দু-হাঁটুর ওপরে রাইফেলটা রেখে সামনের দিকে চেয়ে রইল ঋজুদা তীক্ষ্ণ চোখে।

নালাটা সামনে একটা বাঁক নিয়েছে।

হনুমানদের হুপ-হাপ আওয়াজ থেমে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে সামনে থেকে জল পড়ার আওয়াজ স্পষ্ট হল। ঝরনার মতো। পাথরের ওপর বোধহয় হাতখানেক উঁচু থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে,

তারই শব্দ। শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ঝরনাটা দেখা যাচ্ছিল না। ওটা বোধহয় বাঁকটার ওপাশেই। এদিকে জলের স্রোতও বেশ জোর—প্রায় ছয় আঙুল মতো জল একটা হাত পাঁচেক চওড়া ধারায় বয়ে চলেছে।

এখানে ঋজুদা একেবারে স্থাণুর মতো বসে রইল সামনের দিকে চেয়ে। কী জানি, ওই হনুমানদের হুপ-হাপ শব্দের মধ্যে ঋজুদা কী শুনেছিল—কোন্ ভাষা। কিন্তু তার হাবভাব দেখে আমার মনে হল, বাঘটা ওই নালার বাঁকেই যেকোনো মুহূর্তে দেখা দিতে পারে।

ওইভাবে কতক্ষণ কেটে গেল মনে নেই। আমার মনে হল, কয়েক ঘণ্টা, কিন্তু আসলে হয়তো পাঁচ মিনিটও নয়।

এখানে কেন বসে আছে, একথা আমি ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছি, এমন সময় জলের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। এক মুহূর্ত কান খাড়া করে শুনেই, ভেজা বালিতে হামাগুড়ি দিয়ে নালার বাঁকের দিকে এগোতে লাগল ঋজুদা। শব্দটা আমিও শুনেছিলাম। কুকুরে জল খেলে যেমন চাক্-চাক্-চাক্ শব্দ হয় তেমনই শব্দ, কিন্তু অনেক জোর শব্দ।

শব্দটা তখনও হচ্ছিল। বাঘটা নিশ্চয়ই ঝরনার জল খাচ্ছিল।

বাঁকটা তখনও হাত দশেক দূরে। ঋজুদা জোরে এগিয়ে চলেছে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে, রাইফেলটাকে হাতের ওপর নিয়ে। আমার বুকের মধ্যে তখন একটা রেলগাড়ি চলতে শুরু করেছে—এত ধক ধক করছে বুকটা, ঘামে সমস্ত শরীর, মাথার চুল সব ভিজে গেছে। আমার তখন খালি মনে হচ্ছিল, ঋজুদা দেখতে পাওয়ার আগে তার জল খাওয়া শেষ করে চলে যাবে না তো বাঘটা?

হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ, আমার বুকের স্পন্দন থেমে গেল।

আমার সামনে ঋজুদা বালিতে শুয়ে পড়েছে—প্রোন-পজিশনে দু-হাতে রাইফেলটা ধরে নিশানা নিচ্ছে।

ততক্ষণে আমি ঋজুদার পাশে পৌঁছে গেছি। পৌঁছেই যে দৃশ্য দেখলাম তা সারাজীবন চোখে আঁকা থাকবে।

ঝরনাটার ওপরে ডানদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বাঘটা জল খাচ্ছে। চাঁদের আলোয় তার মাথা, বুক সব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পেছনের দিকটা অন্ধকার। তার প্রকাণ্ড মাথাটা জলের ওপর একটা বিরাট পাথর বলে মনে হচ্ছে। আমিও যেই শুয়ে পড়ে বন্দুকটা কাঁধে তুলতে যাব, ঠিক এমনি সময়ে বুক-পকেটে রাখা বুলেটটার সঙ্গে বন্দুকের কুঁদোয় ঠোকা লাগতেই খুট করে একটু শব্দ হল। তাতেই বাঘ এক ঝটকায় মাথা তুলে এদিকে তাকাল। বাঘটা কানে-তালা-লাগানো গর্জনের সঙ্গেসঙ্গে শরীরটাকে গুটিয়ে যেন একটা বলের মতো করে ফেলল এবং মুহূর্তের মধ্যে সোজা আমাদের দিকে লাফাল। লাফাল না বলে উড়ে এল, বলা ভালো। আমার কানের পাশে ঋজুদার ফোরফিফটি-ফোর হানড্রেড রাইফেলের আওয়াজে মনে হল বাজ পড়ল। বাঘের গর্জন, হনুমানদের চেঁচামেচি, দাপাপাপি, জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য নানা পাখির চেঁচামেচিতে এবং রাইফেলের গুম্‌গুমানিতে যেন আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

দেখলাম, আলো-ছায়ায় মেশা একটা অন্ধকারের স্তূপ উড়ে আসছে আমাদের দিকে শূন্য থেকে, তার সামনে প্রসারিত করা—নখ সমেত প্রকাণ্ড থাবা দু-টি। বোধহয় ঘোরের মধ্যেই আমি একই সঙ্গে দুটো ট্রিগার টেনে দিয়েছিলাম বন্দুকের। কিন্তু গুলি লাগল কি না লাগল কিছু বোঝা গেল না—বাঘটা জলের মধ্যে ঝপাং করে পড়ল, প্রায় আমাদের নাকের সামনে। আমার মনে হল, থাবাটা একবার তুলে বাঘটা আমার মাথায় এক থাপ্পড় মারল বুঝি। আমি তখনও শুয়েই ছিলাম, দু-হাতে বন্দুকটাকে সামনে ধরে।

যেন ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, যেন অনেক দূর থেকে ঋজুদা আমাকে ডাকল, 'রুদ্র, এই রুদ্র!'

তাকিয়ে দেখলাম, আমার পাশে ঋজুদা বাঘটার ঘাড়ের দিকে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি উঠে দাঁড়াবার সঙ্গেসঙ্গেই বাঘটাও যেন একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। সারা-শরীর নড়ে উঠল, জল ছপছপ করে উঠল, ডন দেবার মতো উঠে দাঁড়াতে গেল বাঘটা। ঋজুদা রাইফেলটা কোমরে ধরা অবস্থাতেই বাঁ ব্যারেল থেকে আবার গুলি করল। বাঘটার মাথাটা ঝপাং করে জলে পড়ল।

একটাও কথা না বলে ঋজুদা ঝরনার কাছ দিয়ে নালা পেরিয়ে বাইরের উপত্যকায় এল। এসে ফাঁকা জায়গা দেখে একটা বড়ো পাথরের ওপরে বসে পকেট থেকে পাইপটা বের করে ধরালো। বলল, গাঁয়ের শিকারির নিশানা ফসকে গিয়েছিল। তার গুলি সত্যিই বাঘের পায়ে লেগে থাকলে ব্যাপারটা এত সহজে শেষ হত না। দূরে দেখা গেল—ঝাঁকড়া পিপুল গাছের দিক থেকে একটা লোক আমাদের দিকে জ্যোৎস্নায় ভেসে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। মাহাতো।

হঠাৎ ঋজুদা যেন কেমন উদাস হয়ে গেল।

পিউ-কাঁহা পাখিটা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার ডাকতে লাগল দূর থেকে। বাঘ মরে গেছে—এ-খবরে আনন্দ কী দুঃখপ্রকাশ করল জানি না, কিন্তু চতুর্দিকের বন-পাহাড়ে আবার নানারকম পশুপাখির ডাক শোনা যেতে লাগল।

আমি শুধোলাম, ঋজুদা, ছেলেটা?

ঋজুদা পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কিছু করার নেই। ওর বাবা-দাদারা আসবে—যাদের আপনজন, তারাই নিয়ে যাবে। কীই-বা করার আছে আমাদের?

আমি শুধোলাম কোথায় আছে?

ঋজুদা বলল, এমনভাবে বলল, যেন নিজে দেখেছে, ওই ঝরনার ওপাশে, বেশ কিছুটা ওপাশে নালার মধ্যেই পড়ে আছে।

আমিও পাথরটার ওপর বসে পড়ে খুশি গলায় বললাম, যাক, বাঘটাকে মেরেছ ভালোই হয়েছে। বদমাইশ বাঘ।

ঋজুদা শুকনো হাসি হাসল।

বলল, আহা, কী দারুণ বাঘটা! বেচারা!

তারপরই বলল, উপায় ছিল না বলেই হয়তো ও ছেলেটাকে মেরেছিল। জন্তু-জানোয়ারদের ভালোবাসিস, বুঝলি, রুদ্র। মানুষকে মানুষ তো ভালোবাসেই। কিন্তু ওদের ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে জানে খুবই কম মানুষ।

শৈলেন ঘোষ

কানকাটা বাঘ

বাঘকে যেমন বাঘের মতো দেখতে হয় এ-বাঘটা একদম তেমন নয়। মুণ্ডুখানা যেমন তোবড়ানো, তেমনই ঠ্যাং চারটে ট্যাঁড়াব্যাঁকা। একটা চোখ এইটুকুনি, আর-একটা এত্ত বড়ো। দুটো কানের একটি গেছে, একটি আছে। মানে, কানকাটা বাঘ। ছি ছি, পাঁচজনের সামনে এ-মুখ বাঘ দেখায় কেমন করে! কেউ দেখলে নিশ্চয়ই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাঘকে রাগাবে:

কান কাটা বেঁটে মোটা ট্যাঁড়াব্যাঁকা ঠ্যাং,
বাঘ, না, শেয়াল এ যে ঘুমোয় সটান!

যেই রাগাক তাকে তুমি দোষ দিতে পার না। অবশ্য বাঘ যদি রাগের কথা শুনে সত্যি-সত্যি রেগে যায়, রেগে গাঁক করে কামড়ে তার টুঁটি ধরে লটকে দেয়, তবে অন্য কথা। আশ্চর্য ব্যাপার কী জানো, এ বাঘটা রাগতেই জানে না। তুমি যতই হেঁকে-হেঁকে বাঘকে হেনস্থা করো, বাঘ রাগবেও না, ডাকবেও না। চাইকী, মুখ খিঁচিয়ে গাঁক করে হাঁকবেও না। যেমন সটান শুয়ে আছে তেমনই শুয়ে থাকবে। আর মাঝে মাঝে একটু জোরে বাতাস বইলে বাঘ গা-ঝাড়া দিয়ে ঘুরে-ফিরে এদিক-ওদিক করবে। বাঘটার বাতাস ছাড়া আর বন্ধুই নেই। সত্যি বলতে কী, বাতাসের দৌলতেই বাঘটা এমন একটা মনের মতো বনের ভেতর নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে। আসলে, বাঘটা ঘুম ছাড়া আর কিছু জানে না। তাও কী, চোখ দুটো ড্যাবড্যাব করে চেয়েই ঘুমোবে। বাঘটার খিদেও নেই, তেষ্টাও নেই। কী বাঘ রে বাবা! এমনকী, হাঁটতে-হাঁটতে আচমকা তোমার

পা-ও যদি তার গায়ে ক্যাঁত করে একটি শট মেরে দেয়, তাতেও বাঘের গ্রাহ্যি নেই। দিব্যি আরামসে নাক ডাকাবে, ভুল হয়ে গেল। এ বাঘের ফুটো-ফুটো দুটি নাক আছে ঠিকই, কিন্তু সে নাক ডাকতে জানে না। এমন হেঁয়ালি-হেঁয়ালি কথা শুনে অবাক হচ্ছ না? ভাবছ হয়তো, নাক থাকলে তো ডাকতেই পারে। হ্যাঁ, একথাটা এক-শোবার সত্যি। তবে কী জানো, আসলে এ-বাঘ কাগজে আঁকা একটি ছবি।

অবশ্য এ ছবি কে এঁকেছে, কেউ জানে না। তবে যেই এঁকে থাকুক, মন্দ আঁকেনি। তার মানে এই নয়, সে একজন ওস্তাদ ছবি আঁকিয়ে। ছবিটা দেখলে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে, বয়েসটা তার কচি-কচি। সাতও হতে পারে, আটও হতে পারে কিংবা তার কমও হতে পারে। তবে তাকে যখন আমরা কেউ দেখিনি, তখন আড়ালে তাকে নিয়ে কোনো কথা না বলাই ভালো। তার চেয়ে বরং যাকে দেখছি, সেই বাঘের কথাই শুনি।

খুব সম্ভব কাগজে আঁকা বাঘটা কোথাও বন্দি ছিল। ওই যে শুনলে না বাঘের বন্ধু বাতাস! বলতে পারি ওই বাতাসটাই বোধ হয় বাঘটাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে এনেছে এই বনে। এ-কাজটা করতে বাতাসকে তো আর কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। বাতাস ইচ্ছে করলে গায়ে যেমন সুড়সুড়ি দিয়ে ফুরফুর করে বইতে পারে, তেমনই আবার দমকা ঝাপটা মেরে সব ওলটপালটও করে দিতে পারে। হবে হয়তো, এমনই এক ঝাপটা মেরে বাঘকে এনে ফেলেছে বাতাস। তারপর ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ঘুমোচ্ছে বাঘ। কে জানে কবে ঘুম ভাঙবে!

বলতে-বলতেই একঝাঁক টিয়া উড়ে এল গাছের আড়াল ভেঙে বনের ভেতর। বুঝতেই পারছ একঝাঁক টিয়া মানে একঝুড়ি গল্প। সে কী ট্যাঁ-ট্যাঁ সুরের টকটকানি। কেউ বলছে মটরশুঁটির গল্প। কেউ বলে ধানিলঙ্কার কথা, কারো মুখে কাশীর পেয়ারার রাশি রাশি সুখ্যাতি। সবচেয়ে পুঁচকে যে টিয়াটা তার ওসবে কান নেই। মনও নেই। কেমন করে যেন তার চোখ পড়ে গেছে ওই বাঘটার দিকে। অনেকক্ষণ ধরে অবাক হয়ে সে বাঘের দিকেই চেয়ে ছিল। আর মনে-মনে ভাবছিল, ওটা কী রে বাবা! এইটুকুনি একটা বাঘের মতো দেখতে! যখন দেখল, বাঘের মতো দেখতে বাঘটা নড়েও না, চড়েও না, তখন সে গাছের ডাল থেকে নেমে এল বনের মাটিতে। ঝরাপাতার ওপর ডিঙি মেরে সে বাঘটাকে টেরিয়ে-টেরিয়ে দেখতে লাগল। তার চারপাশে ঘুরতে লাগল। কই, কোনো সানও নেই, প্রাণও নেই। সে বাঘটার আরও একটু কাছে এগিয়ে গেল। এবার ডানা ছড়িয়ে বাঘের ঘাড়ের ওপর দিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। ডানার হাওয়ায় বাঘটা নড়ল বটে। কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। তখন পুঁচকে টিয়াটার বেড়ে গেল আরও সাহস। সে একেবারে ঝপ করে বাঘের গায়ের ওপর দিল লাফ! যেই না লাফ দেওয়া, টিয়ার ডানার ঝাপটায় বাঘের কাজ সারা। ছিল সোজা, গেল উলটে। মাটির দিকে বাঘের ছবি, চোখের ওপর সাদা কাগজ। ব্যস, শুরু হয়ে গেল তুলকালাম কাণ্ড! কোথাও কিছু নেই, বাঘটা চিৎকার করে উঠল, 'দম আটকে আসছে, দম আটকে আসছে, আমাকে সিধে করে দাও! আমি মরে গেলুম!'

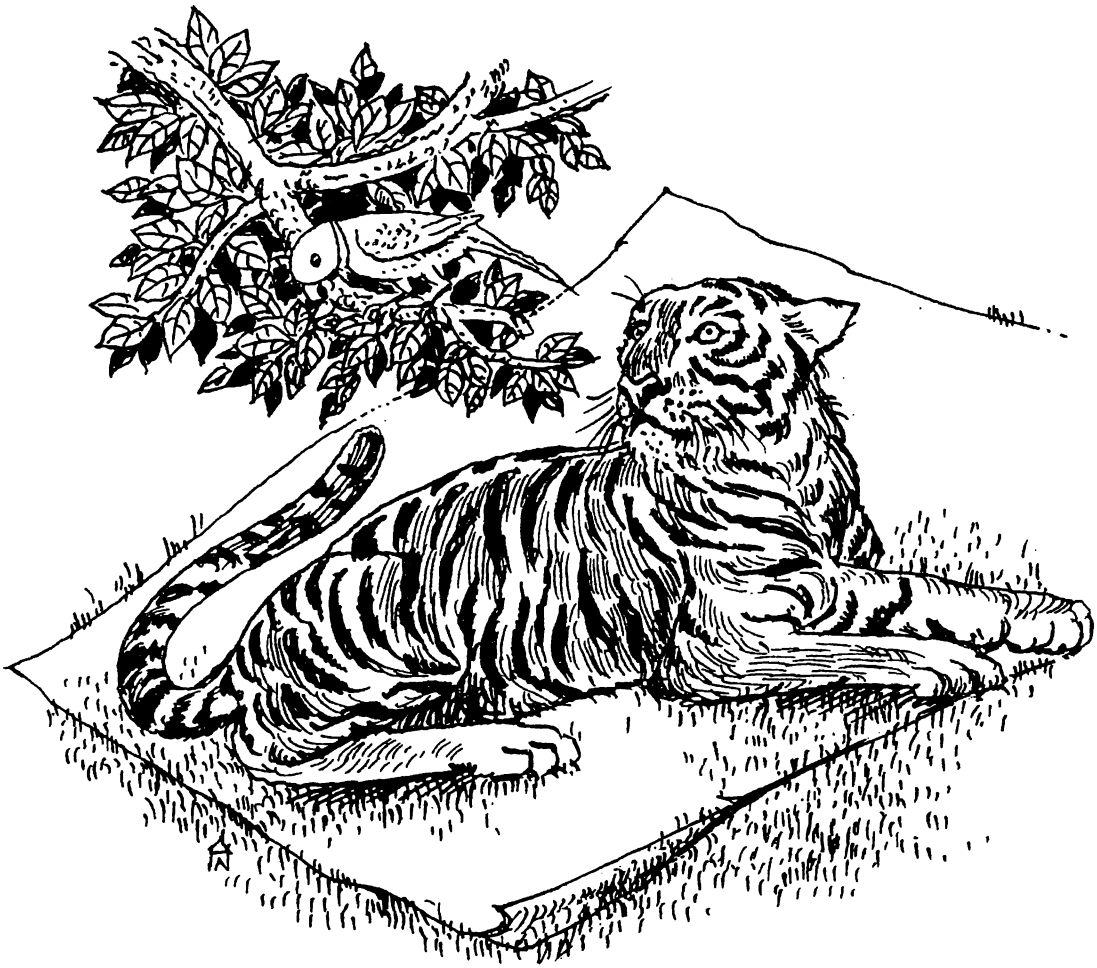

বলব কী, চিৎকার শুনে ওই একঝাঁক টিয়া চোখের পলকে ফুড়ুত। পুঁচকে টিয়াও দে হাওয়া! কিন্তু পুঁচকেটা হাওয়া দিলেও রহস্যটা তো আর তার মাথা থেকে হাওয়া হচ্ছে না! তাই উড়ে গিয়েও চোখের পলকে আবার ফিরে এল। কাছ-বরাবর একটা গাছের ডালে বসে উলটে-পড়া বাঘের হাঁসফাঁসানি শুনতে লাগল। এ কী কাণ্ড রে বাবা!

পুঁচকে টিয়া আর কতক্ষণ বসে থাকবে এই কাণ্ড দেখে! অত ধৈর্য কী আর পুঁচকেদের থাকে! ওই পুঁচকে টিয়ার মাথার ভেতর 'কী হয়' দেখার তাগিদটা এমন কিলবিল করে উঠল যে, সে আর থাকতে পারল না। ঝপ করে গাছ থেকে নেমে, একটু ইদিক-উদিক দেখে, ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল বাঘ-আঁকা কাগজটা। তারপর দিল উলটে। বলব কী, সঙ্গোসঙ্গে এক

আজব কাণ্ড! কাগজে আঁকা বাঘটা একটা সত্যি-সত্যি বাঘের মতো জ্যান্ত হয়ে 'হালুম' বলে একটা লম্বাই লাফ মারল। মেরেই খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। পুঁচকে টিয়াটার তো চক্ষু চড়কগাছ! সে পড়িমড়ি দিল লম্বা। ধড়ফড় করে উঠে পড়ল সামনের গাছটার একেবারে মগডালে। বাঘ হও আর যেই হও, আর তাকে ধরতে হচ্ছে না। উফ, খুব বেঁচে গেছে পুঁচকেটা! ওইটুকু বুকের ভেতর পুঁচকেটার যতটুকু প্রাণ আছে এই এক ধাক্কায় সেটুকুও যায় বুঝি! যাই হোক, এ যাত্রায় বেঁচে গেল। বেশ ক-টা ফিনফিনে হাঁফ ছেড়ে পুঁচকেটার যখন ঘোর কাটল তখন সে দেখল বাঘটা থাপুস মেরে সে নিজের গা চাটছে আর হাই তুলছে। কী রে বাবা, বাঘটা আবার ঘুমোবে নাকি! বাঘটাকে আরও একটু স্পষ্ট চোখে দেখার জন্য পুঁচকেটা নিঃসাড়ে মগডাল থেকে একটা নীচ ডালে নেমে এল। পাতার আড়াল থেকে উঁকি মেরে এই আজব বাঘের ছিরিটা সে লক্ষ করার চেষ্টা করল। অবশ্য এখান থেকে চোখ নামিয়ে দেখতে তার কষ্ট হল না বলেই সে ফস করে নিজের মনে হেসে উঠল। এ কী বাঘ রে! দেখতে কেমন গেঁড়া-গেঁড়া, মাথাটা কেমন ব্যাঁকাত্যাড়া, ঠ্যাং চারটে খাড়া-খাড়া, একটা চোখ টেরা-টেরা, গায়ের রং ছেঁড়া-ছেঁড়া! দেখেশুনে তার হাসিটা যখন মুখ দিয়ে ফসকে বেরোব বেরোব করছে, আর হাসিটাকে যখন সে মুখের ভেতর চেপে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তখন তার নজর পড়ে গেল বাঘের কানের দিকে। একটি কান আছে, আর একটি গেছে! সে আর থাকতে পারল না। ট্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ করে হেসে ফেলল। আর ঠিক তখনই একটা কাঠবিড়াল গাছের এ-ডাল ও-ডাল থেকে তিড়িং বিড়িং দিল ছুট। ছুটতে ছুটতে সিধে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। শুধু লাফিয়ে পড়ল না, বাঘটাকে সে বাঘ বলে ঠাওর করতে পারল না বলে সটান বাঘের পিঠের ওপর উঠে পড়ল। বাঘটা তো হচকিয়ে গেছে। পিঠে চড়ে কে রে বাবা! বাঘ খুব জোরে একটা গা ঝাড়া দিল। কিন্তু কাঠবিড়ালের নড়তে বয়ে গেছে। ওমা, কাঠবিড়ালটা বাঘের পিঠ চাটতে শুরু করে দিলে। এঃ বাবা, কি ঘেন্না! যে জানে সে জানে বাঘের গায়ের গন্ধ কেমন। কেমন বিচ্ছিরি বোঁটকা! কাঠবিড়ালটার কী ঘেন্না নেই? কেমন চাটছে দ্যাখো! চাটবেই তো! এ বাঘ তো আর সে-বাঘ নয়। এ তো আঁকা ছবির বাঘ। এ-বাঘের গায়ে মিষ্টি মিষ্টি রং। মিষ্টি-মিষ্টি রঙের মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধটা যাবে কোথায়।

সে যাই হোক, এদিকে কাঠবিড়ালের চাটাচাটিতে বাঘটা এমন ভয় পেয়ে গেল যে, সে মারল এক লাফ! লাফ মেরেই কাঠবিড়ালকে পিঠে নিয়ে দিল ছুট! আর তাই না দেখে পুঁচকে টিয়ার হাসতে হাসতে পেট ফাটার জোগাড়! হাসতে হাসতে সে উড়তে শুরু করে দিলে। বাঘ যেদিকে যায়, পুঁচকে টিয়াও সেদিকে ওড়ে। উড়তে উড়তে চেঁচায়, 'ছুটো না বাঘ, ছুটো না, তোমার পিঠে কাঠবিড়াল।'

হতভম্ব কাঠবিড়ালটা 'কী করবে, কী করবে' ভাবতে ভাবতে বাঘের পিঠ থেকে দিল লাফ—তিড়িং! লাফ দিয়েই সটান সামনের গাছটায় উঠে, পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

তবুও বাঘটা ছুটছিল। আর পুঁচকে টিয়াও উড়ছিল আর হাসছিল। তারপর বাঘটা যখন বুঝল তার পিঠে আর চাটাচাটির শব্দ নেই, তখন সে থামল। যে গাছটার নীচে থামল, সেই গাছটার ওপরে ঝুপ করে বসে পড়ল পুঁচকে টিয়া। বাঘটা তখনও হাঁফাচ্ছিল। আর পুঁচকে টিয়াটা তখনও হাসছিল! হাঁফাতে হাঁফাতে বাঘটা ওপর বাগে চাইছিল। পুঁচকে টিয়াটা হাসতে হাসতে এ-ডাল ও-ডাল নাচছিল। হঠাৎ বাঘের চোখে চোখ পড়তেই পুঁচকেটা বাঘকে কী জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে সে ফট করে বাঘকে বলে বসল, 'তুমি কেমন বাঘ? একটা কাঠবিড়ালির ভয়ে লেজ তুলে পালাও?'

বাঘ প্রথমটা কী উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। উত্তর দেওয়া ঠিক কি না সেইটা ঠিক করতেই তাকে বারকতক দম ফেলতে হল। তারপর চট করে বলে বসল, 'ওটার নাম কাঠবিড়ালি?'

পুঁচকে বললে, 'হায় কপাল, কাঠবিড়াল চেনো না?'

বাঘটা প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেলেও পরক্ষণেই বুকটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল, 'ওটার নাম যদি কাঠবিড়ালি হয়, তোমার নামটা কী?'

'আমার নাম পুঁচকে।' বলে পুঁচকে টিয়া ডানাটা একটু নেড়ে দিল।

পুঁচকে নামটা শুনে বাঘের ভীষণ মজা লেগে গেল।

বাঘ বলল, 'পুঁচকে আবার কী ধরনের নাম? পুঁচকে। নামটা তোমার কাতুকুতু মেশানো। আমার হাসি পাচ্ছে।'

পুঁচকে বলল, 'তোমাকে দেখেও আমার খুব হাসি পাচ্ছে।'

'কেন?' বাঘ যেন একটু চমকে গেল।

'তোমার একটা কান নেই। তুমি কানকাটা।' বলে পুঁচকেটা খুব জোরে হেসে উঠল। আর ঠিক তখনই বনের ভেতর একটা শেয়ালও ডেকে উঠল। শেয়ালের ডাক শুনে বাঘটা এমন ঘাবড়ে গেল যে, সে একেবারে চোখ-কান বুজে দিল ছুট!

পুঁচকেটা বাঘের হঠাৎ এমন ছুট দেখে নিজেই কেমন থতমত খেয়ে গেল। কী রে বাবা! শেয়ালের ডাক শুনে বাঘ ছুটে পালায় কেন! ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে পুঁচকে বাঘের পিছু পিছু উড়ে চেঁচাতে লাগল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি? দাঁড়াও দাঁড়াও!'

বাঘ বেশ খানিকটা ছুটে থামল। বেশ খানিকটা হাঁফাল। তারপরে কান পেতে শুনল। না, আর শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে না।

পুঁচকে টিয়া গাছের ডালে বসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ছুটলে কেন?'

বাঘ ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক চেয়ে পুঁচকে টিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'বিচ্ছিরি গলায় হুক্কা হুয়া বলে কে হেঁকে উঠল বলো তো?'

পুঁচকে টিয়া আরও জোরে হেসে ওঠে উত্তর দিল, 'আরে ছ্যা-ছ্যা, শেয়ালের ডাক শুনে তুমি পালিয়ে এলে! কোথায় শেয়াল তোমাকে দেখে ভয়ে পালাবে, না, উলটে তুমিই ভড়কে গেলে!'

বাঘ কেমন যেন বোকা-বোকা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'শেয়ালের চেয়ে আমি বুঝি বড়ো?'

'হায় রে, তাও জানো না?' হাসতে হাসতে থেমে উত্তর দিল পুঁচকে।

বাঘ একটা লম্বা স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বলল, 'যাক, খুব রক্ষে, কেউ দেখতে পায়নি।'

পুঁচকে টিয়া এবার বাঘকে একটু খোঁচা দিয়েই বলল, 'সত্যি বলতে কী, তুমি বাঘের নামে কলঙ্ক। তোমার যেমন একটা কান নেই, তেমনই তোমার সাহসও নেই। এই বনের অন্য বাঘ তোমাকে দেখতে পেলে তোমাকে বন থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে। লজ্জা, লজ্জা! তুমি শেয়ালের ভয়ে পালাও!'

বাঘ যেন এবার একটু ভাবনায় পড়ল। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল, 'কী করা যায় বলোদিকিনি? আমার কী করা উচিত?'

পুঁচকে বলল, 'শেয়াল যখন চেঁচাল, তখন তো তোমার উচিত ছিল রুখে দাঁড়ানো।'

বাঘ উত্তর দিল, 'তারপর দেখে ফেললে!'

পুঁচকে দু-বার চোখের পাতা ফেলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দেখে ফেললে মানে?'

বাঘ উত্তর দিল, 'দেখে ফেললে মানে আমার কাটা কানটা।'

পুঁচকে বলল, 'সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছ। একটা কান না থাকা বাঘের পক্ষে খুবই লজ্জার!'

বাঘ খুবই অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এর একটা বিহিত করতে পারো না?'

'কীসের বিহিত?' পুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

'আমার কানের যদি একটা বিহিত করে দিতে পারো।'

পুঁচকে হেসে উঠল। বলল, 'তুমি তো বেশ কথা বলেছ! কান নেই তোমার, আর আমায় বলছ বিহিত করে দিতে! আমি যদি তোমার মতো বাঘ হতুম, আর যদি আমার একটা কান কাটা থাকত, তবে দেখতে কবেই আমি নিজের কানের নিজেই বিহিত করে নিয়েছি। হাতির গায়ে যে অত জোর, সেই হাতিকেই ঘায়েল করে, হাতির কান ছিঁড়ে এনে নিজের কানে বসিয়ে নিতুম। আরে বাবা, বাঘ বলে কথা! গায়ে ক্ষেমতা কত!'

বাঘটা কেমন বোকার মতো জিজ্ঞেস করল, 'হাতিকে বুঝি বাঘ ছাড়া সবাই ভয় পায়?'

পুঁচকে জবাব দিল, 'পাবে না! হাতির তাকত কত! শুঁড় দিয়ে ধরবে আর পা দিয়ে চেপটে চ্যাটাং করে দেবে। বাঘ ছাড়া কার অত সাধ্যি হাতির সঙ্গে লড়ে!'

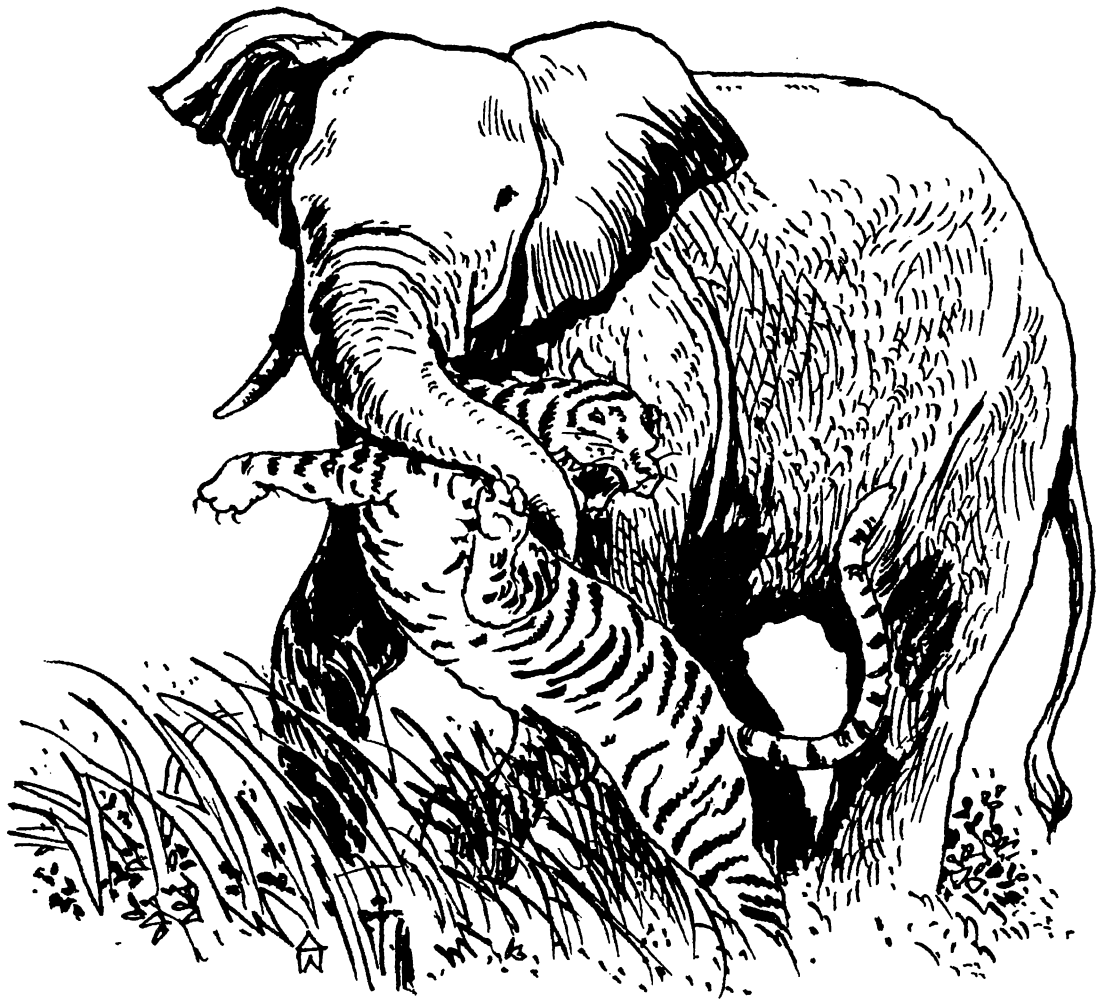

বাঘটা গা-ঝাড়া দিল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তুমি বলছ হাতির সঙ্গে লড়াই করতে?'

'নিশ্চয়ই।' পুঁচকে জবাব দিল, 'মান-ইজ্জত যদি বাঁচাতে চাও তবে এখনই একটা হাতির কান ছিঁড়ে এনে নিজের কানে বসিয়ে নাও! কান তো কান হাতির কান। যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। তোমার কাটা কানে বসিয়ে নিলে তোমাকে যা দেখতে হবে না, দারুণ!'

বাঘের লেজটা যেন উত্তেজনায় ছটফটিয়ে দুলতে লাগল। তারপর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভেতরে সাহসটা খামচাখামচি শুরু করে দিয়েছে। ঠিক আছে,

তোমার কথাই সই। আমি হাতির সঙ্গে লড়াই করে তার কান ছিঁড়ব। কিন্তু হাতির দেখা কোথায় পাব, তা তো জানি না!'

পুঁচকে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে। আমি আকাশে উড়ে যেদিকে যাই, আমাকে দেখে-দেখে সেইদিকে তুমি মাটিতে হাঁটো। বনের একটু ভেতরে না গেলে হাতির দেখা পাওয়া যাবে না।'

বাঘ জিজ্ঞেস করল, "হাতি বুঝি বনের ভেতরে থাকে?'

পুঁচকে মুচকি হাসল। বলল, 'কেন, বনের ভেতরে যেতে তোমার ভয় করছে নাকি?'

বাঘ বলল, 'না, না, আর আমার ভয় করছে না। যতই হোক আমি তো বাঘ। তোমার কথা শুনে ইস্তক আমার বুকের ভেতরটা 'হাতি-হাতি' করে হাঁফাচ্ছে। এখন আমার মনে হচ্ছে এখনই একটা হাতি দেখি, এখনই তার কান কাটি।'

ব্যস, বলতে না বলতেই সামনে একটা হাতি! পুঁচকে টিয়া দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঘ, তুমি সাবধান হও! ওই তোমার সামনেই একটা হাতি!'

কানকাটা বাঘের তো হাতি দেখেই ভয়ে পা ঠকঠক। তাই তো, এমন একটা ধুমসোর সঙ্গে লড়াই করা কী চাট্টিখানি কথা! তাই বাঘটা মনে মনে ভাবল, ঝুটঝামেলায় না গিয়ে হাতির কাছে ভালো মুখে একটা কান চাইলে কেমন হয়? সেইটাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাই কানকাটা বাঘটা হাতির মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে কিছু বলার আগেই, হাতিটা এমন হাতির মতো হেসে উঠল যে, তাই শুনে বাঘের গা-পিত্তি জ্বলে গেল। কোথায় ভালো মুখে কথা বলে হাতির সঙ্গে একটা রফা করবে, তা নয়, হাতি বাঘকে দেখে হেসে দিল। কী বিচ্ছু হাতি রে বাবা! মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গেল বাঘের। খুব কড়া গলায় কানকাটা বাঘ গর্জে উঠল, 'তুই হাসছিল কেন রে হাতি?'

হাতি হাসতে হাসতেই উত্তর দিল, 'হাসি পেলে না হেসে থাকি ক্যামনে?'

বাঘ আরও রেগে গেল। বলল, 'হাসি পেলে মানে? অত বড়ো একটা ধুমসো হাতি, তার যখন-তখন হাসি পেলেই হল! কীসের জন্যে হাসি পাবে?'

হাতি হাসতে হাসতেই বলল, 'তোকে যে দেখবে সেই হাসবে।'

'জানিস আমি বাঘ।' দম্ভে ফেটে পড়ল বাঘ।

হাতি বলল, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে কানকাটা বাঘ।'

ব্যস! ভস্মে যেন ঘি পড়ল। বাঘ গর্জে ওঠে ধমক মারল, 'তোর সাহস তো কম নয়! আমায় তুই কানকাটা বলিস! তবে তোরই কান কাটি আমি!' বলে বাঘ হাতির ঘাড়ে পড়ার জন্য গাঁক করে লাফিয়ে উঠল। যেই না বাঘ লাফিয়েছে, অমনই হাতি শুঁড় দিয়ে বাঘকে লুফে নিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। তারপরেই লেগে গেল ঝটাপটি। বাঘ চার পা ছুড়ে যতই গাঁক-গাঁক করে লাফায়, হাতি ততই শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে বাঘের দফারফা করে দেয়। শুঁড় দিয়ে হাতি বাঘকে একবার শূন্যে

তোলে, একবার নীচে নামায়। আবার তোলে, আবার নামায়। তারপর আচমকা বাঘকে এমন তোললাই দিয়ে ছেড়ে দিল যে, বাঘ মাটির ওপর ঘাড় গুঁজে ধপাস! যেই মাটিতে পড়া, অমনি হাতি বাঘের পেটটা চেপে ধরল পা দিয়ে। যেই না চেপে ধরা, সঙ্গেসঙ্গে ফুস-স-স! অত বড়ো বাঘটা চোখের পলকে কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল, বোঝাই গেল না! দেখা গেল, জ্যান্ত বাঘের বদলে হাতির পায়ের তলায় একটা কাগজ। আর সেইকাগজে আঁকা ছবি-ছবি বাঘটা। হাতি তো দেখেশুনে তাজ্জব! ভাবল, যাঃ বাব্বা! এ কী বাঘ!

আর গাছের ডালে বসে-বসে সেই পুঁচকে টিয়াটা ভাবল, একেই কী বলে ম্যা-ম্যাজিক! হবে হয়তো!

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিধু দারোগা

সেবার বিধু দারোগা আমাদের গঞ্জে বদলি হয়ে এল, হইহই পড়ে গেল। ব্রিটিশ আমলে দারোগা পুলিশকে ভারি ভয় খেত গাঁ-গঞ্জের লোকেরা। রাস্তায় ঘাটে বা হাটে-বাজারে পুলিশ দেখলেই নিরীহ সজ্জন মানুষরাও সাঁত সাঁত করে এধার-ওধার লুকিয়ে পড়ত। এক স্বদেশি আন্দোলনের নেতাগোছের লোক বটতলায় বক্তৃতা দিতে এলেন। শ-পাঁচেক লোক জড়ো হয়ে গরম বক্তৃতা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ঠিক সেই সময়ে একটা টিং-টিঙে রোগা লাল পাগড়িওলা পুলিশ হাট থেকে পালংশাক কিনে ফিরছিল। তাকে দেখে সেই পাঁচ-শো-জোয়ান-মদ্দ লোক দে-দৌড় দে-দৌড়। স্বদেশি নেতা গাছতলায় বসে বিড়ি ধরিয়ে আপনমনে হতাশভাবে বললেন—হোপলেস্। আর একবার, গঞ্জের নদীর ঘাট থেকে লোকভর্তি একটা নৌকা ছাড়ছে বিকেল বেলায়, সেই সময়ে গঞ্জের দারোগা আর কয়েকজন পুলিশও ওপারে যাবে বলে এসে নৌকায় উঠল। সঙ্গেসঙ্গে বিনা কারণে বিস্তর লোক ঝুপ ঝুপ করে হাঁটুজলে নেমে পালাতে লাগল। এমনকী, তাদের মধ্যে গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইও ছিলেন। পরে তাঁকে সবাই যখন জিজ্ঞেস করল, তিনি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'কী জানি বাবা, সবাই পালাল দেখে আমিও জলে নেমে পালালাম। ভয় বড়ো সংক্রামক।'

এই তো ছিল দারোগা-পুলিশদের সে-আমলের দাপট। বিধু দারোগা ছিলেন সেই দাপুটেদের মধ্যেও আর এক-কাঠি দাপুটে। তাঁর দাপটে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল

খায় এ কেবল কথার কথা নয়। তিনি গঞ্জে এসেই ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন যে, সামনের হাটবারে সবাই যেন স্বচক্ষে দেখে যায়, থানার উত্তর ধারের দিঘিতে বাঘে আর গোরুতে এক ঘাটে জল খাবে।

সেই হাটবারে দিঘির ধারে লোক ভেঙে পড়ল। বাঁধানো ঘাটে, বিশাল চেহারার বিধু দারোগা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকে কেউ হাসতে দেখেনি কখনো। ভীষণ রাগী চোখে চারদিকে চেয়ে দেখছেন। তাঁর চোখ যার ওপর পড়ছে, সে-ই জায়গা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের ব্যায়ামবীর ছোটোকাকাও তিনবার জায়গা বদল করে অবশেষে কচুবনের ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ জোরে কথা বলছে না, ফিসফাস গুজগুজ করছে। সবাই শুনে আসছে বটে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার কথা, কিন্তু কেউ কখনো দেখেনি। হারু মণ্ডলের বাঁকানো শিংওলা গোরুটা খুঁটোয় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাঘ তখনও দেখা যাচ্ছে না। তাই নিয়ে সকলের কৌতূহল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পাশের গাঁয়ের প্রবর্তক সার্কাস গত অমাবস্যা থেকে খেলা দেখাচ্ছে। সেদিক থেকে একটা খাঁচাওলা গাড়ি বলদে টেনে আনল। খাঁচার মধ্যে গলায় দড়ি-বাঁধা বাঘ বসে ঝিমোচ্ছে। অনেকে ফিসফিস করে বলল, বাঘকে আফিং খাইয়ে রাখে কিনা, তাই ওই ঝিমুনি।

তা সে যাই হোক, গায়ে গেঞ্জি আর কালো ফুলপ্যান্ট পরা রোগা রিং মাস্টার লোকটা হাতে চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খাঁচার দরজায়, দু-জন লোক খাঁচার দরজাটা ওপর থেকে টেনে তুলল। খাঁচার দরজা খোলা হতেই লোকজন দুড়দাড় দৌড়ে খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। ঘাটে রইল শুধু রিং মাস্টার, হারু মণ্ডল, বিধু দারোগা আর সার্কাসের দু-জন লোক। থানার সিপাইরাও সব তফাতে এসে দাঁড়ল। বাঘ বেরোবে, ইয়ার্কির কথা নয়।

তা বাঘটা আফিংখোরই হবে। রিং মাস্টার বিস্তর চাবুকের শব্দ করল, খোঁচালো, তবু বেরোয় না। বার তিনেক হাই তুলল অবিকল বুড়ো মানুষের মতো শব্দ করে। দারোগামশাই ধমক দিয়ে বললেন, 'টেনে বের করো কুলাঙ্গারটাকে।' রিং মাস্টার সেলাম দিয়ে বলল, 'আপনাকে সামনে দেখে একটু ভয় খেয়েছে।'

অবশেষে দড়ি ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করে তাকে বের করা হয়। কী আলিস্যি তার! বাইরে বেরিয়েও অবিকল বেড়ালের মতো ডন মারল একটা, তারপর ঘুমচোখে চারদিকে চাইতে লাগল। মনে হল, বাঘটা চোখে ভালো দেখতে পায় না, ভুরু কোঁচকানো, খুব ঠাহর করে করে দেখছে।

বিধু দারোগা হাঁক ছাড়লেন, 'দুটোকে জলের কাছে নিয়ে যা।'

তখন হারু মণ্ডল তার দুষ্টু গোরুটাকে আর রিং মাস্টার তার অলস বাঘটাকে দড়ি ধরে

টানতে লাগল। অনেক টানা-হ্যাচড়ার পর দুটোকে জলের কাছে নিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করানো হল বটে, কিন্তু কেউই জলে মুখ দেয় না। বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খাওয়ার কথা। জলই যদি না খায় তো দারোগাবাবুর সম্মান থাকে কী করে! তখন হারু মণ্ডল তার গোরুর গলকম্বলে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বলতে লাগল, 'খাও মা ভগবতী, জল খাও। এই একবারটি

খাও মা, আর কখনো বলব না। ওই ছাগলের মতো বাঘটাকে দেখে ডরিয়ো না মা, ওর দাঁত নড়ে, চোখে ছানি, বড়ো ভীতু জীব।'

ওদিকে রিং মাস্টারও সপাসপ চাবুকের শব্দ করে বাঘটার ল্যাজ মলে দিয়ে বলে, 'ড্রিঙ্ক্ ওয়াটার বেঙ্গল-টাইগার, ড্রিঙ্ক, কাম, কাম, হ্যাভ কারেজ, দি কাউ উইল ফ্লাই অ্যান্ড শো হার লেজ। ড্রিঙ্ক, ড্রিঙ্ক—'

দারোগাবাবু উঠে ফের হাঁক দিলেন, 'দুটোর দড়ি খুলে দে। আপ্‌সে জল খাবে।'

তো তাই হল। হারু মণ্ডল তার গোরুটাকে ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'কাল থেকে তোকে জল দিইনি মা, দারোগাবাবুর মুখ চেয়ে এতক্ষণ তেষ্টায় কাঠ করে রেখেছি, এবার চোঁ চোঁ করে পেট ভাসিয়ে খা মা।'

রিং মাস্টারও তার বাঘকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ইউ হ্যাভ নো ওয়াটার টু-ডেজ বেঙ্গল, নাউ ড্রিঙ্ক।'

দৃশ্যটা দেখার মতোই। এই আমরা প্রথম দেখলাম জীবনে। একটা গোরু আর একটা বাঘ পাশাপাশি ভাই-বোনের মতো দাঁড়িয়ে মুখ নীচু করে একঘাটে জল খাচ্ছে। সবাই রইরই করে উঠে দারোগাবাবুর জয়ধ্বনি দিতে থাকল। কবিয়াল দু-কড়ি হালদার গান বেঁধে গাইতে লাগল, 'ধন্য হে দারোগা বিধু, তুমি ধন্য, ধন্য হে। একই ঘাটে জল খায় গাই আর ব্যাঘ্র বন্য হে—'

কিন্তু জয়ধ্বনির রেশ তখনও মিলিয়ে যায়নি, দু-কড়ি কবিয়াল 'হে'র টান দিয়ে তখন দম ধরে রেখেছে, এমন সময়ে বাঘটা জল থেকে মুখ তুলে গোরুটার দিকে তাকাল। গোরুটাও তাকাল বাঘটার দিকে। ফোঁস ফোঁস করে দু-জনের নিশ্বাস পড়ল। বাঘটা গোরু চেনে, সে গন্ধ পেয়ে পাশে দাঁড়ানো গোরুটাকে শুঁকছে। চোখে ভালো দেখতে পায় না বলে বোধ হয় ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না। কিন্তু হারু মণ্ডলের গোরু কখনো বাঘ দেখেনি, তাই সে একটুও ঘাবড়াল না। বরং সে বেশ রাগের চোখে বাঘটাকে দেখতে লাগল। সেটা হাড়-হারামজাদা গোরু, বহুবার খোঁটা উপড়েছে, খোঁয়াড়ে গেছে, তার গুঁতো খায়নি এমন মানুষ গাঁয়ে বিরল। বাঘটার ভাবসাব দেখে সে বোধ হয় বেশ বিরক্ত হয়েছিল, তাই বাঘের মুখের ওপরেই সে ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে একটু এগোল।

দারোগাবাবু মহানন্দে গোঁফ চুমড়ে দৃশ্যটা দেখছেন তখন। হাসেন না বটে, কিন্তু হাসি তাঁর চোখের দৃষ্টি, গালের মাংস, আর ভাবভঙ্গির মধ্যে ফুটে উঠছিল। বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাচ্ছে।

গোরুর ফোঁস শুনে বাঘটা দু-পা পিছিয়ে এল। বহুকাল অভ্যাস নেই বলেই বোধ হয় হাঙ্গামায় যেতে চাইল না। কিন্তু গোরুটা বদমেজাজি। তার তখন রোখ চেপেছে। সে একটু শিং নাড়া দিয়ে দু-পা এগোল। বাঘটা আবার পিছিয়ে আসে। গোরুটা একটা 'হাম্বা' দিয়ে হঠাৎ

আড়মোড়া ভেঙে মাথাটা নীচু করে হড়হড় করে এসে হুম করে একটা ঢুঁ দিল বাঘটাকে। বাঘটা মারপিট ভুলেই গেছে। আচমকা ঢুঁ-টা খেয়ে ভ্যাবাচাকা মেরে আলিস্যি ঝেড়ে দুই লাফে উঠে এল ঘাটের চাতালে। পিছনে গোরুটা।

দারোগাবাবু চেয়ার ছেড়ে পৈঠায় উঠে গেলেন সাঁত করে। লোকে থ'। এমনটা হবে কেউ ভাবেনি। এ কী দৃশ্য রে বাবা! প্রকৃতির সব নিয়মকানুন যে ভণ্ডুল হয়ে গেল! বাঘটা তখন দিঘির ধারের মাঠটায় প্রাণভয়ে ছুটছে। হারুর গোরু মহাতেজে শিং নেড়ে দৌড়োচ্ছে তার পিছু পিছু, গুঁতোবেই। বাঘটা হালুম-মলুম বলে ডাক ছাড়ছে প্রাণপণে। গোরুটা হাম্বা-খাম্বা বলে তম্বি করছে তাকে। সে কী দৌড়! যেমনি বাঘ ছোটে, তেমনি গোরু। ছুটতে ছুটতে বাঘের দমসম অবস্থা। ভারি কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা। হারু মণ্ডল বিস্তর ডাকাকাকি আর সাধাসাধি করে তার গোরুকে ফেরাতে চাইছে, গোরু ফিরছে না। রিং মাস্টার ডুকরে উঠে বলছে, 'ও ভাই হারু, আমার গরিব বাঘটাকে তোমার গুণ্ডা গোরু মেরে ফেলল!'

তা ফেলতই মেরে। বাঘটা ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে পড়েছে তখন, গোরুটা মহাতেজে প্রায় ধরো ধরো করে ফেলেছে তাকে, এমন সময়ে হারু মণ্ডল গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল তার ভগবতীর সামনে, বলল, 'মা গো, অনেক লীলা দেখিয়েছ মা। অনেক বাঘ-সিংহী ধরে দেব মা তোমায়, সব কটাকে গুঁতিয়ে টি টি কোরো। আজ যে তোমার জাবনার সময় হয়ে গেছে মা।'

এইসব শুনে ভগবতী দাঁড়িয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। বাঘও ফাঁক বুঝে এক লাফে খাঁচায় ঢুকে ঝাঁপের দরজাটা ফেলবার জন্য নিজেই পিছনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে টানাটানি করতে লাগল। খাঁচার ওপরের লোক দু-জন ঘাপটি মেরেছিল, তাল বুঝে ঝপ করে দরজা ফেলে দিল। বাঘটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে হ্যা-ল্যা করে হাঁপাতে লাগল।

এই ঘটনার পর বিধু দারোগার নামযশ সহস্র গুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গঞ্জে। তাঁর রাজত্বে শুধু বাঘে-গোরুতে একঘাটে জলই খায় না, সেখানে গোরুর তাড়ায় বাঘেরও জান লবেজান হওয়ার জোগাড়। সুতরাং সাবধান!

সবাই তাই সাবধান হয়ে গেল। চুরি-ছ্যাঁচড়ামি বন্ধ, ডাকাতি বাড়ন্ত, ঝগড়াঝাঁটি পর্যন্ত দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রবীণ লোকেরা থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে জুতো ছেড়ে রেখে থানার উদ্দেশে হাতজোড় করে ভক্তিভরে প্রণাম করে যায়। যেমন সবাই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে করে। বিধু দারোগা ব্যাপার দেখেন আর হাসেন। না, হাসেন না ঠিক, কিন্তু হাসি তাঁর গোঁফের ডগায় ঝুলে থাকে, নাকের ডগায় কাঁপে, ভুরুতে নাচে। সবাই বুঝতে পারে, বিধু দারোগা হাসছেন। অথচ হাসছেন না। ময়রারা দারোগা-সন্দেশ, বিধু-অমৃতি বের করে ফেলল। খুব বিক্রি।

ওদিকে ভগবতীর খুব নামডাক। গঞ্জের লোক তো আছেই, আশেপাশের গাঁ-গঞ্জ, বহুদূরের

ভিন্ গাঁ, এমনকী শহর থেকে পর্যন্ত লোক ঝেঁটিয়ে আসছে রোজ। সকলেই ভগবতীর জন্য রাশি রাশি খাবার আনছে। শাক-পাতা, লাউ-কুমড়োটা তো আছেই, সেই সঙ্গে সন্দেশ-রসগোল্লা, দুধ-দই, এমনকী ঘি-মাখন পর্যন্ত। হারু মণ্ডলের গোয়ালঘরে পাহাড়-প্রমাণ খাবার জমে গেল। অলৌকিক গোরুর মহিমা শুনে জমিদারমশাই বিলিতি নেট দিয়ে ভগবতীর জন্য ভালো মশারি করে দিলেন, সেই সঙ্গে সাটিনের বালিশ, তাকিয়া পর্যন্ত। ভগবতী সারাদিন ঘরে খায়, রাতে মশারির তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে জাবর কাটে আর ঘুমোয়। তার তাগড়াই চেহারা হয়েছে। মোটা হয়ে গরমে হাঁসফাঁস করলে ভক্তরা তাকে হাতপাখার বাতাস করে ঠান্ডা রাখে। সাহাগঞ্জে 'ভগবতী বিদ্যালয়' নামে ইস্কুল খোলা হল। 'ভগবতী তৈল' নামে একটা বাতের মালিশ বেরিয়ে গেল।

তখন কিছুদিনের জন্য ভগবতী গোরু আর বিধু দারোগার কথা ছাড়া লোকের মুখে অন্য কথা নেই। বিক্রি মন্দা বলে সার্কাসওলা তাঁবু গুটিয়ে পালিয়েছে। কাছেপিঠে আর বাঘ-ভালুকও নেই যে ভগবতী গিয়ে গুঁতোবে। খেতে খেতে চোয়াল ব্যথা।

বিধু দারোগার দশাও তাই। চোর নেই, ডাকাত নেই। শুয়ে বসে গতরে জং ধরে গেল। লোকে রোজ পাঁঠা, মুর্গি, ডিম, তরি-তরকারি, মাছ দিয়ে যায়। খেতে খেতে খিদে মরে গেছে। বহুকাল আর খিদে পায় না বিধু দারোগার। খাবার দেখলে হাই ওঠে। দারোগার ঘোড়াটার পর্যন্ত পায়ে চর্বি জমেছে। নিয়মমাফিক রোজ একবার বিধু দারোগা ঘোড়ার পিঠে চড়ে গঞ্জে চক্কর মারেন। নাঃ, কোথাও কোনো হাঙ্গামা হয়নি। বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে থানার দাওয়ায় বসে গম্ভীরভাবে হুঁকো টানেন তিনি।

একদিন সকালে একটা লোক আধমন ওজনের একটা পাকা রুইমাছ নিয়ে এসে দারোগা সাহেবকে প্রণাম করে হাতজোড় করে সামনে বসল। বিধু দারোগা প্রকাণ্ড মাছটা দেখে অরুচিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটা ভাবল, দারোগা সাহেবের বুঝি এত ছোটো মাছ পছন্দ হয়নি, তাই ভয় খেয়ে মিনমিন করে বলল, 'বড়োবাবু, আমার পুকুরে এর চেয়ে বড়ো মাছ আর নেই। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, মাছটাও পুঁটিমাছের মতো ছোটো, তবু যদি আপনার ভোগে লাগে তো—'

বিধু দারোগা ফস করে একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'খিদে পায় না যে বাপ, আমার যে আর খিদে পায় না। বড্ড অরুচি।'

লোকটা ফের একটা প্রণাম করে বলে, 'বড়োবাবু, অপরাধ নেবেন না, তা যদি বলেন তো বলি, ঠাকুর-দেবতারাও কোন জন্মে অমৃত খেয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন, খিদে তো তাঁদেরও পাওয়ার কথা নয়। তবু কী লোকে ভোগ-নৈবিদ্যি দিতে ছাড়ে! ভক্তদের মুখ চেয়েই তাঁরা অরুচি নিয়েও খান। আমি তো বুড়ো হতে চললাম, তবু জন্মেও শুনিনি যে রাজা-জমিদার কিংবা লাট বা দারোগার কখনো খিদে পেয়েছে। খিদে তাঁদের কখনো পায়

না, দেবতুল্য লোক সব। তবু খেতে হয় আমাদের মুখ চেয়েই। আমাদের মতো ছোটোলোক হাঘরেদেরই যত খিদে হুজুর।'

লোকটা লাট আর দারোগা একসঙ্গে বলায় দারোগাসাহেব খুশি হলেন। একটু হাসলেন। না, ঠিক হাসি নয় বটে, তবে টাকটা যেন একটু চকচক করে উঠল, গালের মাংসে একটু ঢেউ দিল, ভুঁড়িটা কয়েকবার কেঁপে ওঠল। আবার একটা শ্বাস ফেলে বললেন, 'খিদেই-বা পাবে কী করে। নড়াচড়া নেই, কাজকর্ম নেই, একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। ছ্যা ছ্যা, তোরাই সব

কেমনধারা মানুষ, দারোগাবাবুর খিদে পায় না শুনছিস, সেজন্যও তো একটু শখ করে চুরিচামারি করতে পারিস? চোর-ছ্যাঁচড়ের পিছনে হাঁকডাক দৌড়োদৌড়ি করতে করতে আমারও একটু খিদের মতো হয় তাহলে। কেমন নির্দয় মানুষ তোরা, অ্যাঁ?'

শুনে লোকটা কান পর্যন্ত হাসল। ফের একটা প্রণাম ঠুকে বলল, 'আজ্ঞে বড়োবাবু, সেই জন্যই আসা। সফরগঞ্জে শ্মশানের ধারে কসারবনের মধ্যে বুড়ো বটের তলায় এক কাপালিক এসে থানা গেড়েছে কদিন হল। বড়ো সাংঘাতিক লোক। বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। শুনছি, আজ অমাবস্যার রাতে সেখানে নরবলি হবে। ভয়ে ভয়ে আছি আমরা।'

শুনে বিধু দারোগা একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'বটে!'

সেই হুঙ্কারে গঞ্জের বাড়িঘর কেঁপে উঠল, ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ ডেকে লাফিয়ে উঠল, ধারেকাছের লোকজন সব সাঁত সাঁত করে লুকিয়ে পড়তে লাগল। বাচ্চারা ককিয়ে উঠল, বেড়াল পালালো, কুকুর কেঁদে উঠল, আর কাকগুলো বন্দুকের আওয়াজ ভেবে কা কা করে ভিড় করতে লাগল আশেপাশে। যে লোকটা মাছ নিয়ে এসেছিল তারও একটু মূর্ছামতো হয়েছিল। খানিকক্ষণ পরে সামলে ওঠে সে চোখ মেলে বড়ো সুখে হাসল। হ্যাঁ, এই হল গিয়ে আসল দারোগা। আবার একটা প্রণাম করল সে।

অমাবস্যার নিশুতি রাতে দারোগাবাবু ঘোড়ায় চেপে সফরগঞ্জের শ্মশানে চললেন। সঙ্গে বিস্তর সিপাই, অনেক লোকজন। তাদের হুঙ্কারে শেয়াল পালাল, পাখিরা ঘুম ভেঙে চেঁচামেচি করতে লাগল। খটাশ, ভাম, বেজি, খরগোশ সব জঙ্গলের ছোটো ছোটো গর্তে সেঁধিয়ে কাঁপতে লাগল। বিধু দারোগা বুড়ো বটগাছের তলায় এসে হাঁক ছাড়লেন, কোথায় কাপালিক?

কাপালিক নেই। দারোগাবাবু পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে দেখলেন, খবরটা মিথ্যে নয়। নিভু-নিভু হয়ে একটা ধুনি তখনও জ্বলছে। আশেপাশে বাঘের পায়ের ছাপও দেখা গেল, একটা চকচকে খাঁড়া পড়ে আছে একপাশে, একটা হাড়িকাঠও রয়েছে। দারোগাবাবু পিস্তল বের করে ফের হাঁক দিলেন, কোথায় গেল সেই হারামজাদা কাপালিকটা?

তাই তো! কোথায় পালাল! সবাই ভাবছে।

এমন সময়ে গাছের মগডাল থেকে করুণ স্বরে কে যেন বলে উঠল, 'হুজুর, আমি এইখানে। ভয়ের চোটে বড্ড উঁচু গাছে উঠে পড়েছি, এখন নামতে পারছি না। বাতিটা একটু ধরুন।'

অবাক হয়ে দারোগাবাবু উঁচুতে আলো ফেললেন। বটগাছের ঝুরি আর পাতার ফাঁক দিয়ে অনেক উঁচুতে কাপালিকের লাল কাপড় ও দাড়িগোঁফ দেখা গেল। দারোগাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'নেমে আয়।'

শিড়িঙ্গে চেহারার কাপালিকটা সাবধানে নেমে এল। টর্চের আলো মুখে পড়তেই চোখ পিটপিট করে ভারি ভীতু চোখে চাইল, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দারোগাবাবুর ঘোড়ার পায়ের ওপর,

বলতে লাগল, 'বড়োবাবু' মাপ করুন।' লোকটার চেহারা আর ভাবভঙ্গি দেখে বিধু দারোগা হতাশ হয়ে বললেন, 'তোর বাঘ কই?'

'আজ্ঞে আপনাকে দেখে ভয় খেয়ে ওইদিকের একটা আমগাছে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে বসে আছে। বড্ড ভীতু।'

দারোগাবাবু করাল চোখে চেয়ে বললেন, 'আর নরবলি যাকে দিবি সে লোকটা কোথায়?'

কাপালিক কেঁদে উঠে বলল, 'কোথায় নরবলি হুজুর! কত লোককে সাধ্যসাধনা করলাম, পায়ে ধরলাম, ভয় দেখালাম, কেউ রাজি হল না। তাদেরও দোষ দিই না, বলি হতে কেই-বা সহজে রাজি হয়! হুজুর, বলির কথা না রটালে লোকে সমীহ করে না। তাই রটিয়েছিলাম। কিন্তু আমি আসলে কাপালিক-টাপালিক নই হুজুর! আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি সেই রিং মাস্টার।'

রিং মাস্টার! সবাই হাঁ হয়ে গেল। তাই তো! দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে রিং মাস্টারকে তো চেনা যাচ্ছে একটু-একটু। রিং মাস্টার কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হারু মণ্ডলের গুন্ডা গোরুর তাড়া খেয়ে আমার বাঘটা সেই যে পালিয়েছিল, তাইতে আমার আর বাঘের খুব বদনাম হয়ে যায়। তাই সার্কাস থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। সেই থেকে খিদের জ্বালায় দু-জনে জ্বলে-পুড়ে মরছি। নরবলি-টলি ওসব বাজে কথা, আমরা দু-জনেই ভারি ভীতু জীব বড়োবাবু।'

দারোগাবাবু হাসলেন। না, ঠিক হাসি নয়। তবে তাঁর ভুরু চমকাল। কানটা যেন নড়ে ওঠল, গোঁফের ডগা নীচু থেকে ওপরে উঠে গেল, হাসলেন না, তবু যেন হাসলেন। টর্চের আলোয় সবাই দেখল।

রিং মাস্টার আর তার বাঘকে গ্রেফতার করে আনা হল থানায়। লোক ভেঙে পড়ল দেখতে। রিং মাস্টারের দাড়ি-চুল সব কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। থানার হাতায় কদম গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা বাঘটা লজ্জায় থাবায় মুখ লুকিয়ে মাথা নীচু করে বসে আছে।

হারু মণ্ডল দারোগাবাবুকে প্রণাম ঠুকে বলল, 'হুজুর, আমার একটা আর্জি আছে আপনার বরাবর। আমার ভগবতী কিছু খেতে চায় না। খেলার সঙ্গী নেই বলে দৌড়ঝাঁপ করতে পারে না, তাই খিদে হয় না। গাঁ-গঞ্জে ষাঁড়-গোরু সবাই ওকে ভয় খায়, তাই কেউ মেশে না ওর সঙ্গে। তাই বলি হুজুর, বাঘটা আমায় দিয়ে দিন। ভগবতী ওকে ঢুঁ মেরে মেরে খেলবে। তাতে ওর খিদে হবে। আমি বরং বাঘের দাম বাবদ এক-শো টাকা ধরে দিচ্ছি।'

তো তাই হল। হারু মণ্ডল দড়ি বেঁধে বাঘটাকে টানা-হ্যাঁচড়া করে নিয়ে গেল। পথে লোকজনকে ডেকে ডেকে বলল, 'সস্তায় বাঘ কিনলাম হে।'

কিন্তু ভগবতী মোটা হয়ে যাওয়ার পর থেকে খুব অলস হয়ে পড়েছিল। বাঘটাকে দেখেও তেড়ে-টেড়ে গেল না, কেবল একটা ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল। সেই শ্বাসের শব্দে বাঘটা পালাতে

যাচ্ছিল, হারু মণ্ডল তাকে খড়মপেটা করে টেনে আনল ফের। ভগবতীর গোয়ালেই বেঁধে রাখল তাকে। সেই থেকে বাঘটা গোয়ালেই থাকে। মাছের কাঁটা বা মাংসের হাড়মাখা ভাত খায়। মাঝে মাঝে ভগবতীর জাবনার গামলাতেও মুখ দিয়ে বিস্বাদে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবু চেষ্টা রাখে। ভগবতী স্নেহভরে মাঝে মাঝে বাঘটার গা চেটে দেয়। বাঘটা থাবা দিয়ে ভগবতীর পিঠ চুলকোয়।

দেশসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়ে দেখতে। হুঁ বাবা, বাঘে-গোরুতে এক গোয়ালে থাকে। দু-কড়ি কবিয়াল গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়, 'বিধুর নামে দাও রে জয়ধ্বনি। বিধু মোদের নয়নের মণি।। ভগবতীর নামে দাও গো জয়জয়কার। তার গোয়ালে বাঘের কারাগার।। জয় জয় বিধু ভাগ্যবান। রাতের বেলায় দিনের আলো, দিনে জ্যোৎস্নার বান...'

শুনে বিধু দারোগা হাসেন। না, হাসি নয় ঠিক। তাঁর গোঁফের ডগায় যেন হাসি দোল খায়, চোখের মণির ভিতরে যেন ঝিকমিক করে, ভুঁড়িটা কেঁপে ওঠে, নাকের ডগা নড়ে, কান দুটো ফড়িঙের পাখনার মতো থিরথির করে ওঠে। হাসেন না। তবু যেন হাসেন।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বাঘ মারি

কথা হচ্ছে, যাকে বলে গালগল্প। চার বন্ধু বসেছে আড্ডায়। চিনার ফরেস্টের ডাকবাংলোয়। চারজন এসেছে পুজোর ছুটি কাটাতে। প্রতি বছরই এই চারজন কোথাও-না-কোথাও যাবেই। নদীতে, পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে। সব ক-জনেরই পায়ে ডানা বাঁধা। ঘরে মন টেকে না। চারজনেরই বয়স চল্লিশের কোঠায়। চারজনই বড়ো চাকরি করে। শরীর-স্বাস্থ্য ভালোই। একই স্কুলে চারজন একই ক্লাসে পড়ত। সবই ভালো। একটাই যা গোলমাল, চারজনই বড়ো বড়ো কথার মাস্টার। বোলচালের শেষ নেই। এ হাতি মারে তো, ও মারে বাঘ। এ আলপ্‌স পাহাড়ে উঠেছে তো, ও চড়ে বসে আছে এভারেস্টে। এ কুমিরের লেজ ধরে টেনেছে, ও ধরেছে অজগর। রাজা উজির মারায় চারজনই ওস্তাদ। কেউ কারো কাছে হারতে রাজি নয়।

চারজনের নাম হল অমল, বিমল, কমল, পরিমল।

বেলা চারটে-টারটে হবে। দুপুরের খাওয়াটা বেশ টাইট হয়েছে। ডাকবাংলোর চৌকিদার গজানন। তার বউয়ের নাম চম্পা। রান্নার হাত খাসা। এমন মাংস রাঁধে, যেন কথা বলছে। পরোটায় এমন প্যাঁচ মারে, আঙুল ঠেকালেই মুচুর মুচুর শব্দ। বিরিয়ানিতে অ্যায়সা দম লাগায়, ঢাকনা খোলামাত্রই গন্ধে মানুষ আধপাগলা। লুচির সঙ্গে কাবাব অ্যায়সা লড়িয়ে দেয়, কেয়া বাত, কেয়া বাত! খাওয়ার পর একঘণ্টা আর বাংলায় বাতচিত করা যায় না, মায়সাল্লা, হাল হকিকৎ, মরহুম, এইসব বুলি অটোমেটিক বেরোতে থাকে।

সকালে বিরাট একটা ওয়াক হয়ে গেছে। বিকেলে আর নো ওয়াকিং। স্রেফ আড্ডা। শীতটাও জমিয়ে পড়েছে। পাহাড়টাহাড়গুলো সব জবুথবু। অস্ত সূর্য শীতে কাঁপতে কাঁপতে বনের ওপারে পাহাড়ের আড়ালে জঙ্গালের কম্বলে তাড়াতাড়ি শুতে যাচ্ছে। চম্পা এক রাউন্ড চা দিয়ে গেছে। সন্ধ্যের পর কফি দেবে।

গজানন একটু আগে সাবধান করে দিয়ে গেছে, ঝোরার পাশে নরম বালিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছে। বাবুরা হুঁশিয়ার! বেশি রাত পর্যন্ত বাইরে বসে বসে ওই যে কী যেন দেখেন, আজ আর দেখবেন না। ওই যে নেচার না কী। বাঘ দেখে ফেললে বিপদ আছে। এটা নাকি মানুষ খায়। আগে একটা এসেছিল, সেটা খুব ভালোমানুষ ছিল, শুধু ফুলকপি খেত।'

অমল বলল, 'কী যা-তা বলছ! বাঘ কখনো ফুলকপি খেতে পারে! বাঘ মানুষ খায়।' অমল বললেই তো বিমল বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারে না। বলল, 'কে বলেছে বাঘ হিংস্র প্রাণী! প্রাণীজগতে মানুষই সবচেয়ে হিংস্র।'

কমল বলল, 'হতে পারে, তার মানে এই নয় বাঘ গোরুর মতো ঘাস খাবে।'

পরিমল বলল, 'আমি নিজে বাঘকে আলোচালের হবিষ্য খেতে দেখেছি।'

অমল কুঁক-কুঁক করে এক রাউন্ড হেসে বলল, 'তুমি বাঘ দেখেছ। শুধু দ্যাখোনি। সেই বাঘ তোমার সামনে আলোচালের ভাত খেয়েছে, ডালভাতে আর কাঁচকলা দিয়ে। গাঁজাখুরি গল্প আমি সহ্য করতে পারি না।'

'এই দ্যাখো। সত্যি কথাটাকে তোমরা মিথ্যে ভাবছ। আমি যদি যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে পারি, তাহলে মানবে তো!'

'এর আবার যুক্তি-তর্ক কী! বাঘ মাংস খায়। শ্রীচৈতন্যের আমলেও খেত, আজও খায়।'

'আমি যে-বাঘটার কথা বলছি, সেটা ছিল বিধবা বাঘিনী। কপুরথালার মহারাজার গুলিতে তার স্বামী মারা গিয়েছিল। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, সেই সময় এদেশের বিধবারা মাছ-মাংস খেত না। এর ওপর আর কোনো কথা চলে?'

গজানন বলল, 'না, চলে না। বিধবা হলে মাছ-মাংস খাবে কী করে! আমার মা বিধবা, আমি জানি।'

'তুমি সব জানো! বাঘের আবার বিধবা-সধবা কী! বাঘ কি টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করে?'

অমল রেগে গেছে! গজানন চলে গেল। রাতের রান্নার জোগাড় দিতে হবে। বাবুরা ভালো-মন্দ খায় আর খুব খায়। গজানন চলে যাওয়ার পর অমল বলল, 'বাঘ তোমরা সেভাবে কেউ দ্যাখোনি, আমি যেভাবে দেখেছি। আমি নেলকাটার দিয়ে বাঘের নখ কেটেছি।'

পরিমল বলল, 'কেন, তোমার কি সেলুন ছিল?'

'ঝট করে একটা কমেন্ট করলে! আসল কথাটা শুনলে না। আমার দাদু ছিলেন ডাক্তার। দিশেরগড় রাজ স্টেটের চিফ মেডিকেল অফিসার হয়ে গেলেন। আমরাও গেলুম। মহারাজ খুশি হয়ে দাদুকে একটা বাঘের বাচ্চা উপহার দিলেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটা বেড়াল বাচ্চার মতো। হবে না কেন! বেড়াল তো বাঘেরই মাসি। কী তার ওজন! হাসি-হাসি মুখ।'

'গায়ে বোটকা গন্ধ ছিল না?'

'বোটকা গন্ধ থাকবে কেন? মহারাজার বাঘ। রোজ চান করে আতর মাখে।'

'বাঘটা যখন বড়ো হল, তখন কি একে-একে সব খেয়ে ফেলল! তোমার দাদুকে, দিদাকে, তোমাকে?'

'আজ্ঞে না! একটা কথা জেনে রাখো, বাঘের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করলে বাঘও তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। বাঘ মানুষ নয়।'

'তা বাঘটা বড়ো হল, না বনসাই গাছের মতো চিরকাল ছোটোই রয়ে গেল!'

'রীতিমতো বড়ো হল। আমরা ভাইয়েরা সেই বাঘের পিঠে চেপে বাগানে ঘুরতুম।'

'তারপরে চেপেই রইলে, চেপেই রইলে, কারণ শুনেছি বাঘের পিঠে চাপলে আর নামা যায় না।'

'ওটা একটা ইংরেজি প্রবাদ, রাইডিং এ টাইগার। ওটার সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই। বাঘটা ছিল ইংরেজদের মতোই, ম্যানার্স আর এটিকেট জানা ভদ্রলোক। রাতে বিছানায় আমাদের পায়ের কাছে ঘুমোত। সকালে উঠে টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজত।'

'খবরের কাগজ পড়ত?'

'ইয়ার্কি কোরো না, এইরকম সিভিলাইজড বাঘ আমি আর দুটো দেখিনি।'

'কী করে দেখবে, ওটা তো বাঘ ছিল না, বাঘ্রচর্মাবৃত মানুষ ছিল।'

বিমল বলল, 'শেষপর্যন্ত বাঘটার কী হল! মানুষ হয়ে গেল?'

'দাদু দিশেরগড় থেকে চলে আসার সময় বাঘটাকে অনেক দামে একটা সার্কাস কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকায় একটা জাগুয়ার গাড়ি কিনেছিলেন।'

বিমল বলল, 'আমার সঙ্গে একবার একটা বাঘের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছিল।'

পরিমল বলল, 'তাহলে, আসল বিমলটা গেল কোথায়?'

'ঠিক বুঝলুম না।'

'যে বিমলের সঙ্গে বাঘের দেখা হয়েছিল, সে তো বাঘের পেটে গেছে।'

'বাঘটা খুব অন্যমনস্ক ছিল, আমাকে গ্রাহ্যই করেনি, আমিও বাঘ বলে চিনতে পারিনি। আর চিনতে পারিনি বলেই বাঘটা আমার সঙ্গে বাঘের মতো ব্যবহার করেনি।'

'কোথায় দেখা হল? ময়দানে?'

'ঘটনাটা ঘটেছিল মান্দার হিলে। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছি। হাঁটছি, হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে ফল্গু নদীর ওপর লম্বা একটা ব্রিজে এসে গেছি। দেখি কী! উলটো দিক থেকে আসছে। বেশ হেলতে-দুলতে। সূর্য ডুবছে। নদীর বালি চিকচিক করছে। গাছপালার মাথায় শেষ বেলার রোদ। আমি ভেবেছি একটা কুকুর। জলবায়ু ভালো। মানুষ চেঞ্জেও আসে। হতেই পারে। স্বাস্থ্যবান কুকুর! ব্রিজের শেষ মাথায় তিন-চারজন লোক, হাতে লাঠি। আসছে। আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'দেখা, ইধার কোই শের গিয়া। এক শের নিকালা।' সঙ্গেসঙ্গে ধরেছি ওটা স্বাস্থ্যবান কুকুর নয়, বড়ো একটা বাঘ। মার দৌড়। দৌড়োতে দৌড়োতে সোজা গয়ায়। একটা দোকানে ঢুকেই এক সের প্যাঁড়া খেয়ে ফেললুম।'

'কতটা বেশি হল জানি না। তবে অনেকটাই কাটতে হবে। মান্দার হিল থেকে দৌড়ে গয়া যাওয়া যায় না, দু' নম্বর, এক সের প্যাঁড়া খেলে মানুষ মারা যায়।'

'মান্দার হিলে এক সের কেন, তিন সের হজম হয়ে যাবে। জলের গুণ। পাথর খেলে পাথর হজম। একজন ফলওলা বাই চান্স একটা বাটখারা খেয়ে ফেলেছিল। তিন-চার গেলাস জল খেতেই বিলকুল হজম।'

'ফল থাকতে বাটখারা খেল কেন?'

'কম ওজনের বাটখারা ছিল, ওয়েট্স অ্যান্ড মেজারসের লোক ধরতে এসেছিল, বাটখারাটা স্রেফ গিলে ফেলল। ইনস্পেকটর বোকা বনে চলে গেল।'

পরিমল বলল, 'তোমরা বাঘ শিকার করেছ কোনোদিন? আমি করেছি কুমায়ুন ফরেস্টে ইন দি ইয়ার নাইনটিন সেভেনটি টু। সে একটা থ্রিলিং ব্যাপার। আমি এখানে, বাঘটা দশ হাত দূরে। দু-জনে মুখোমুখি। চোখে-চোখে তাকিয়ে আছি। বাঘটা আমাকে দেখে জিভ বের করে ঠোঁট চাটছে। ভাবছে, কোনদিক থেকে খাবে!'

'বাঘ সজনে ডাঁটা খায়?'

'মানে?'

'মানে, তোমার যা চেহারা! অনেকটা ডাঁটার মতো।'

'বাঘ সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। বাঘ হাড়-হাড় চেহারার মানুষ খুব পছন্দ করে। ওই যাকে বলে হাড়ে-মাসে। বাঘটাকে আমার মারার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। ওর ফচকেমি দেখে রাগ ধরে গেল। একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব। বললুম 'ইয়ার্কি হচ্ছে'! একটামাত্র গুলি, কপালের, মাঝখানে। মেরেই বললুম 'সরি। বাঘটা 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে শুয়ে পড়ল।'

'তাহলে সেই বাঘের ছালটা কী হল?'

অমল বলল, 'কেন! ওই শ্রীমহাদেবকে দুর্গাপুজোর সময় দিয়ে দিয়েছে। বাবা তো কৈলাসে ইদানীং ওইটা পরেই ঘুরছেন।'

পরিমল রেগে গিয়ে বলল, 'তোমাদের চরিত্রের একটাই দোষ, কোনো কিছু বিশ্বাস করতে চাও না। বাঘ মারাটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। যে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারে, সে বাঘও মারতে পারে। দুটোর জন্যই প্রয়োজন সাহস আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।'

'শেষের শব্দটা কী বললে! ওটা শুনলেই বাঘ সেন্সলেস হয়ে যাবে! মুখে বাঘ সব বাঙালিই মারতে পারে। সত্যি বাঘ এলে কী হবে, বলা শক্ত।'

'দুঃখ একটাই, সত্যি বাঘের দর্শন মেলে না।'

বাইরে থকথকে অন্ধকার। গাছের পাতায় বাতাসের ঝুপুর ঝুপুর শব্দ। হঠাৎ দূরে খুব একটা হইহই শোনা গেল। সঙ্গে টিন, ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দ।

অমল বলল, 'আজ মনে হয় ট্রাইবালদের কোনো উৎসব আছে।'
পরিমল বলল, 'আমার সন্দেহ অন্য, এ তোমার গিয়ে বাঘ তাড়ানোর শব্দ।'
বিমল বলল, 'হাতিও হতে পারে। বুনো হাতিরা বহুত অত্যাচারী।'

কথাটা শেষ হয়েছে কী হয়নি, চারজনের মাথার ওপর দিয়ে বিশাল একটা কী জাম্প করে খোলা দরজা দিয়ে সোজা ঘরে। সেখানে যা কিছু ছিল সব দুদ্দাড় করে পড়ে গেল। বিশ্রী একটা বোটকা গন্ধ।

চারজনেই একটা কিছু বলার চেষ্টা করছে, ভয়ে বাক্য সরছে না, বা-বা-বা।

সত্যিই বাঘ! বাঘটা নিজেকে একটু সামলে-সুমলে বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতে দরজার সামনে এসে বসল। হাঁড়ির মতো গম্ভীর মুখ। চোখ দুটো জ্বলছে। লেজটা পেছন দিকে অনেকদূর চলে গেছে। প্রায় খাট পর্যন্ত। বাঘটা যেন পর্যবেক্ষণ করছে। চারটের মধ্যে কোনটাকে খাওয়া যায়। অমলই সবচেয়ে লোভনীয়। বেশ মোটাসোটা। রেওয়াজি শরীর। চারজনেই স্থাণু হয়ে গেছে। শরীর পাথরের মতো ভারী। চোখ বুজে চারজনেই সরু-মোটা সুরে মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলে চলেছে, 'বাবা, বাবা।'

লাঠি, সড়কি, বল্লম নিয়ে দলটা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। দৃশ্য দেখে থমকে গেছে। বাঘটা যেন টেররিস্ট। বাবু চারজন তার হোস্টেজ। ভাবটা এই, হয় আমাকে যেতে দাও, নয়তো এই চারটেকে চিবোই। দু-পক্ষই থমকে আছে। কী হয়, কী হয়! বাঘটা একটু এগিয়ে এসে অমলের চেয়ার ঘেঁষে কুকুরের মতো বসল।

সাহস বটে চম্পার! রান্নাঘরে তিন কেজি মাংস মশলা মাখিয়ে রেখেছিল। চাঁপ তৈরি করবে বলে। সেই থালাটা নিয়ে একেবারে বাঘের সামনে। বাঘটা যেন তার বনবাসী ছেলে, 'খোকা! তুই এসেছিস বাবা?'

বাঘটা যেন হাসল। খুশিতে লেজ নাড়াতেই ঘরের ভেতরের সেন্টার টেবিলটা দেশলাইয়ের খোলের মতো ছিটকে এধার থেকে ওধারে চলে গেল।

চম্পা বলছে, 'ওরে আমার সোনা। কতদিন ভালো-মন্দ খাওয়া হয়নি। গোরু, ছাগল, মোষ খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। এই নাও, কাবাব খাও।' বাঘের সামনে থালাটা রাখতেই সব চেটেপুটে সাফ। ঝাল লেগেছে।

চম্পা বলল, 'এইবার কি একটু দুদু খাবে! না, মাংসের সঙ্গে দুধ খায় না। বদহজম হবে। বাবুদের জন্য ফোটানো জল আছে ক্লোরিন দেওয়া। সেই জল খাও।'

গজানন এক গামলা জল নিয়ে এল। বাঘ চকচক করে পুরো জলটা খেয়ে বিশাল একটা হাই তুলল।

চম্পা বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি, সোনার আমার ঘুম পেয়েছে। আজ আর বনে-জঙ্গলে শুয়ে কাজ নেই, যাও, বাবুদের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

বাঘটা কী বুঝল কে জানে, সত্যি-সত্যিই একটা খাটে উঠে শুয়ে পড়ল। চম্পা বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। তাকিয়ে দেখল, বাবু চারজন প্রায় অজ্ঞান।

'এই বাবু।'

ঘড়িতে দম দিলে টিক-টিক শব্দ। বাবু চারজন সেইরকম আবার শুরু করল, 'বাবা, বাবা।'

'ঘ লাগাও, ঘ। বাবা নয়, বাঘ, বাঘ।'

অমল উঠে দাঁড়াল। ট্রাউজারটা টিলে হয়ে কোমরের নীচে ঝুলে গেল।

'এ কী, আমার ভুঁড়ি! আমার ভুঁড়িটা কোথায় গেল!'

'চুপসে গেছে বাবু।'

'এতকাল যোগাসনে যা হয়নি!'

বিমল বলল, 'রাতে আমরা কোথায় থাকব?'

'ভি. আই. পি. এলে সাধারণ মানুষকে বাংলো ছেড়ে দিতে হয়। আজ আপনারা জঙ্গলে থাকবেন।'

গজানন বলল, 'ওই যে কী দেখেন আপনারা সেইসব দেখবেন, নেচার।'

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আতাপুরের বাঘ

রাধামোহনবাবুর দিন যত যাচ্ছে হ্যাপা তত বাড়ছে। এক বয়সে ভেবেছিলেন আর কী, পুত্ররা লায়েক হয়ে গেলেই তুড়ি মেরে জীবন কাটিয়ে দেবেন। খাবেন-দাবেন, দেশ ভ্রমণে বের হয়ে পড়বেন। কোনো দায় থাকবে না। পুত্রদের মানুষ করে তোলাই বড়ো কাজ। মা-বাবার আর দায় নেই। তাঁরা গত। ভাইদের থিতু করে দিতে পেরেছেন, বোনেদের সৎপাত্রে দান করে খুশিই ছিলেন, বাড়িঘর বানিয়ে নিজেও থিতু হতে গিয়ে দেখলেন, সব গড়বড় হয়ে গেছে।

তিনি সকালে ওঠেন, কেউ সকালে ওঠে না।

সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস, কেউ চা করে দেয় না।

'আরে, চায়ের কী হল!'

রান্নার মেয়েটির গলায় ঝাঁজ, 'একসঙ্গে হবে। বউদি বারণ করেছে।'

বাড়িতে আটজন লোক, তিনজন কাজের লোক। খায়দায়, থাকে। মাইনেও কম না। আয়া থাকলে তার এক হ্যাপা, তাও তাঁর জানা ছিল না। গরিব বাবার পুত্র তিনি। স্বামী-স্ত্রীর রোজগারে বাবার সংসার, নিজের সংসার। টেনেটুনে কোনোক্রমে চলে যেত। শেষে সেই মানুষ এত বড়ো গাড্ডায় পড়ে যাবেন স্বপ্নেও ভাবেননি।

রান্নার মেয়েটা দেশে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বউমারাও পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বাপের বাড়ি। পড়ে

থাকলেন তিনি, তাঁর গিন্নি আর পুত্ররা। নাও এবারে ঠ্যালা সামলাও। তামাশা দেখার লোকের অভাব হয় না। গিন্নি হার্টের রুগি। তিনিও এখন অকাজের। সুতরাং ফের হেঁশেলে।

প্রতিবেশীরা দেখা হলেই বলবেন, 'কী দাদা, বাঘারুর মা এল?'

'না রে ভাই!'

'কী করছিলেন? ডেকে-ডেকে সাড়া পাচ্ছিলাম না!'

কী যে করছিলেন, না জানার কথা না। তিনি খুবই পেট-পাতলা লোক। সকলে সব জানে। বাবুদের অফিস-কাছারিতে বের হওয়ার সময় ভাত, ডাল, মাছ পাতে দিতেই হয়। তারই আয়োজনে যে ব্যস্ত হেঁশেলে, না জানারও কথা না। তাদের টিফিন। এক হাতে—ঠিকে লোকটিও যতটা পেরেছে কাজ এগিয়ে দিয়ে গেছে। তিনি এখন হেঁশেলে হাত পুড়িয়ে রান্নায় ব্যস্ত, মাথাও কম গরম না।

'পরে কথা হবে।'

পরে কী আর কথা হবে! বউমাদের কথা হবে, মুচকি হাসি। তাও তিনি টের পান। মেজাজ বিগড়ে গেলে গড়গড় করে সংসারের সব কথা বলে দেওয়ার স্বভাব।

'বউমারা কী করে?'

'অফিস করে, কলেজ করে আর বাড়িতে বসে উল বোনে। টিভি দেখে, বই পড়ে। নাটক, সিনেমা, রবীন্দ্রসদন আছে। কাজের অভাব! কেবল অর্ডার। এক গ্লাস জল ভরে খাবে না। কাজের লোকের কী দোষ দেব ভাই! এত ফাইফরমাশ, নিজেরা কুটো গাছটি নাড়বে না।'

'আপনাকে কে খেতে দেয়?'

'বাঘারুর মা।'

'আপনার কাচাকাচি কে করে?'

'বাঘারুর মা।'

'সেই বাঘারুর মা বাড়ি গেছে। দশ দিনের কড়ারে গেছে, আজ এক মাস হয়ে গেল। চিঠিও নেই, ফেরারও নাম নেই। কাছেও না যে ঘুরে আসবেন। বাঘারুর মা আছে বলেই তিনি দু-বেলা দুটো সময়মতো খেতে পান—বাঘারুর মায়ের হাত জোড়া থাকলে কৃচিৎ কখনো ফটাস করে একটা থালা ফেলে দিয়ে যায় কে? কোন বউমার কাজ এটি, বোঝার আগেই তিনি টের পান ভাত, ডাল, মাছ সবই এক পাতে। খা ব্যাটা।'

'বাঘারুর মা আসবে তো?'

'তা কী করে বলব ভাই! আমার আমলে একরকম, বউমাদের আমলে অন্যরকম। আমাকে তোয়াজ করলেই খাপ্পা। তোয়াজ করতে হবে তাদের। লোক টিকবে কেন ভাই? প্রবলেম চাইল্ড বোঝো? আয়াটি বাড়ির একটি আস্ত চালকুমড়ো। নাতি এখন চার বছরের, স্কুলে যায়। কাজটা

কী বলো! তিনি দয়া করে খান আর গড়াগড়ি দেন। তিনি না থাকলে, কার কাছে রেখে যান বলো। আমরা তো বাড়ির কেউ না।'

'সব ক-টাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেই পারেন?'

'পারি রে ভাই! রেগে বলেও ফেলেছিলাম—সব ক-টাকে বাড়ি থেকে বের করে দেব, সেজো পুত্র শুনে হা হা করে হাসল। ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, সকালে বের করে দেবে, সন্ধ্যায় লণ্ঠন হাতে পুত্রদের খুঁজতে বের হবে কোথায় গিয়ে উঠল! তোমার মুখে ওসব কথা সাজে না। তোমাকে আমরা চিনি না!'

'প্রবলেম চাইল্ডদের খবর কী?'

'বাপের বাড়ি। বাঘারুর মা এলে তাঁরাও আসবেন।'

'পোঁটলাপুঁটলি?'

'সঙ্গে। আরে ভাই আমার বাবারও তো কম পোঁটলাপুঁটলি ছিল না! আমরা পাঁচ ভাই, তিন বোন। আমার চার। ওদের তো একটাই—হয় পোঁটলা নয় পুঁটলি। তারই কত বায়নাক্কা। স্কুলে যাও, সাঁতার শিখতে যাও, গানের স্কুল, নাচের স্কুল, খেলার মাঠ, কত কী!'

'তাহলে দাদা হাত পুড়িয়ে ভাত খাচ্ছেন! বাঘারুর মা না এলে আপনার সংসার ফাঁকা। যখন ফিরছে না, চিঠি দিন। না হয় কাউকে পাঠিয়ে দিন। নিজেও চলে যেতে পারেন। বয়েস হয়েছে, একদণ্ড তো বসে থাকতে দেখি না। ওপরে দেখছি ঘরও তুলছেন।'

তা প্রতিবেশীরা মিথ্যা বলে না। ওটা যে কী জ্বালা, রাধামোহনবাবু হাড়ে-হাড়ে টের পান। এ-বয়সে বাঘারুর মার খোঁজে যেতেও সাহস হচ্ছে না। কোথায় ন্যাজাত, কোথায় হাসনাবাদ, কী করে যেতে হয়, বাসে না ট্রেনে, ন্যাজাত হয়েও যাওয়া যায়, আবার হাসনাবাদ হয়েও যাওয়া যায়, তারপর ভটভটিতে—রাতে বাঘও বের হয়, লোকজনও তুলে নিয়ে যায়। অথচ সংসারে বাঘারুর মা না থাকলে যে বাঘের উপদ্রব শুরু হয়, তাতে করে 'দুর্গা, দুর্গা' বলে বের হয়ে যাওয়াও ঢের সুখের! বাঘের পেটে গেলে আরও সুখের, প্রবলেম চাইল্ডদের উৎপাত থেকে বাঁচা যায়!

কত যে সংসারে ফরমাশ—বাবা টেলিফোন বিল, বাবা ইলেকট্রিক বিল, বাবা বাজার, বাবা কলে জল নেই, বাবা বাথরুমের ফ্লাশ কাজ করছে না, বাবা সব ডিম পচা, ডিম পালটে আনুন, ডিম পালটাতে পালটাতে জেরবার, বাঘারুর মা না থাকলে আরও জেরবার। কাজেই পুত্রদের ছুটির দিনে বলেই ফেললেন, 'আমি যাচ্ছি।'

গিন্নি তারস্বরে বলে উঠল, 'কোথায়?'

'বাঘারুর মায়ের খোঁজে।'

'তোমার কি বাঘের পেটে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে?'

'হয়েছে মনে হয়।'

'তাহলে যাও। আমার কী, আজ আছি কাল নেই। এসে দেখবে আমিও আর-এক বাঘের পেটে চলে গেছি।'

'তা আমাদের যাওয়াই ভালো। ছেলেদের ছুটি আছে, আমি না থাকলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না।'

রাধামোহনবাবু খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন ন্যাজাত হয়ে গেলে বিদ্যাধরী নদী পড়বে। বিদ্যাধরী

নদী কালিন্দী হয়ে রায়মঙ্গালে পড়েছে। হাসনাবাদ দিয়ে গেলে ইছামতী ধরে দক্ষিণের দিকে দেড়-দু-ভাটি পথ। তারপর আতাপুর। আতাপুরে বাঘ বের হয়। দিনে দিনে যেতে না পারলে বিপদ। বাঘ রাতের বেলা নদী পার হয়ে আসে। এসব খবর বাঘারুর মা তাঁকে দিয়েছে।

সেই এক সন্ধ্যায় যখন বাঘারুর মা এল, কেমন এক কাকলাশ চেহারা। ক্ষীণকায়, অনাহারে, অর্ধাহারে শরীরে মেদ-মাংস আছে কী নেই, বোঝা মুশকিল। শীতের রাতে হাজির। বিনতার দিদিকে কে গছিয়ে দিয়ে গেছে। সে আবার রামমোহনবাবুকে গছিয়ে দিয়ে গেল। প্রবলেম চাইল্ডদের ফরমাশের ঠেলায় রান্নার লোক যে দু-পাঁচ মাসের বেশি থাকে না, বিনতার দিদি এটা ভালোই জানত। ওদের পছন্দ অপছন্দ খুব বেশি। রাধামোহনবাবু জেরবার, যাকে দেবে তাকেই লুফে নেবেন। সেইসব কারণেই, শীতের রাতে এসে হাজির।

রাধামোহনবাবুর সসেমিরা অবস্থা। হাতের পাঁচ ফেলতে নেই। রেখে দিলেন।

কোটরগত চোখ, অস্থিচর্মসার ক্ষীণাঙ্গীকে প্রশ্ন, 'তোমার কী নাম বাছা?'

হাঁটু গেড়ে প্রণাম। তারপরই 'বাবা' সম্বোধন।

'আজ্ঞে বাবা, আমায় বাঘারুর মা বলে ডাকবেন।'

'বাঘারুর মা! সে আবার কী!' রাধামোহনবাবুর ভারি বিস্ময়!

'বাঘারু আমার বড়ো ছেলে।'

'কী করে?'

'আজ্ঞে, বাঘ মারে।'

'বাঘ! বলছ কী! বাঘ মারা তো বেআইনি। সরকার জানতে পারলে থানা হাজত হয়ে যাবে।'

'আজ্ঞে বাবা, গোরু ছাগলের মতো মারতে মারতে বাঘকে নদীর ওপারে তাড়িয়ে দিয়ে আসে। বাঘ মারলে পাপ হয় আমরা গরিব চাষাভুষো মানুষও বুঝি। আমার বাঘারু বাঘ তাড়িয়ে দেয়, মারে না। বাঘারুর বাপ বাঘের ভয়ে দেশান্তরী।'

'খোঁজ নেই!'

'তা আজ্ঞে, আছে বাবা। মাঝে মাঝে আসে। দিনের বেলায় আসে। রাতে থাকে। ঘর থেকে বের হয় না। কখন বাঘে খায়!'

'বাপকে বাঘে খাবে, বাঘারুকে পিঠে নিয়ে নাচবে, সে কখনো হয়!'

'হয় বাবা। বাঘারু একবার লেজ ধরে বাঘকে খড়ের গাদা থেকে টেনে নামিয়েছিল, স্বচক্ষে দেখা। বাঘ তাড়া খেয়ে দৌড়োয়, বাঘারুও দৌড়োয়। গাঁয়ের লোকও দেখেছে।'

'খড়ের গাদায় বাঘ! আর জায়গা পেল না!'

'বাবা, বাঘের খুব শীত জানেন। শীতে কাতর, কী করবে বাবা। কোথায় যায়। তা বাঘারু

যখন আছে, তার খড়ের গাদায় শুয়ে থাকাই ভালো। সে তো বাঘ মারে না। বনবিবির গোঁসা খুব কঠিন গোঁসা। তারে না ডরালে চলে! বাঘ মারলে দেবী কুপিত হন। বনবিবির বর না পেলে বাঘারু কখনো বাঘ তাড়াতে পারে?'

'বাঘারু যখন আছে বাপ তার বাঘের ডরে দেশান্তরী হয় কেন? বাঘারু তাড়িয়ে দিলেই পারে!'

'ওর যে বাবা আজ্ঞে কপালে লেখা আছে বাঘে খাবে। বাঘারুর ঠাউরদারে খেয়েছে। ঠাউরদার বাপকে খেয়েছে। জঙ্গালে কাঠ কাটতে গিয়ে ফিরে না এলে সুবচনীর থানে হত্যে। কিন্তুক ফেরে না। তা দেবীর দোষ দিয়ে লাভ নেই বাবা। কপালে লেখা থাকলে খণ্ডন করে কার সাধ্য!'

থাকতে থাকতে আরও কত খরব দিত বাঘারুর মা।

ওপরে চা দিতে এসে বলত, 'বুঝলেন বাবা, একবার রাতের বেলা ফিরছি, সোত্রাগাছির মেলা খুব বিখ্যাত। গেলেই কত কিছু কিনতে ইচ্ছে করে। কাচের চুড়ি, কানের টব, ঝাঁঝরি, হাতা, খুন্তি, মাটির কলসি সব কিছু। তা ফিরতে দেরিই হয়ে গেল বাবা। আটঘড়ার বাবুদের বাড়ি সুনসান, কেউ থাকে না। বাঘের দৌরাত্ম্যে সব বাড়িছাড়া।'

রাধামোহনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আরে তোমার কী হল বলো! ফিরছিলে যখন বেশ করেছ, তার আবার এত কথা কেন?'

'আজ্ঞে বাবা, কথাখান ঠিক থাকে না। বাবুদের বাড়ি পার হলেই বনজঙ্গাল। রাস্তা আছে। হেঁতালের ঝোপ, গরান গাছের মতো। বাতাসে নড়ানড়ি করছে।'

বাঘারুর মায়ের এই দোষ। এক কথা বলতে বলতে লাইন পালটে ফেলে।

'আজ্ঞে বাবা, তারপর যা বোঁটকা গন্ধ! জানি, মরণ লেখা। জঙ্গালের ভেতর মচমচ শব্দ। আমরা হাঁটি, তিনিও হাঁটেন। আমরা থামি, তিনিও থামেন। কার ঘাড় মটকাবে কে জানে! বুকে জল থাকে না গো বাবা। ভাগ্যিস বাঘারুর বাপ সঙ্গে ছিল না। থাকলে কী হত বলেন!'

'বাঘারুর বাপকে খেত। শত হলেও কপালে লেখা।' তারপর কী ভেবে রাধামোহনবাবু বলেছিলেন, 'তাহলে বলতে হয় বাঘ তোমার লোক চেনে!'

'কী যে বলেন গো বাবা, চিনবে না! না চিনলে বাঘারুরে বলে চিৎকার করতেই পালায়!'

'বাঘারু কি স্বপ্ন দেখে?'

'না গো বাবা, খেতেই পায় না, স্বপ্ন দেখবে!'

তারপরই কী বুঝে বাঘারুর মা বলেছিল, 'আজ্ঞে, যদি গাঁয়ে যান, বাঘারুর কথা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবে।'

'জঙ্গালে বাঘ কি উঁকি দিয়েছিল, না শুধু মচমচ শব্দই শুনেছিলে?'

আঁধার রাতে বাঘ দেখা যায় না জানেন। আগুনে-চোখ। চোখ জ্বলে। দেখলেই হাত-পা

অবশ। সবাই বনবিবির পাঁচালি সুর করে পাঠ শুরু করে দিলাম বাবা। ও মা, দেখি পা-পা করে এগোচ্ছে আর পরিত্রাহি চিৎকার, ওরে বাঘারু রে, তোর মাকে বাঘে খেল রে! হাঁড়ি, পাতিল ফেলে ছুটব কী! আবার চিৎকার, ওরে বনবিবির দোহাই মানছে না রে বাঘারু। তুই কোথায় গেলি রে বাপ! তোর মা বাঘের পেটে গেলে তুই কী খাবি রে বাপ। বিশ্বাস করেন গো বাবা, এক লাফ। লম্ফঝম্ফ। বনজঙ্গালে তাণ্ডব। ঊর্ধ্বশ্বাসে বাঘারুর নাম শুনেই ডরে পালাচ্ছে।

এত সব কথা রাধামোহনবাবু শুনে বলেছিলেন, 'যাক, তোমার বাঘারু আছে। আমার তো তাও নেই বাছা। তোমার বাঘারুকে নিয়ে এসো একবার, দেখব।'

'কী যে কথা বাবা বলেন গো! গাঁ থেকে তার ছুটি আছে? সে থাকে বলেই গাঁয়ে বাঘ ঢোকে না। বাঘারু বাঘের একটা মুখোশও পরে থাকে। নদী পার হয়ে চুপি চুপি বাঘ গাঁয়ে ঢুকছে শুনলেই, বাঘারু স্থির থাকতে পারে না। গাঁয়ের লোক মিলে একটা হলুদে রঙের জোব্বা বানিয়ে দিয়েছে। বাঘের মুখোশ বানিয়ে দিয়েছে। কোমরে নাকড়া বাঁধা। সে জঙ্গালে ঘুরে বেড়ায় আর বাদ্য বাজায়। আমার বাঘারুর বগলামুখী কবচ আছে, তারে খায় বাঘের সাধ্য কী! ওটা কোন সাধু তপস্বী তারে দিয়ে গেছে।'

'বাঘারুর বয়স কীরকম?'

'সেবারে বন্যা হল না! দেশ-গাঁ ডুবে গেল। আমরা পাঁচ কোশ দূরে স্কুলবাড়িতে উঠে গেলাম। মাঠে তাঁবু পড়ল। আমার বাঘারুও নেমে এল ধরায়। ওর বাপ আহ্লাদে আটখানা। আটকড়াই-এর দিন বাঘারুকে কোলে নিতেই আহ্লাদ বেড়ে গেল তার বাপের—কোলে নিয়ে সে কী কাণ্ড! ওগো কী নাদুসনুদুস—একেবারে বাঘের বাচ্চা!'

এই এক দুঃস্বভাব বাঘারুর মার। কথা সহজে শেষ হয় না। কথা না বলেও পারেন না রাধামোহনবাবু। বাড়িতে কার আর অত সময় আছে তাঁর সঙ্গে বকবক করবে! সবাই যে যার মতো থাকে। বাঘারুর মার সঙ্গেই দু-চারটে তবু কথা হয়। বন্যা কবে হয়েছে, তা দিয়ে যদি বয়স ঠিক করতে হয় তবে তিনি যে নাচার। বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'বন্যা তো দু-চার সাল বাদে-বাদেই হয়। ও দিয়ে কী আর বয়স ঠিক করা যায়!'

তারপরই বলেছিল বাঘারুর মা, 'আমার বাঘারু দুটো ছাগল পুষছে। হাট থেকে ডিম এনে বাচ্চা ফুটিয়েছে। ওর চারটে মুরগি, পাঁচটা হাঁস বাবা। বাঘারু ছাগল, হাঁস পালতে খুব ভালোবাসে।'

বয়স কিছুতেই বলছে না। ছাগল, হাঁস দিয়েও বয়স ঠিক করা কঠিন। বাধ্য হয়ে বলেছিলেন, 'ওর বাপ তো মাসে মাসে আসে। দু-এক রাত থেকেও যায়। দেশান্তরী মানুষ তো, টাকার কথা ভোলে না। একবার বলবে, বাঘারুকে যেন নিয়ে আসে। দেখব।'

'না গো বাবা, বউদিরা কর্তা আসে বলেই প্যানপ্যান করে। বাঘারুর এসে কাজ নেই।'

'কাজ আছে। তুমি বাঘারুকে নিয়ে আসতে বলবে।'

কথা রেখেছিল। বাঘারু বয়স চোদ্দো-পনেরোর বেশি হবে না। সে পাঁচ-সাতদিন ছিল ঠিক, তবে সে তার মায়ের এত ন্যাওটা যে, একদণ্ড তার মায়ের কাছছাড়া হয়নি। ডাকলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ভেতরে ঢুকতে সাহস পায়নি। মনে হয়েছে খুবই গোবেচারা স্বভাবের। সুন্দরবন থেকে হঠাৎ এত বড়ো শহরে ঢুকলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতেই পারে। বাঘারুর দোষ দেওয়া যায় না।

সুতরাং বাধ্য হয়ে বাঘারুকে ডেকে বলেছিলেন তিনি, 'ওরে বাঘারু, চোরের মতো লুকিয়ে বেড়াস কেন, কাছে আয়। আমাকে তোর ভয় কী!'

সে মাথা নীচু করে ঠায় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি বলেছিলেন, 'তুই বাঘ তাড়িয়ে নদী পার করে দিয়ে আসিস?'

সে কিছু বলছে না।

'কী রে, চুপ কেন?'

'আজ্ঞে, গুপ্ত কথা। পাঁচ কান করতে নাই।'

'আচ্ছা ছেলে তো! এমনভাবে কথা বলছ যেন সে সত্যি বাঘ তাড়ায়। বাঘ তাড়াবার গুপ্ত মন্ত্র তার জানা। তোর মা যে বলে, বাঘারু আছে বলে গাঁয়ে বাঘ ঢুকতে সাহস পায় না। তোর এত হিম্মত, দেখে তো মনে হয় না!'

'আজ্ঞে, সব কী দেখে বোঝা যায়! তবে মার কী দরকার ছিল বলার! আমার মা না খুব বোকা।'

এরপর আর কী বলা যায়! তবে ছেলেটিকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, খুবই নিষ্পাপ। বাড়িতে মা থাকে না, বাবা থাকে না, ভাই-বোনদের সামলায়, ছাগল, হাঁস, মুরগি পুষে সংসারের সাশ্রয় খোঁজে, সে যদি বাঘ তাড়ায়ই, দোষের কী!

'তোর বগলামুখী কবচ আছে?'

'তা আছে বাবু।'

'যদি তোর দেশে যাই, বাঘে খাবে না তো!'

'আপনি যাবেনই না। বাঘে খাবে কেন!'

'গেলে খাবে বলছিস!'

বাঘারু এমন অবজ্ঞার হাসি হেসেছিল যে, তিনি কিছুটা বেকুব। বাঘের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই তাঁর মতো লোককে খাওয়ার জন্য নদী পার হয়ে গাঁয়ে ঢুকবে। কিছুটা রসিকতা করার জন্যই বাঘারুর কাছে বাঘের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। বাঘ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা সে পছন্দ করে না এটাও তিনি বুঝেছিলেন। আর তাতেই রাধামোহনবাবু কাবু। হয়তো কিছু একটা আছে বাঘারুর মধ্যে। তিনি কেন যে ভেবে ফেলেছিলেন, বনজঙ্গলে থাকতে থাকতে ছেলেটা জীবজন্তুর দুঃখ-কষ্ট টের পায়। বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকতেই পারে।

রাধামোহনবাবু বারাসাতে গিয়ে বাসে উঠে পড়লেন। সংসারে থাকলেও বাঘের তাড়া, আর জঙ্গালে গেলেও বাঘের তাড়া। তবে সেখানে বাঘারু আছে। সংসারে তাঁর তাও নেই। বাড়ির সবার ওপর ক্ষুব্ধ তিনি। শেষ বয়সে হাত পুড়িয়ে রান্না করা যে কত বড়ো ব্যর্থতা, কে বুঝবে! গিন্নির অনুরোধ, পুত্রদের অনুরোধ কিছুই আর কর্ণপাত করলেন না। খুব সকালে বাস ধরলে ন্যাজাত চার-পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা। সেখান থেকে ভটভটি। ভটভটিতে উঠে গাঁয়ের নাম বলতেই, একজন বলে ফেলল, 'আরে, বাঘারুর গাঁয়ে যাবেন, চলেন। ঘাট এলে নেমে যেতে বলব।'

'কখন পৌঁছোব?'

'নদী ঠান্ডা থাকলে সন্ধ্যা হবে।'

'ঠান্ডা না থাকলে?'

'সেটা ভগবান জানেন।'

কেমন এক গোঁ ধরে গেল। সাঁজ লাগুক, রাত হোক, তিনি যাবেনই। বাড়িঘর আর বনজঙ্গালে তাঁর কোনো তফাত নেই। যদি বাঘের দেখা পাওয়া যায়—তা আরও মজা। বাঘারুর দোহাই, বাঘারুর মায়ের দোহাই দিলেই বাঘ হয়তো রাস্তা চিনিয়ে বাড়ি দিয়ে আসবে।

নদীনালার দেশ এমন বিচিত্র হয়, তিনি জানতেনই না। সারাটা রাস্তা বাসে দাঁড়িয়ে, বসার জায়গা নেই, ঘেমে-নেয়ে কেমন অবসাদ শরীরে মানুষ এভাবে বাঁচে, আগে তিনি যেন জানতেন না। কোলে-কাঁখে বাচ্চা, হাঁটু জুড়ে বাচ্চা, খানাখন্দ পার হয়ে, ফসলের মাঠ পার হয়ে বাস ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে শেষপর্যন্ত ন্যাজাতে নামিয়ে দিলে একটা টুলে বসে কিছুক্ষণ হাঁফালেন, চা-পাউরুটি খেয়ে আতাপুরের ভটভটি ধরেছেন, তারপর কেমন ঠান্ডা-নদীর জল, দু-পারের গাছপালা, নদী ঠান্ডা যে নয়, তাও টের পাচ্ছেন। প্রবল বাতাসে উঠেছে ঢেউ, আছড়ে পড়ছে ভটভটিতে, ডুবে গেলেও হয়—তাঁর নিজের জন্য কোনো ভাবনাই বোধ হয় কাজ করছে না। আসলে গোটা সংসারের ওপর ক্ষোভে তাঁর মাথাও বোধ হয় ঠিক ছিল না।

'আর ভাই কতদূর!'

'এই এসে গেলেন বলে!'

'আর ভাই কতদূর!'

'ওই যে গাঁয়ে লণ্ঠন জ্বলছে, ওটাই, নদীর বাঁক শেষ হলেই ঘাট দেখতে পাবেন।'

কিন্তু ঘাটে নেমে বুঝলেন, বেশ রাত হয়ে গেছে। গাঁয়ের কোনো চিহ্ন নেই। শুধু চারপাশে ঝোপজঙ্গাল, আর ঘন হেঁতালের ঝোপ। ভটভটি থেকে ক-জন সওয়ারি নেমে নদীর পাড় ধরে হাঁটা দিলে, তাঁর কেমন সংবিৎ ফিরে এল।

'শুনোন।'

মাথায় ধানের বোঝা। সে অতিকষ্টে তাঁর দিকে তাকাল। গাঁয়ের সাদাসিধে মানুষ। গায়ে ছেঁড়া

গেঞ্জি। হাঁটুর ওপর কাপড় পরা। কোমরে গামছা বাঁধা। সে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু কবেন বাবু?'

ঘাটে শুধুমাত্র একটি হ্যাজাক জ্বলছে। ঝুপড়িমতো ঘরে কেউ একজন বসে রামপ্রসাদী গাইছে। তিনি বললেন, 'এটা আতাপুরের ঘাট তো?'

'আজ্ঞে বাবু, আতাপুরের ঘাট।'

'গ্রামটা কোন দিকে?'

'ও তো এক ক্রোশ পথ।'

পড়ে গেলেন মহাফাঁপরে। ঘাটের ঝুপড়িতে বসে মনের সুখে একজন কেউ হবে রামপ্রসাদী গেয়েই চলেছে। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট কিছু দেখাও যায় না। এই প্রথম তিনি টের পেলেন, বড়োই বিপাকে পড়ে গেছেন। রাগের মাথায় বের হয়ে এসে ঠিক কাজ করেননি। নদীর জলে কলকল শব্দ। বিশাল নদী, পাড় কোথায় বোঝারও উপায় নেই।

'তুমি কোথায় যাবে ভাই?'

'পাশের গাঁয়ে।'

'কতদূর?'

'সামনের জঙ্গাল পার হয়ে গেলেই।'

'আতাপুর যাব কী করে বলতে পারো?'

'কার বাড়ি যাবেন?'

'বাঘারুদের বাড়ি?'

লোকটি আর একটি কথা না বলে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আচ্ছা লোক তো! বাঘারুর নাম শুনেই ভড়কে গেল, না, কোনো অশুভ ব্যাপার জড়িয়ে আছে। কী করেন! তারপরই মনে হল, সাহস সঞ্চয় করা দরকার। ঘাটে ফিরে গিয়ে ভাবলেন, রামপ্রসাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদি রাস্তা দুর্গম হয়, তবে না হয় ঘাটেই থেকে যাবেন।

আর আশ্চর্য! ঘাটে নেমে দেখলেন, কেউ আর গান গাইছে না। নদী বয়ে চলেছে আপন মনে। তিনি এবার ইষ্টনাম জপ করছেন। দপদপ করে হ্যাজাকের আলো নিভে গেলে, কে সেটা বাঁশের ডগা থেকে নামিয়ে নিয়ে চলে গেল! বোধ হয় জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—এখন কী করেন! আতঙ্কে শরীর অবশ হয়ে আসছে। বোধ হয় ভিরমি খেয়ে পড়ে যেতেন, তখনই বাঘারু হাজির।

'বাবু, আপনি?'

'আরে তুই। যাক, বাঁচালি। তোর মা যে ডুব মারল, কোনো পাত্তা নেই! আমার ঘরবাড়ি কে দেখে! তোর মার কোনো আক্কেল নেই! সে তো জানে, না থাকলে আমার কী হেনস্থা হয়!'

'আসেন বাবু।'

বাঘারু আগে। তিনি পেছনে। বনজঙ্গালের ভেতর ঢুকে কেমন বোটকা গন্ধ।

'বাঘারু, কীসের গন্ধ রে?'

'আসেন বাবু। ভয় পাবেন না। সঙ্গো-সঙ্গো আসছেন। কিছু করবে না।'

'তা জানি, তুই আছিস, কিছু করতে পারে।' তারপরই রাধামোহনবাবু দেখলেন, বাঘারু হাঁটছে, আর তার সঙ্গো তিনিও হাঁটছেন।

'বাবা বাঘারু, তিনি কি তোর সঙ্গে বাড়ি যাবেন? এত রাতে এঁকে আবার সঙ্গে নিলি কেন? না নিলে তোর ক্ষতি হবে?'

'ক্ষতি কিছু হবে না। আপনি নতুন এয়েছেন, লোভ সামলাতে পারল না। তবে আমি আছি, কোনো ভয় নেই।'

'সে জানি। তোর ওপরে ভরসা করেই দুর্গা দুর্গা বলে বের হয়ে পড়লাম। এই রে, আমার গা শুঁকছে!'

'আপনি বড়ো ভীতু বাবু।'

'এই রে, গা চাঁটছে। বাঘারু, বাবা বাঘারু, আর কতদূর যাবি বাপ। কখন থেকে হাঁটছি। উনি আমাদের সঙ্গে তোর বাড়ি যাবেন? না গেলে হয় না? আমার সঙ্গে তো দেখা হয়েই গেল। এখন নদী পার হয়ে তিনি জঙ্গলে চলে গেলে ভালো হয় না!'

'যাবেন। সময় হলেই যাবেন।'

'কখন সে সময় হবে?'

'ওই তো বাবু, দেখছেন কুপি জ্বলছে উঠোনে—গিয়ে ডাকুন বাঘারুর মাকে। সাড়া পাবেন।'

তিনি দ্রুত হাঁটা দিলেন, কে সঙ্গে আছে কে নেই মনে থাকল না। কোনোরকমে সে আলোর কাছাকাছি গেলে রক্ষা পেয়ে যাবেন। বাঘারুর মা বের হয়ে এলে প্রাণে জল আসবে। তিনি ছুটছেন।

বাঘারু দূর থেকে চিৎকার করে বলল, 'ছুটবেন না বাবু। ছুটলেই গপ করে গিলে ফেলবে।'

তিনি আর পারেন! থমকে দাঁড়ালেন। আর দেখলেন বাঘারু অদৃশ্য। সব অদৃশ্য। 'বাঘারুর মা কুপি হাতে বের হয়ে দেখল, কলকাতার বাবু দাঁড়িয়ে আছে না। থরথর করে কাঁপছেন।

'বাবা, আপনি? কী করে এলেন! এত রাতে! এত রাস্তা!'

'তোমার বাঘারু দিয়ে গেল।'

আর সঙ্গেসঙ্গে বিলাপ, 'ও গো বাবা, আমি যাই কী করে! বাঘারু আমার বাঘের পেটে গেছে। বাঘের পেটে গিয়েও শান্তি পায়নি। ঘাটে রাতে বসে থাকে। বিপদে-আপদে ঘাট থেকে মানুষকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। ওর স্বভাব বাঘের পেটে গিয়েও বদলাল না গো বাবা। আপনি ওর দোষ নেবেন না।'

রাধামোহনবাবু আর পারেন! তিনি যথার্থই সংজ্ঞা হারালেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ডনের বাঘ

শ্রীমান ডন ঘরে ঢুকে বলল, 'মামা, দুটো টাকা দেবে?' খুব মন দিয়ে একটা রহস্য কাহিনি লিখছিলুম। তাই ঝামেলা না বাড়িয়ে বললুম, 'আচ্ছা দেব'খন।'

ডন এগিয়ে এসে লেখার কাগজে হাত রাখল। এখন জোর করে ওর হাতটা যদি সরানোর চেষ্টা করি, তাহলে কী ঘটবে, তা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। অভিজ্ঞতাও কম নেই। এই যে চেষ্টা করে অনেক ভেবেচিন্তে একটা পাতা প্রায় শেষ করে এনেছি, পুরোটাই গচ্চা যাবে। কাজেই ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে ওর মুখের দিকে তাকালুম।

ডন মিটিমিটি করে হাসছিল। এ-হাসির মানে আমি ভালোই জানি। বেড়াল যখন কোনো হতভাগা ইঁদুরকে থাবার তলায় পেয়ে যায়, তখন তার মুখে ঠিক এই হাসিটা ফুটে ওঠে।

ডন বলল, 'তুমি বুঝি ভাবছ আমি ঘুড়ি কেনার জন্যে টাকা চাইছি? ঘুড়ির দাম তো অত না।'

'তাহলে?'

ডন এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি একটা বাঘ কিনব।'

এসব সময়ে ডনের সামনে হাসবার ঝুঁকি অনেক। তাই আমিও গম্ভীর হয়ে বললুম, 'সত্যিকার বাঘ, না খেলনা বাঘ?'

'সত্যিকার বাঘ।' বলে ডন সেটার সাইজও দেখিয়ে দিল দু-হাত দিয়ে।

'বাঘটা কি জ্যান্ত?'

'হুঁউ।' ডন আবার আমার কনুইয়ের কাছে চিমটি কাটল। ওর চিমটি খাওয়ার অভ্যেস আমার আছে। তবে এটা নিতান্তই ফার্স্ট ওয়ার্নিং।

অতএব ড্রয়ার থেকে ওকে দুটো টাকা বের করে দিলুম। ডন আড়চোখে ড্রয়ারের ভেতরটা দেখে নিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, 'বাঘ কী খায়, মামা?'

'পাঁঠার মাংস।'

'মাংসের টাকাটা পরে নেব মামা। আগে বাঘটাকে নিয়ে আসি।' বলে ডন প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লেখার তাল কেটে গেলে এই এক সমস্যা। তার ওপর রহস্য-কাহিনি বলে কথা! যতবার কাগজের পাতায় রহস্য আনার চেষ্টা করি, ততবার ডনের বাঘ এসে হালুম করে ডেকে ওঠে। ডনের এই বাঘটার রহস্য আমার কাল্পনিক রহস্যটাকে বোকা বানায়। অগত্যা কাগজ-কলম রেখে হাই তুলে ভাবতে বসলুম এবং ভাবতে বসেই ভীষণ চমকে উঠলুম। ডন কী সত্যিই বাঘ কেনার জন্য দুটো টাকা নিয়ে গেল? দু-টাকায় বাঘ! সত্যিকার এবং জলজ্যান্ত বাঘ? ডনের বিচ্ছুপনার শেষ নেই। কিন্তু পারতপক্ষে আমার কাছে তো সে মিথ্যে কথা বলে না। অন্তত বলার কোনও প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাইনি। অনেক ক্ষেত্রে তার বোঝবার ভুল হয়েছে বলে তার অনেক কথা মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু সে তো তার দোষ নয়। যেমন, আজব চাকতি খেয়ে রামু ধোপার গাধাটার ভালুক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। চাকতিটা যে লোকটা ডনকে বেচেছিল, মিথ্যেবাদী তো সেই লোকটাই। চাকতি থেকে গাধা ভালুক কিংবা ভালুক গাধা হয় না, সে কী ডন জানত?

ডনের দু-টাকায় বাঘ কেনা নিয়ে যত ভাবলুম, তত অস্বস্তি হল। এ-বাজারে দু-টাকায় বাঘ কেনা যায়, তার চেয়ে আশ্চর্য, বাঘের যে বড্ড আকাল পড়ে গেছে। ঘণ্টাখানেক পরে ধুপ ধুপ শব্দে টের পেলুম শ্রীমান আসছে। দরজায় উঁকি মেরে তাকে দেখতে পেয়ে বললুম, 'কই রে? তোর বাঘ কোথায়?'

ডন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'আমার সঙ্গে এসো তো মামা! শিগ্‌গির এসো।'

'কোথায় যাব তোর সঙ্গে?'

'আ, এসো না! বাঘটাকে নিয়ে আসবে।'

ডন আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। মুখ খুলতেই দিল না, খেলার মাঠ পেরিয়ে ঝিল। ঝিলের ওধারে জঙ্গলের ভেতর ভাঙা শিবমন্দির। সেখানে গিয়ে সে চাপাস্বরে বলল, 'বাঘটা মন্দিরের ভেতর আছে। আমার ভয় করছে বড্ড। তুমি ওকে নিয়ে এসো মামা।'

একটু অবাক হয়ে বললুম, 'তুই দেখেছিস, মন্দিরের ভেতর বাঘ আছে?'

'হুঁউ। চলো, তুমিও দেখবে।'

বুকটা ধড়াস করে উঠল। মন্দিরের ভেতর যদি সত্যি-সত্যিই একটা বাঘ থাকে, তাহলে তো বড্ড ভয়ের কথা। আমাকে দেখে যদি হালুম করে ওঠে, নির্ঘাত ভিরমি খেয়ে পড়ব, আর বাঘটা এসে আমার মাংস ছিঁড়ে খাবে। ভাবতেই শরীর ঠান্ডা হিম হয়ে গেল। বললুম, 'ডন, তুই কী

বলছিস? এই ভাঙা মন্দিরে বাঘ আসবে কোত্থেকে? আজকাল কী আর যেখানে-সেখানে বাঘ আছে নাকি? সব বাঘ তো এখন টাইগার প্রজেক্টে গিয়ে ঢুকেছে।'

ডন রাগ করে বলল, 'ভ্যাট! তুমি বড্ড ভীতু, মামা। আগে গিয়ে দেখবে তো।'

পা টিপে-টিপে বটগাছের ঝুরির আড়ালে এগিয়ে গেলুম। ডন আমার পেছনে। এবার ফিসফিস করে বলল, 'ওই দ্যাখো, লেজ নড়ছে। কী? দেখতে পাচ্ছ তো?'

সত্যি ওটা একটা লেজই বটে। কিন্তু কীসের লেজ, তা আরও ভালো করে দেখার জন্য প্রচণ্ড সাহসে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। তারপরই দেখতে পেলুম বাঘটাকে। বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। হাত-পা একেবারে অবশ হয়ে গেল যেন। হুঁ, সত্যিকারের বাঘ! একেবারে জলজ্যান্ত ডোরাকাটা কেঁদো বাঘ! দুই থাবার মাঝখানে মাথাটা রেখে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। লেজটা মাঝে মাঝে নড়ছে, কিংবা পেছনের থাবা দিয়ে লেজ চুলকোচ্ছে।

ডন আমাকে আঙুলের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে দিল। ফিসফিস করে বলল, 'দেখলে তো?'

ওকে চোখ টিপে ইশারা করে অনেকটা তফাতে নিরাপদ জায়গায় সরে এলুম। তারপর দম আটকে-যাওয়া গলায় বললুম, 'আশ্চর্য ডন! খুবই আশ্চর্য! এ যেন স্বপ্ন দেখছি রে ডন।'

ডন মুচকি হেসে বলল, 'দু-টাকায় কিনেছি মামা।'

'কিন্তু কিনলি কার কাছে?'

'একটা লোকের কাছে।'

'কোথায় সে?'

ডন এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। এখানেই বসেছিল লোকটা। আমি ওই গাছে ঘুড়ি পাড়তে উঠেছিলুম। ঘুড়িটা উঁচুতে আটকে আছে। পাড়তে পারলুম না। গাছ থেকে নেমে দেখি লোকটা বসে আছে।'

'বুঝলুম। তারপর?'

'লোকটা বলল, খোকাবাবু, বাঘ কিনবে? দু-টাকা দাম।'

'তখন বাঘটা কোথায় ছিল?'

'ওর পাশেই শুয়েছিল।'

'তোর ভয় করল না?'

'করছিল তো। লোকটা বলল, খুব ভালো বাঘ। কামড়ায় না। পোষা বাঘ কিনা।'

'তারপর?'

ডন আনমনা হয়ে বলল, 'তারপর তো তোমার কাছে টাকা চেয়ে এনে দিলুম। ও বলল, বাঘটা মন্দিরের ভেতর প্রণাম করতে ঢুকেছে। প্রণাম করা হলে বাড়ি নিয়ে যেও।'

'তারপর সে চলে গেল তো?'

'হ্যাঁ। যাবার সময় মন্দিরের সামনে গিয়ে বাঘটাকে বলে গেলি, বুধ্ধুরাম! এই খোকাবাবুর সঙ্গে যাস। ওর কথা শুনিস।' ডন দম নিয়ে ফের বলল, 'বাঘটার নাম বুধ্ধুরাম, মামা!'

'হুঁ! তারপর তুই বাঘটাকে আনতে গেলি বুঝি?'

'গেলুম। কিন্তু বড্ড ভয় করল। তখন তোমাকে ডাকতে গেলুম।'

একটু ভেবে বললুম, 'বাঘটার নাম বুধ্ধুরাম, তাহলে আয় তো, এবার ওকে নাম ধরে ডেকে দেখি!'

দুজনে আবার খুব সাহস করে ঝুরির আড়ালে এগিয়ে গেলুম মন্দিরের কাছে। তারপর সাহস করে এবং খুব স্নেহ-ভালোবাসা মাখিয়ে ডাকলুম, 'বুধ্বুরাম! ও বুধ্বুরাম!'

কিন্তু আমাদের দুজনকেই ভীষণ হকচকিয়ে দিয়ে বাঘটা একেবারে মানুষের গলায় যেন বলে উঠল, 'কে? গঙ্গু এলি নাকি! উঃ! খিদেয় নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে রে।'

তারপর সে মুখ তুলে আমাদের দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে তড়াক করে উঠে বসল।

আসলে শরৎকালের ঝকমকে রোদ্দুরে এই জঙ্গালের ভেতর ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় চকরা-বকরা ছায়া জমে আছে। আর ভাঙাচোরা মন্দিরের ভেতরটা দিনদুপুরেই আঁধার হয়ে আছে। চোখের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। 'তবে রে ব্যাটাচ্ছেলে!' বলে হুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে গেলুম। 'একটা বাচ্চা ছেলেকে পেয়ে ঠকানোর মজা দেখাচ্ছি এবার!' অমনি বুধ্বুরাম মন্দিরের ভেতর থেকে বাঘের মতো চার ঠ্যাঙে (দরজাটা ছোট্ট) বেরিয়ে এক লাফ দিল। মতলব টের পেয়ে আমিও একখানা লাফ দিলুম। তবে বুধ্বুরামের লেজের ডগাটাই শুধু ধরতে পারলুম এবং সেই শুকনো ডোরাকাটা জিনিসটা আমার মুঠোয় রয়ে গেল। বুধ্বুরাম দুই ঠ্যাঙে নড়বড় করে দৌড়ে জঙ্গালের ভেতর উধাও হয়ে গেল।

ঘুরে দেখি, শ্রীমান মনমরা হয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ওর কাছে গিয়ে বললুম, 'যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে। দুঃখু করিসনে। দু-টাকায় অন্তত বাঘের লেজ কিনতে পেরেছিস, এই যথেষ্ট। এই নে।'

ডন লাল-হলুদ রঙের ডোরাকাটা ন্যাকড়া জড়ানো খড়ের লেজটা হাতে নিল বটে, কিন্তু তক্ষুনি সেটা ছুড়ে ফেলে দিল। মুখটা বাঁকা। দৃষ্টি নীচের দিকে।

কাঁধে হাত রেখে বললুম, 'দোষটা আমারই, জানিস? গতকাল ওই বুধ্বুরাম গায়ে রঙ মেখে বাঘ সেজে খেলা দেখাচ্ছিল বাজারে। ওর সঙ্গী গঙ্গারাম ঢোল বাজিয়ে গান গাইছিল আর বুধ্বুরাম বাঘের নাচ দেখাচ্ছিল। রাতারাতি ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলুম। আজকাল আর আমার কিছু মনে থাকে না রে!'

ডন ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে গলার ভেতর বলল, 'তাহলে ঘুড়িটা পেড়ে দেবে এসো।'

যাবার সময় বাঘের লেজটা কী ভেবে কুড়িয়ে নিল। খুশি হয়ে বললুম, 'ওটা দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা যাবে। দু-টাকা দিয়ে কেনা একটা দারুণ স্যুভেনির! কী বলিস?'

ডন জবাব দিল না। এখন ওর চোখ সেই গাছটার দিকে, যার ডগায় ওর রঙিন ঘুড়িটা আটকে আছে। শরৎকালের ঝলমলে নীল আকাশের গায়ে মাথা কোটার ভঙ্গিতে ঘুড়িটা দুলে-দুলে উঠছে। ঘুড়িটার জন্য ডনের মতোই মায়া লাগছিল।

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

ঘণ্টায় এক-শো

ঝুপ করে সূর্য ডুবে যেতেই দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। পার্কের ঘণ্টা বাজতে লাগল ঢং ঢং, পিঁ-পিঁ করে হুইশল বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ল পাহারাদারেরা, 'কে কোথায় আছ, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। এইবার গেট বন্ধ হয়ে যাবে, তালাবন্ধ হবে। কেউ যদি ভেতরে থেকে যাও তাহলে সকাল হওয়ার আগে আর বেরোতে পারবে না।' গাছের হনুমান, খাঁচার খরগোশ আর গিনিপিগ—যে যার জায়গায় সুটসাট সেঁধিয়ে গেল। হরিণরা আর হাঁসেরাও বুঝে গেল মুখ বাড়িয়ে ঘাস খাওয়া আজকের মতো বন্ধ হল। 'হরিণকে ঘাস খাওয়াইবেন না' নোটিসে 'না'টা মুছে দিয়েছে কোনো দুষ্টু ছেলে, তারপর মনের আনন্দে সব খোকাখুকুরা ছুটে-ছুটে মাঠে যায়, মুঠো-মুঠো ঘাস তুলে আনে। নিয়ম নেই, তবু পাতাও ছেঁড়ে। আর হরিণরা পেটুকের মতো গলা বার করে সেগুলো ঝটপট মুখে চালান দেয়।

সূর্য ডোবার সঙ্গেসঙ্গেই এইসব মজা তখনকার মতো শেষ। 'কেবলমাত্র দু-বৎসরের শিশুদের জন্য' লেখা দোলনা থেকে চ্যাঁ-ভ্যা শোনা যায়, আর একটু বড়োদের ঘূর্ণি দোলনায় গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে সক্কলে—'নামো, নামো' বলে যত বকাবকি করেন বড়োরা, তারা কিছুতেই নামবে না। 'আর একটু' বলে কাতর আবেদন শোনা যায়। শেষ পর্যন্ত যখন টর্চ আর লাঠি হাতে ইউনিফর্ম-পরা চৌকিদার হাজির হয়, আর জোরে জোরে লাঠি ঠুকতে থাকে, তখন ব্যাজার মুখ করে সবাই গুটিগুটি গেটের দিকে হাঁটা দেয়। সেখানে বেলুনওয়ালা, ঝালমুড়িওয়ালা, আইসক্রিমওয়ালা,

ভুট্টাওয়ালা আর বন্দুক ছুড়ে বেলুন ফাটানোর টার্গেট প্র্যাকটিসওয়ালাদের জমায়েত। কিছু ছেলেমেয়ে বাবা-মা'র হাত ধরে ঝুলোঝুলি করে, 'বেলুন নেব, বন্দুক ছুড়ব, আইসক্রিম খাব—' মোটমাট, বাড়ি এখনই ফিরব না।

মোটরবাইকে বসে এদের লক্ষ করছিল রাহুল। বেশ ইন্টারেস্টিং দৃশ্য। তার ছোটোবেলায়,

মনে আছে, বাবার হাত ধরে লিলিপুলে বেড়াতে আসত, ছোট্ট সাঁকো, কোথাও পাহাড়, কোথাও লাল নীল পাখি—এদিকে ময়ূর ওদিকে পদ্মফুল ফুটে আছে। মনে হত যেন স্বর্গে পৌঁছে গেছে। কিন্তু গত সপ্তাহে দিদির বাচ্চাদের নিয়ে ওখানে গিয়ে তার তো চক্ষুস্থির! কোথায় গেল সেই সব ছবির মতো সাজানো জাপানি বাগান, যত্ন করে লাগানো গাছপালা, ছোটো করে ছাঁটা ঘাসে ঢাকা মাঠ। সব উধাও। কেবল ধুলো আর বড়ো বড়ো ঘাসের জঙ্গল। কিছু লোকজন সেখানে ঘোরাফেরা করছে বটে, কিন্তু তারা কেউই ছোটো নয়। চেহারাগুলোও সন্দেহজনক।

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল রাহুলের। বিঙ্কু-মিঙ্কুদের কাছে একটু লজ্জাও পেতে হল, কারণ ক-দিন ধরে তাদের কাছে লিলিপুলের যা গুণগান করেছে, তাতে ওরাও অস্থির হয়ে উঠেছিল মা আর মামার ছোটোবেলার পার্কে যাওয়ার জন্য। ওদের পালামপুরে এসব কিছুই নেই। যখন লিলিপুলে গিয়ে সেইসব দৃশ্য দেখা গেল না, তখন অদম্য রাহুল ওদের বলল, 'চল, তোদের আর-একটা দারুণ জায়গায় নিয়ে যাই।'

'সেটা কোথায়, সেটা কোথায় মামু?'

'কাছেই আছে, চল না। ভয় পেলে চলবে না কিন্তু!'

ভয় কাকে বলে, পাহাড়ে মানুষ হওয়া ছেলে-মেয়েরা জানে না। তারা ভাবল মামু বোধ হয় ওদের কোনও খাড়া পাহাড়ে ট্রেকিং করতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কলকাতায় কোনো পাহাড় নেই, সেটা তাদের জানা ছিল না। তবে মায়ের কাছে লেকের গল্প শুনে শুনে তাদের মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে, বৈকাল হ্রদের মতো এটাও একটা বিরাট হ্রদ, যেখানে কালো জলে ঢেউ খেলছে—এপার-ওপার দেখা যায় না, এদিক-ওদিক ছিটিয়ে আছে কিছু রং-বেরঙের পাল-তোলা নৌকা।

কিন্তু মামার পেছন-পেছন একটা ঘোরানো রাস্তা ধরে ওরা যেখানে এসে পৌঁছোল সেটা একটা ঝুলন্ত সাঁকো। ওপারে একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেখানে মসজিদের মাথায় আলো জ্বলছে।

'ওখানে কি জলদস্যুরা থাকে?' রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল রাহুলকে।

'জলদস্যু? কী জানি। আগে তো থাকত না। চল, আমরা গিয়েই দেখি।'

একটু নড়বড়ে হয়ে গেছে রেলিং। ওরা যখন মাঝপথে, তখন শুনল ওদিক থেকে আসা রাহুলেরই বয়সি দুটো ছেলে বলছে, 'আরে, মাছগুলো কোথায় গেল?'

থমকে গেল ওরা সবাই। তাই তো, মাছগুলো গেল কোথায়? রাহুলও ভাবল। ভুলেই গিয়েছিল। ছোটোবেলায় যখন এখানে এসেছে, তখন কী রোমাঞ্চকর মনে হত সেইসব গম্ভীর চেহারার মাছগুলোকে। তাদের অন্ধকার ছায়া দেখা যেত কেবল, তারা মাঝে মাঝে মুখটা উঁচু করেই ডুব মারত। বাবা বলতেন, 'ওদের অনেক বয়স। দেখছ না গায়ে কত শ্যাওলা জমেছে।'

রাহুল জিজ্ঞেস করত বিঙ্কুর মতো, 'অ-নে-ক বয়স?'

'হ্যাঁ, অনেক।'

'কত? এক-শো বছর?'

'দূর পাগল? এক-শো বছর আগে এই লেকই ছিল না। এটা তো মানুষের তৈরি করা। এটা খুঁড়ে সেই মাটি দিয়ে হল সাদার্ন অ্যাভেনিউ। আর খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া গেল পুরোনো আমলের গোটা কতক কামান।'

রাহুল কয়েক মুহূর্তের জন্য ছোটোবেলায় ফিরে গিয়েছিল। এখন সে কলেজের ছাত্র, মোটরবাইক চালায়, কলকাতার ইতিহাস, ভূগোল তার মোটামুটি জানা। দুই ভাগ্নে-ভাগ্নিকে নিয়ে আজ সে কলকাতা চেনাতে বেরিয়েছে। কিন্তু এ তো মহামুশকিল! লিলিপুলের এমন ভগ্নদশা কে জানত—আর মাছেরাও উধাও!

'কোথায় গেল মাছগুলো?' নিজেকেই প্রশ্ন করল সে।

'কী মাছ মামু? এখানে কী মাছ ছিল?' মিঙ্কু তৎক্ষণাৎ কানখাড়া করেছে।

'তুই যেমন বোকা! মাছ থাকে অ্যাকুয়েরিয়ামে—' তার দাদা বিঙ্কু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

রাহুল কোনো কথাই বলল না। সে কেবল জলের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায় খুঁজছে সেইসব কালো-কালো ছায়াদের—যাদের পিঠে অনেক বছরের জমানো শ্যাওলা, লেকের গভীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাদের বাস, অনেক বছর আগে দলবেঁধে ছোটো ছেলে-মেয়েরা তাদের দেখতে আসত।

'কী খুঁজছেন দাদা? মাছ?' একটি লোক উবু হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছিল দ্বীপের প্রথম ধাপের পাথরে।

'হ্যাঁ। তাই। দেখছি না তো!'

'কী করে দেখবেন? আছে নাকি তারা? সব খেয়ে ফেলেছে। কিমা বানিয়ে। হ্যাঃ।' বলে লোকটা একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করল।

'কীসের কিমা মামু?'

'মাছের কি কিমা হয়?'

বিঙ্কু-মিঙ্কুর সব ব্যাপারেই অসীম কৌতূহল। কিন্তু রাহুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। প্রথমে মনে হয়েছিল জিজ্ঞেস করে কারা কিমা বানিয়ে খেয়ে ফেলল? তারপর নিজেই ভাবল, এটা কী জিজ্ঞেস করার মতো কথা!

আবার বিফল মনোরথ হয়ে পিছু হাঁটা দিল তারা। এবারে নতুন পার্কটার দিকে। রাহুলদের ছোটোবেলায় এটা ছিল না সম্ভবত। কিংবা থাকলেও বাবা কখনো ওদের এখানে আনেননি। দেখাই যাক, এই পার্কে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা যায় কিনা, আর গিয়েই বা কী করে!

পৌঁছোতে-পৌঁছোতে প্রায় রোদ পড়ে গেল। রাহুল মোটরসাইকেল থেকে বিঙ্কু-মিঙ্কুকে

নামিয়ে দিয়ে বলল, 'দৌড়ে যা, এখনই গেট বন্ধ হয়ে যাবে।' বলে নিজে বসে-বসে আকাশপাতাল চিন্তা করতে লাগল।

কিন্তু ততক্ষণে সূর্য ডোবার মুখে। ঘণ্টার শব্দ ভেসে এল। অনিচ্ছুক বাচ্চাদের নিয়ে বড়োরা গেট থেকে বেরিয়ে আসছেন। এদিকে অনেক গাড়ি, স্কুটার, দু-একটা মোটরসাইকেল পার্ক করা।

রাহুলের কানে এল, একটি বছর আড়াই-তিনের ছেলে প্রচণ্ড আপত্তি জানাচ্ছে। সে কিছুতেই বাড়ি যাবে না। তার সঙ্গোর লোকটির হাত ছাড়িয়ে সে ছুট দিয়েছে উলটো দিকে। খানিক পরে তাকে কাঁধে তুলে তার সঙ্গোর লোকটি পাশ দিয়ে চলে গেলেন। রাহুল শুনল তিনি বলছেন, 'জানো তো, অন্ধকার হওয়ার পর পার্কে কী হয়?'

'কী হয়?'

'বাঘ আসে।'

এই কথা শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শিশুটি ঠান্ডা। তার হাত-পা ছোড়া বন্ধ হয়ে গেল। তারপর গভীর সম্ভ্রম সহকারে তিনি বলে উঠলেন, 'অন্ধকার হয়ে গেলে পার্কে বাঘ আসে। জানো তো? টাবু বলেছে।'

টাবু বোধ হয় এই লোকটির নাম। ভালো কায়দা তো! রাহুল তার বুদ্ধির তারিফ করল মনে মনে। তবে বাঘের নাম করে অনর্থক ছোটোদের মনে ভয় ঢোকানো কী উচিত? বাঘ সম্বন্ধে এইভাবে অল্প বয়স থেকেই একটা অন্যরকম ধারণা গড়ে উঠবে—সেটা তো ঠিক নয়।

রাহুল ভাবল, একবার গিয়ে টাবু নামে সেই লোকটিকে একটু বলে আসে। কিন্তু তাদের আর দেখা গেল না। ততক্ষণে ছুটতে-ছুটতে এগিয়ে আসছে বিঙ্কু আর মিঙ্কু। 'মামু, মামু আমরা হনুমান দেখেছি।'

'বিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, হনুমান কী—বলতে হয় হনুমানজি।'

'হনুমানজিকে ওরা কেন শিকলি দিয়ে বেঁধে রেখেছে?'

রাহুল কিছু না ভেবেই ফস করে বলে বসল, 'তোরা ওখানে বাঘ দেখিসনি? অন্ধকারের পর বাঘ বেরোয়!'

বিঙ্কু-মিঙ্কু দু-জনেই স্ট্যাচু। 'মামু, বাঘ আছে ওখানে? বাঘ? আমরা বাঘ দেখব।'

মিঙ্কু বলল, 'আমি বাঘের পিঠে চড়ব।'

রাহুল বলল, 'বাঘ থাকলেও তার পিঠে কি চড়া যাবে?'

বিঙ্কু বলল, 'কেন, ঘোড়া আছে তো! ঘোড়ার পিঠে চড়ছে সবাই।'

'ঘোড়া আর বাঘ বুঝি এক হল?' রাহুল বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল।

'কেন? এক নয় কেন?'

'যেমন বাঘ থাকে জঙ্গলে।'

'কেন, বাঘ কি কখনো শহরে আসে না? আমি তো দেখেছি বাঘ মোটরবাইকের মতো সাঁ-সাঁ করে পিচের রাস্তা দিয়ে ছুটছে।'

'সে তো বিজ্ঞাপন।'

ক্যাঁচ করে একটা ব্রেক দেওয়ার শব্দ। একটা গাড়ি এসে ঘচাক করে থামল পাশে।

'এই যে রাহুলবাবু। কোন দিকে?'

'ও, জামাইবাবু? আপনি কি বাড়ি যাচ্ছেন? তাহলে এদের দু-জনকে নিয়ে নিন। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।'

গাড়িতে উঠে চলে গেল বিঙ্কু-মিঙ্কু। ততক্ষণে আশপাশে আর একটিও গাড়ি নেই, স্কুটারও নেই। সব খাবারওয়ালা আর বেলুনওয়ালারা পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে ফেলেছে। বিরাট ঝুপসি গাছগুলোর ওপর ছায়া ঘন হয়ে এসেছে। কেবল সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছে বাস। আওয়াজ হচ্ছে গোঁ-গোঁ ঘিস-ঘিস। মাঝে মাঝে গাড়ির তীব্র হর্ন।

আমি এখানে কেন বসে আছি—মনে-মনে ভাবল রাহুল। আমার তো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা নেই! জামাইবাবুকে হঠাৎ এরকম একটা এক্সকিউজ দিলাম বা কেন? বাচ্চা দুটোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য? কিন্তু তা কেন হবে? ওদের সঙ্গে সময় কাটাতে আমার তো ভালোই লাগে। অন্য রাজ্যে থাকে, হিমাচল প্রদেশে, ওদের চেনাজানার জগৎটা কত অন্যরকম। কীরকম অনায়াসে বলে বসল, আমি বাঘের পিঠে চড়ব। বাঘ যেন ঘোড়া। নিজের মনেই শব্দ করে হেসে উঠল রাহুল।

'এত হাসি কীসের?' কে যেন গম্ভীর গলায় ধমক দিয়ে উঠল।

এত চমকে গেল রাহুল যে, আর-একটু হলে উলটে পড়েই যেত! এ আবার কে রে বাবা! অন্ধকারে ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে বলল, 'কে তুমি? কোনখান থেকে কথা বললে?'

'আমি হিরো। তোমার পেছন দিকে তাকাও।'

পেছন দিকে লেকের জলে তখনও ঝাপসা আলোর আভাস আছে। সেই আলোর ব্যাকগ্রাউন্ডে কে একজন গুঁড়ি মেরে বসে আছে। বসে? না দাঁড়িয়ে? ঠিক বোঝা গেল না।

'আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না!'

'পাবে কী করে? মানুষ তো! তোমাদের নজর তো এইটুকু।'

এবারে রাহুল একটু সতর্ক হল। মানুষ তুলে খোঁটা দেওয়া। লোকটা তবে কী ভূত?

'তুমি কি মানুষ নও?'

'ছ্যাঃ, মানুষ হতে যাব কোন দুঃখে! আমি এসেছি সুন্দরবন থেকে।'

'তুমি কে?'

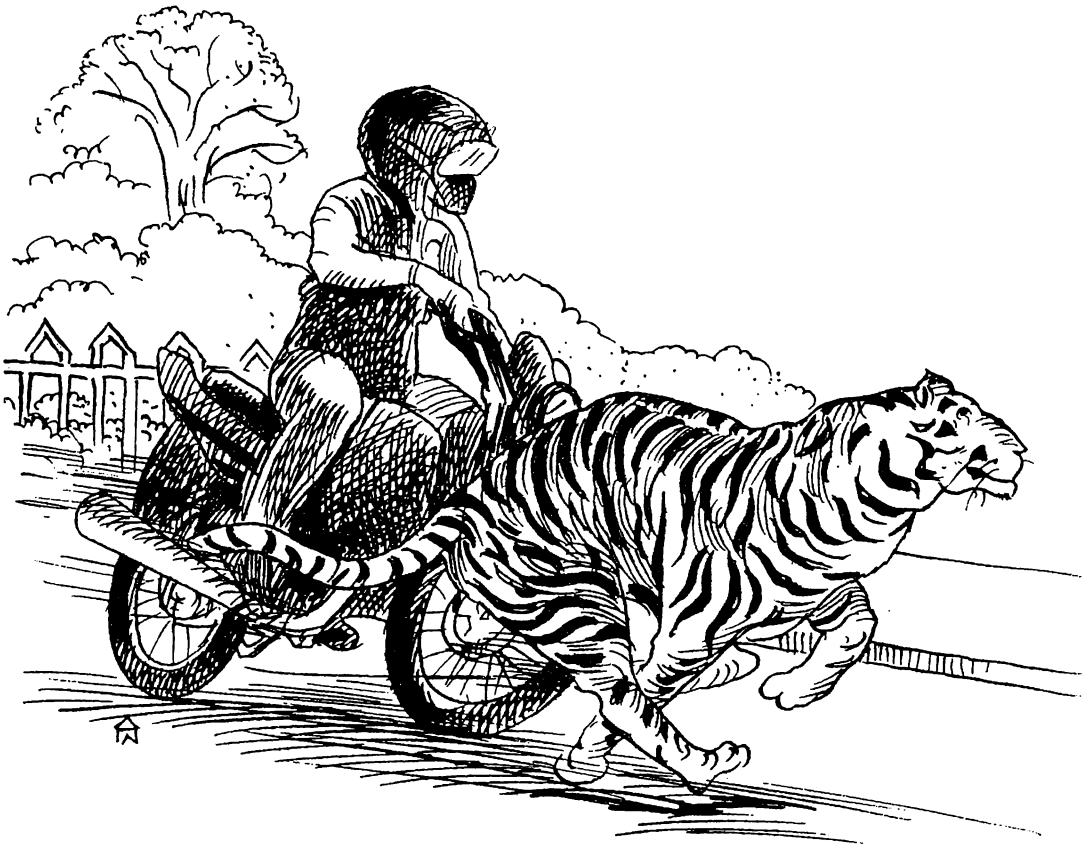

'আমার নাম হিরো।'

'হিরো?'

'হ্যাঁ, আজকাল আমরা মানুষদের সঙ্গে এত ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকি, মানে থাকতে বাধ্য হয়েছি যে, তোমাদের যন্ত্রপাতি, কলের বাক্স সবই আমাদের চেনা। জানালা দিয়ে আমরা টিভিও দেখি।'

'ওহো। তাই হিরো।'

'হ্যাঁ, মা বলেছিল আমার নাম দেবে ডিডিওপম ওয়াশি মাসি। বাবা বলল, ছেলের নাম কি মাসি হয়? তাই আমার নাম হল হিরো মুন্ডা। বাড়িতে সবাই হিরো বলেই ডাকে।'

'এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি তুমি কে? তুমি বাঘ।'

'বাঘ তো বটেই! তবে আমাকে 'বাঘ, বাঘ' কোরো না। সব বাঘেরা কী এক? আমার নাম, বললামই তো—হিরো। তোমরা মানুষরা বড়ো তাড়াতাড়ি সব কিছু ভুলে যাও। মানুষদের স্মরণশক্তি তো! তোমার নাম কী? মামু?'

'তুমি এতক্ষণ আনাচে-কানাচে থেকে বিঙ্কু-মিঙ্কুর কথাবার্তা শুনছিলে। ওরা আমাকে মামু বলে ডাকে। আসলে আমার নাম রাহুল।'

আড়মোড়া ভেঙে এগিয়ে এল হিরো। কী বলল। রাজার মতো। অন্ধকারে যতটা বোঝা গেল তাতে রাহুলের মনে হল বডিখানা দারুণ, যেন ইলাস্টিকে তৈরি।

হিরো আরও কাছে এসে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল।

'কী করছ তুমি?'

'শুঁকে দেখছি। এই জন্তুটা নাকি খুব জোরে দৌড়োয়?'

'এই ধরো, ঘণ্টায় এক-শো।'

'গুনতে-ফুনতে জানি না। লাগাবে আমার সঙ্গে দৌড়? দেখা যাক, ঘণ্টায় কে কতখানি যায়!'

'চলে এসো। দেখাই যাক।'

পরের দিন সকাল বেলা ঘুমন্ত রাহুলের ওপর দুই ভাগ্নে-ভাগ্নির আক্রমণ, 'মামু, মামু শোনো, রেডিয়োতে কী বলছে? ওঠো না, কত ঘুমোবে?'

অনেক কষ্টে একটা চোখ ফাঁক করল রাহুল। 'উহ্ একটু ঘুমোতে দিবি না! কী হয়েছেটা কী? বাড়িতে আগুন লেগেছে?'

'শোনোই না, রেডিয়োতে বলছে, কাল সাদার্ন অ্যাভেনিউতে একটা বাঘকে একটা মোটর সাইকেলের সঙ্গে রেস দিতে দেখা গেছে। বাঘের ধাক্কায় দু-চারজন স্কুটার আরোহী জখম। তারা থানায় গিয়ে নালিশ করে এসেছে। কিন্তু পুলিশ তাদের কথা বিশ্বাস করছে না। বলছে, বাঘ কী শহরে আসে নাকি?'

'কে বলেছে আসে না?' বলে রাহুল পাশ ফিরে চোখ বুজল।

দুলেন্দ্র ভৌমিক

মাস্টার প্রিন্স

জগতের যাবতীয় জন্তুজানোয়ারদের নিয়ে মানুষদের মাত্রাছাড়া কৌতূহল কবে থেকে শুরু হয়েছে, সেটা আমি বলতে পারব না। মানুষ তার বিনোদনের জন্য পশুশালা বানিয়ে তাতে বাঘ, সিংহ, হাতি, জলহস্তী সব আটকে রাখে। ছুটিছাটায় টিকিট কেটে মানুষরা সেইসব দেখতে যায়। যদি কখনো এর উলটোটা ঘটে? বাঘ, সিংহ, হাতি এরা সকলে মিলে জঙ্গালের মধ্যে একটা মনুষ্যশালা তৈরি করল। দামাল হাতির দল আশপাশের গ্রামে গিয়ে শুঁড়ে করে মানুষ তুলে এনে ঢুকিয়ে দিল মনুষ্যশালায়। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের পুরে দিল খাঁচায়। আমরা যেমন পাখি কিনে খাঁচায় পুরে তাকে পরম যত্নে পুষি, বড়ো বড়ো পাখিরাও তেমন করে কচিকাঁচা ছেলে-মেয়েদের ধরে-ধরে খাঁচায় ঢুকিয়ে পুষতে লাগল। তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে? খুবই মারাত্মক ব্যাপার হবে সন্দেহ নেই। তবে একটাই রক্ষা যে, জন্তুজানোয়াররা তো আমাদের মতো বুদ্ধি ধরে না। ওরা কেবল খাওয়ার জন্যই যা করবার, তাই করে। মানুষকে তো শুধু খেতে দিলেই চলে না, তার আরও অনেকরকম প্রয়োজন আছে। বহুবিধ বায়না এবং বাসনা আছে।

আমি যখন এইসব কথা ভাবছি, তখন আমার ভাগ্নে এসে সগৌরবে আমাকে জানাল, 'মামু, আমরা সুন্দরবন যাচ্ছি। সজনেখালি টুরিস্ট লজে থাকব। তোমার কে এক বন্ধু আছেন ফরেস্টে থাকেন, তাঁকে একটু বলে দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'কী বলে দেব?'

ভাগ্নে খুব সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'আমরা বাঘ-টাঘ দেখতে যাচ্ছি। উনি যদি ব্যবস্থা করেন।'

আমি ভাগ্নের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সুন্দরবনের বাঘগুলো তো ক্রিকেট মাঠের ফিল্ডার না, আর আমার বন্ধুও আজহারউদ্দিন নয় যে, সে বললেই বাঘগুলো ড্রেসিংরুম থেকে দলবেঁধে মাঠে নামবে তোদের দেখা দিতে।'

ভাগ্নে একটু দমে গেল বটে, কিন্তু হাল ছাড়ল না। ওর ভাবসাব দেখে মনে হল, বাঘ যেন কলকাতার শহিদ মিনার, হাওড়া ব্রিজ অথবা জাদুঘর। একই জায়গায় আছে, তুমি গেলেই দেখতে পাবে।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'বেড়াতে যাচ্ছিস বেড়াতে যা, বাঘ দেখার বায়না করিস না। যতক্ষণ না দেখছিস ততক্ষণ ভালো থাকবি। দেখার পর ভালো থাকা তো দূরের কথা, আদৌ থাকবি কিনা সেটাই বলা কঠিন।'

ভাগ্নের বয়স মোটে চব্বিশ। এই বয়সে মনে বাড়তি সাহস থাকে। আর ঘরের মধ্যে, নিরাপদ আশ্রয়ে বসে বাড়তি সাহসটা টগবগিয়ে ফুটতে থাকে। ভাগ্নে আমায় প্রশ্ন করল, 'তুমি তো অনেকবার সুন্দরবন গেছ। বাঘ দেখেছ?'

আমি উত্তর দিলাম, 'বারচারেক গেছি। বাঘ দেখিনি, দেখবার চেষ্টা করিনি। যেবার মধ্যরাতে বাঘের গর্জন শুনেছিলাম এবং শুনেই লেপ-তোশক জড়িয়ে যেভাবে খাটের নীচে ঢুকে পড়েছিলাম, সেটা দেখলে বাঘ নিজেই করুণা করে আমাকে ছেড়ে দিত। ওই গর্জন শোনার পর আর কখনো ওমুখো হইনি।'

আমার সাহসী ভাগ্নের গলায় আফশোস উপচে উঠল। সে বলল, 'তুমি দারুণ মিস করেছ। বাঘের ডাক শুনে তোমার বেরোনো উচিত ছিল। একবার মুখোমুখি হলে তোমার যে অভিজ্ঞতা হত সেটা তো তোমার লেখার একটা বিষয় হতে পারত। পারত কি না বলো?'

এবার আমি সোজা হয়ে বসলাম। ভাগ্নের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললাম, 'অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই হত, কিন্তু সেটা কি লেখার আর সুযোগ পেতাম! বরং লিখতে পারলে বাঘই লিখে দিত আমার ঘাড় মটকাবার অভিজ্ঞতার চমকপ্রদ কাহিনি।'

ভাগ্নে হতাশ গলায় বলল, 'তার মানে, এতবার সুন্দরবনে গিয়েও তুমি বাঘ দেখতে পাওনি! আশ্চর্য লোক। তোমার ভাগ্যটাই খারাপ।'

আমি বলি, 'হয়তো ভাগ্যটা বেজায় ভালো বলেই তাদের মুখোমুখি হতে হয়নি। দর্শন মানে কী, একেবারে মুখোমুখি, যাকে বলে ফেস টু ফেস।' বাঘের সঙ্গে দেখা হয়েছে একবার।

ভাগ্নে বলে, 'কোথায়? ওটা কি সুন্দরবনের বাঁঘ?'

আমি উত্তর দিই, 'বাঘের গায়ে তো তার নিবাস লেখা ছিল না। অতএব তা বলতে পারব

না। তবে তেনাকে দেখেছিলাম ঝিকিরা গ্রামে। আর সময়টা ছিল পৌষ মাস। যা কিছু সর্বনাশ তা ওই পৌষ মাসেই হয় তো।'

ভাগ্নে যেন আহ্লাদে লকলকিয়ে উঠল। আমায় বলল, 'ওই বাঘ কি তোমায় অ্যাটাক করেছিল? না কি তুমিই...'

আমি বললাম, 'অত তড়বড় করলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবি না। অ্যাটাকের আগেই কেসটা, সেট্‌ল হয়ে গেল।'

আমি জানতাম ভাগ্নে কিছুই বুঝতে পারবে না। সে শুধু অবাক চোখে আমাকে দেখতে লাগল। ভাগ্নের কৌতূহল মেটাতে আমার ব্যাঘ্র দর্শনের কাহিনি বলতেই হল। সেই কাহিনিটা এইভাবে শুরু করা যেতে পারে:

তখন আমার বয়স ছাব্বিশ আর সাতাশের মাঝামাঝি। পাকাপাকি কোনো চাকরি তখনও জোটেনি। একটা কাগজে এটা-ওটা লিখে কিছু পয়সা রোজগার করি। এই এটা-ওটা লেখার মধ্যে একটা কাজ ছিল যাত্রা দেখে তার সমালোচনা লেখা। পুজোর পর থেকেই বায়না নিয়ে যাত্রা দলগুলো শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত গ্রামের দিকে। দলের ম্যানেজারের সঙ্গে গাড়িতে করে আমাকেও যেতে হত কাটোয়া, কালনা, হালিশহর, মৌড়িগ্রাম অথবা ক্ষ্যামাশুলি গ্রামে। যাত্রা দেখে সেই রাত্রেই রওনা দিয়ে ভোরের দিকে বাড়ি ফিরে আসতাম। সেবার এক পার্টির সঙ্গে তাঁদের নতুন পালা 'সুন্দরবনের সুন্দরী' দেখতে যেতে হল। ঝিকিরা গ্রামে। সময়টা ছিল পৌষের মাঝামাঝি। সন্ধ্যার মুখে-মুখেই হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে আসতে-আসতে বুঝলাম, বাইরের হাওয়াতে শীতের বেজায় দাপট। গাড়ির কাচ তুলে দিতেই ম্যানেজার গৌরহরি গুছাইত বললেন, 'চাদরটা গায়ে জড়িয়ে রাখেন। যত ভিতর পানে যাব, ততই দ্যাখবেন শীত কেমন জমিয়ে জম্পেশ হয়ে আছে।'

এসব অভিজ্ঞতা অবশ্য আমারও আছে। অতএব, শীতবস্ত্র সঙ্গে নিয়েই আমি গাড়িতে উঠেছি। কলকাতার যাত্রায় তখন একটা অন্য ধরনের চমক আমদানির চেষ্টা চলছে। কোনো দল আসরে উট আনছেন, কোনো দল হাতি। সুন্দরবনের সুন্দরী-তে আছে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। কাগজে সেই রয়্যাল বেঙ্গলের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়েছে। আমি গৌরহরিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাঘকে কি সত্যি-সত্যি আসরে এনে ছেড়ে দেন?'

গৌরহরিবাবু নস্যি নিচ্ছিলেন। রুমালে নাক মুছে বললেন, 'একেবারে প্রথমেই ছেড়ে দেওয়া তো একটু রিস্কি। তাই প্রথমে খাঁচায় করে একবার আসরে ঘুরিয়ে নিয়ে যাই। দর্শকরা দেখে আশ্বস্ত হয় যে, সত্যি-সত্যি বাঘ আছে। তারপর নাট্যপালার প্রয়োজনে তাকে তো আসরে আসতেই হয়।'

আমি নিজে আশ্বস্ত হওয়ার তাগিদে জিজ্ঞেস করি, 'তখনও কি খাঁচায় থাকে?'

আমার প্রশ্ন শুনে গৌরহরিবাবু হো-হো করে এমন অট্টহাস্য করে উঠলেন যে, চিৎপুরের ভাড়াটে ড্রাইভার আকস্মিক এই অট্টহাস্যে ঘাবড়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে পেছনের সিটের দিকে

সভয়ে তাকিয়ে রইল। আমি অবশ্য ঘাবড়াইনি। আমি জানতাম গৌরহরিবাবু যাত্রাদলের ম্যানেজার হওয়ার আগে অভিনেতা ছিলেন। 'শ্রীচৈতন্য' পালায় জগাই সেজে প্রভূত নাম করেছিলেন। জগাইকে আসরে এসে প্রত্যেক দৃশ্যে দুবার করে মোট ষোলো দৃশ্যে বত্রিশবার হাসতে হত।

প্র্যাকটিস করে সেই যে হাসিটা গলায় বসে গেছে সেটা অভিনয় ছাড়ার পরও গৌরহরিবাবুর গলা ছেড়ে যায়নি। এই হাসির জন্যই তাঁকে সারাজীবন কংস, যমরাজ, কালু সর্দার—এই ধরনের রোল করতে হয়েছে। গৌরহরিবাবুর অট্টহাস্য একদা এমনই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল যে, নায়েকরা দলের বায়না করতে এসে জিজ্ঞেস করতেন, 'গৌরহরির ক-খানা অট্টহাস্য আছে?'

যদি শুনতেন তিনখানা, তাহলে তাঁরা ব্যাজার মুখে বলতেন, 'খান পাঁচেক রাখুন না!'

দলের ম্যানেজার বলতেন, 'ওই হরেদরে পাঁচখানা অট্টহাস্য তো রাখতেই হয়। ভাববেন না, হয়ে যাবে।'

গ্রাম-গঞ্জে যেসব পোস্টার আর হ্যান্ডবিল প্রচারের জন্য দেওয়া হত তাতেও উল্লেখ থাকত 'অট্টহাস্যের সম্রাট গৌরহরির একাধিক পিলে চমকানো অট্টহাস্য'।

অতএব, আমার পিলে না চমকালেও ড্রাইভারের পিলে যে চমকেছে, সেটা আমার বুঝতে অসুবিধে হল না। আগে অট্টহাস্যের পরই সংলাপ বলতেন, কিন্তু এখন বয়েস হয়ে যাওয়ার ফলে একবার অট্টহাস্য করলে একটু দম নিতে হয়। দম-টম নিয়ে গৌরহরিবাবু বললেন, 'সুন্দরবনের সুন্দরী-তে আসল হিরো হচ্ছে ওই বাঘ। যেখানে অত্যাচার, অন্যায় আর শোষণ, সেইখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওই বাঘ। অতএব, খাঁচায় রাখলে চলবে কেন? বাঘকে তো আমরা স্রেফ দর্শনধারী, মানে শো-পিস হিসেবে রাখছি না। ওকে দিয়ে অ্যাক্টিং করাচ্ছি।'

গৌরহরিবাবুর অট্টহাস্যে আমার পিলে চমকায়নি, কিন্তু বাঘ আসরে অ্যাক্টিং করছে, অন্যায় দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এটা শোনার পর আমার পিলে মুহুর্মুহু চমকাতে লাগল। কারণ, আমি জানি সমালোচক বলে আমাকে খাতির করে বসতে দেবে আসরের পাশে বাজনদারদের কাছাকাছি। অন্যায় দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে যদি আমার ওপরই পড়ে, তাহলে আমায় বাঁচাবে কে?

আমি বললাম, 'গৌরহরিবাবু, আপনাদের গ্রিনরুম থেকে যাত্রা দেখা যাবে না?'

গৌরহরিবাবু বললেন, 'ওখান থেকে দেখবেন কেমন করে! আপনাকে তো আসরের পাশেই বিস্তারা পেতে দেব।'

আমি বললাম, 'তা দেবেন জানি। কিন্তু ঝাঁপাঝাঁপি করতে গিয়ে বাঘটা যদি...'

গৌরহরিবাবু আবার হো-হো করে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

আমাদের গাড়িটা একটু লাফিয়ে উঠল বটে, কিন্তু এবার আর থামল না। দম নিয়ে গৌরহরি গুছাইত গুছিয়ে বসে বললেন, 'ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাঘ। একজন ট্রেনার আসরেই থাকে। অন্যজন গ্রিনরুমে। দুজন ট্রেনারের মাইনে কত জানেন?'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে, না।'

গৌরহরিবাবু বললেন, 'মাসে তিন হাজার টাকা, প্লাস খোরাকি। পার ডে ফিফটি রুপিজ খোরাকি। বাঘের খোরাকিও ফিফটি, ট্রেনারেরও ফিফটি।'

ট্রেনারের মাইনে আর খোরাকি জেনে তো আর বাঘের ভয় যায় না। তাই বললাম, 'অনেক সময় তো অঘটন ঘটে ! কাগজে দেখেননি, যে লোকটা রোজ বাঘকে খেতে দেয় সেই লোকটাকেই বাঘ একদিন খেয়ে ফেলল।'

গৌরহরিবাবু আবার নস্যি নিয়ে বললেন, 'হতে পারে, তেমন অঘটন হতে পারে। গেল হপ্তায় আমাদের পালা ছিল ক্ষ্যামাশুলিতে। জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসান যাচ্ছিল। ভাসানে দোদমা ফাটানো হয়েছে, চকোলেট বোমা ফাটছে আর তার শব্দ শুনে প্রিন্স তো চঞ্চল হয়ে এমন হুঙ্কার ছাড়ল যে, মা জগদ্ধাত্রীকে রোডে ফেলে সবাই পালাল।'

আমি একটা ঢোক গিলে প্রশ্ন করলাম, 'প্রিন্স কে?'

গৌরহরিবাবু বললেন, 'একটা নাম তো দরকার। বাঘ বললে আর কতটুকু বলা যায়। তাহলে তো বলা চলে নায়িকা চরিত্রে একজন মেয়ে। আমরা কি তাই বলি? আমরা বলি সর্বজনস্নেহধন্যা, কিন্নরকণ্ঠী মন্দাকিনী দেবী। অবশ্য ওর আসল নাম মঙ্গলা। হিরোইনের নাম মঙ্গলা, এটা চলে না। তাই মন্দাকিনী নাম দিয়ে দিয়েছি। নামের তো মশাই কপিরাইট নেই। তাই বাঘের নাম দিয়েছি মাস্টার প্রিন্স।'

আমি প্রশ্ন করি, 'মাস্টার কেন? বাঘটা কি কচি?'

গৌরহরিবাবু বললেন, 'বাঘের আবার কচিকাঁচা। ওই ট্রেনার বলল, ওর এখনও দুধের দাঁত রয়ে গেছে, অতএব ওকে মাস্টার বলতে পারেন। তা ছাড়া শুধু প্রিন্স বললে প্রচারে জোর আসে না। তাই আগে একটা মাস্টার মারলাম। আমাদের নতুন হ্যান্ডবিল দেখেননি? চলুন, আপনাকে দেখাব। সেখানে বাঘের ছবি দিয়ে লেখা আছে, জগতে এই প্রথম খোলা আসরে জ্যান্ত বাঘ। বাঘ অভিনয় করবে, গান গাইবে, নাচবে এবং অট্টহাস্য করবে।'

আমার ঢোক গেলার আর বিরাম নেই। আমি বলি, 'একটু বুঝিয়ে বলবেন? বাঘ গান গাইবে, নাচবে, আবার অট্টহাস্যও করবে?'

গৌরহরিবাবু ব্যাগ থেকে ফ্লাস্ক বের করতে করতে বললেন, 'আগে একটু চা খান, তারপর সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

চায়ে চুমুক দেওয়ার পর গৌরহরিবাবু বললেন, 'গানটা ভেতর থেকে ক্যাসেটে বাজবে। বাঘ শুধু ঠোঁট নাড়ছে। গানটা খুব হিট করছে। গানটা হচ্ছে হালের র‍্যাপ সং। নাচটা তো বাঘকে শিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। বাংলা গানে তো নাচ জমে না, তাই ওখানে হিন্দি ফিল্মের মিউজিক বাজবে, প্রিন্স টাইগার তার সঙ্গে ব্রেক ডান্স দেবে। পনেরো দিন লেগে গেছে প্রিন্সকে নাচ তোলাতে। আর অট্টহাস্যটা আমার। টেপ বাজবে।'

আমার তো ঝিমিয়ে পড়ার অবস্থা। একটা রিভিউ লিখলে মাসখানেক পরে তার বিল পাব। টাকার অঙ্ক মোটে পঞ্চাশ। তার জন্য আজ আমাকে বাঘের মুখে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে তো পালিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। অগত্যা মনে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'আপনিও

আমার সঙ্গে আসরে বাজনদারদের সঙ্গে বসবেন। দু-জনে মিলে বাঘের গান আর নাচ উপভোগ করব।'

গৌরহরিবাবু বললেন, 'তা কেমন করে হবে? আমাকে তো গ্রিনরুমে টাকাপয়সা নিয়ে বসতে হবে। দল চালানোর অনেক ঝামেলা।'

একটা বাজারের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়িটা যাচ্ছিল। গৌরহরিবাবু গাড়ি থামিয়ে কাঁচাগোল্লা আর জিবেগজা কিনলেন। আমার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, 'জায়গাটার নাম রসগঞ্জ। রসের মিষ্টির জন্য এটা বিখ্যাত। একবার জিবেগজাটা খেয়ে দেখুন, সাতজন্ম জিভে লেগে থাকবে। আর কাঁচাগোল্লা তো...'

আমি গৌরহরিবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'যতদূর জানি চাঁদপাড়া আর বনগাঁর কাঁচাগোল্লাই তো বিখ্যাত!'

গৌরহরিবাবু জিবেগজা চিবুতে-চিবুতে বললেন, 'সবই ওয়ান্‌স আপন এ টাইম। এই যে বর্ধমানের মিহিদানা আর সীতাভোগ, এর চেয়ে ভালো জিনিস কলকাতায় পাবেন। কিন্তু বর্ধমানের নাম হয়ে গেছে। ঠিক আমাদের বঙ্গালক্ষ্মী অপেরার মতো। একসময় দারুণ-দারুণ পালা দিয়েছে। ওঁদের 'রক্তের আলপনা', 'সতী পেল না পতি', 'মা-হারা সন্তান', 'দস্যু কালীরাম' আর 'যমের পরাজয়' এসব তো বিখ্যাত হিট পালা। কিন্তু আজ কী করছে? সব বোগাস! তবুও নামে কাটছে। নাম ভাঙিয়েই পালা পিছু তিরিশ কামাচ্ছে। আমরা বাঘ নাচিয়েও পঁচিশ হাজার পাচ্ছি। ওদের 'দস্যু কালীরাম' আর 'যমের পরাজয়' পালার বক্স কে ছিল জানেন?'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে না।'

গৌরহরিবাবু বললেন, 'এগুলো জানুন, জানবার চেষ্টা করুন। এগুলো তো বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাস। 'যমের পরাজয়' পালায় আমি যম সাজতাম। আসলে ওটা সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প। তাতে আমার একটা অট্টহাস্য চলত ঘড়ি ধরে তিন মিনিট। গাজোলের ও. সি. ঘড়ি নিয়ে আসরে বসেছিলেন। সেদিন অট্টহাস্য করেছিলাম তিন মিনিট চোদ্দো সেকেন্ড। ও. সি. তো হতভম্ব! আমায় রুপোর মেডেল দিয়েছিলেন। একটু শুনবেন সেই ঐতিহাসিক অট্টহাস্য?'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই ড্রাইভার বললেন, 'ওটা গ্রিনরুমে গিয়ে দেখাবেন। আমার ব্রেকটা একটু কমজোরি আছে। যদি ফেল করে!'

রসগঞ্জ পেরিয়ে গিয়ে আমরা ঝিকিরাতে ঢুকলাম। দেখতে পেলাম হেঁটে, সাইকেলে এবং রিকশাভ্যানে বিস্তর লোক যাচ্ছে। গৌরহরিবাবু গাড়ির কাচ নামিয়ে সেটা দেখলেন এবং কাচ তুলতে তুলতে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানালেন, 'সবাই যাচ্ছে 'সুন্দরবনের সুন্দরী' দেখতে। আজ নির্ঘাত ব্ল্যাক হবে। ক্ষ্যামাশুলিতে দশ টাকার টিকিট পঁচিশ টাকায় ব্ল্যাক হয়েছে। আজ তিরিশে পৌঁছোবে।'

গৌরহরিবাবু যত কথাই বলুন আমার কিন্তু মনে শান্তি নেই। বাঘ বলে কথা! কখন মেজাজ বিগড়োবে কে জানে! গৌরহরিবাবুর পেছন-পেছন প্রথমে গ্রিনরুমে এসে বসলাম। দলের অন্যান্যরা

হাত তুলে আমায় নমস্কার জানাল। খাতির করে উচ্চ আসনে বসতেও দিল। উচ্চ আসন মানে টিনের বড়ো বড়ো কালো বাক্স থাকে না, যাতে যাত্রা দলের সাজপোশাক থাকে তেমনই একটা বাক্সের ওপর মোটা-মোটা দুটো চাদর ভাঁজ করে পেতে দিল। কিন্তু আমার তো বসেও সুখ নেই, দাঁড়িয়েও স্বস্তি নেই। খালি এদিক-ওদিক তাকিয়ে 'তাঁকে' সন্ধান করি। গ্রিনরুম মানে যেটাকে সাজঘর বলে তার মধ্যে দুটো ভাগ থাকে। বড়ো ভাগটা পুরুষ শিল্পীদের আর ছোটোটা মহিলা শিল্পীদের। বাঘের মেক-আপ রুম নিশ্চয় এদের সঙ্গে হবে না। ওর জন্য অবশ্যই আলাদা ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু বাঘকে মেক-আপ দেয় কে? আর তার মেক-আপটাই বা কেমন?

এই সময় একটা ছেলে আমার জন্য এক কাপ গরম চা আর দুটো শিঙাড়া নিয়ে এল। ছেলেটি বেজায় বিনয়ী। গ্রিনরুমে ফাইফরমাশ খাটে আর দরকার হলে কোনো কোনো দৃশ্যে জনতা বা পথচারী সেজে আসরে ঢুকে যায়। ছেলেটার ভালো নাম আমি জানি না। ডাকনাম প্যালা। প্যালার জীবনকাহিনিও বড়ো অদ্ভুত। দশ বছর বয়সে সখীর দলে নাচত। তারপর যাত্রা থেকে সখীপর্ব উঠে যাওয়ার পর এই চাকরি করে। এইসব করতে করতেই প্যালা প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল পাশ করে ফেলেছে। পড়াশোনার ব্যাপারে গৌরহরিবাবু ওকে খুবই সাহায্য করেন। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর দলে ওর মাইনে বাড়ার কথা ছিল। তাই প্রথমেই প্যালাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁ রে, তোর মাইনে বেড়েছে?'

প্যালা বলল, 'পঞ্চাশ টাকা বেড়েছে। এই পালায় ছোটো একটা রোলও করছি।'

আরও দু-চারটে খুচরো কথা বলার পর আসল কথায় এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁ রে প্যালা, বাঘের গ্রিনরুম কি আলাদা?'

প্যালা উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই। ওটা একেবারে পেছন দিকে। ওখানে আমাদের যাওয়া বারণ। দুজন ট্রেনার আর গৌরহরিদা ছাড়া কেউ ওখানে ঢুকতে পারেন না। গেটের সামনে তাই 'নো অ্যাডমিশন' লেখা আছে।'

কোনও সংবাদেই কণামাত্র শান্তি পাচ্ছি না। হয়তো আসরে গিয়ে আজ পর্যন্ত শ্রীমান প্রিন্স অঘটন ঘটায়নি, তার মানে তো এই নয় যে, কোনোদিন ঘটবে না। জন্তুজানোয়ারদের মেজাজ যেকোনো সময় বিগড়ে যেতে পারে। আর আজই যদি সেটা হয়! আমি ভেতর ভেতরে ঘামতে লাগলাম।

গৌরহরিবাবু এলেন। হাতজোড় করে বললেন, 'কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে। পয়লা বেলও বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার আসরে চলুন।'

আমি বললাম, 'আসরে যেতেই হবে, তাই না?'

গৌরহরিবাবু বললেন, 'আসরে না গেলে দেখবেন কেমন করে! না দেখলে তো লিখতে পারবেন না। চলুন।'

দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলাম আমার হাঁটু কাঁপছে। গ্রিনরুমের দরজা পেরোতেই দ্বিতীয় বেল, মানে

ঘণ্টা বাজানো হল। তিন নম্বর ঘণ্টার পরই পালা শুরু হবে। আমি যেতে-যেতে বললাম, 'মাস্টার প্রিন্সের মেক-আপ হয়ে গেছে?'

গৌরহরিবাবু বললেন, 'ওর মেক-আপ বিশেষ নেই, শুধু গলায় একটা লালরঙের স্কার্ফ বেঁধে দেওয়া হয়।'

আমাকে বসানো হল বাঁশিওয়ালার পাশে। যদি তবলা বা হারমোনিয়ামের পাশে বসতে দিত তাহলেও না হয় বিপদকালে ওর মুখে ডুগিটা পুরে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু বাঁশি দিয়ে কী হবে?

গৌরহরিবাবু বললেন, 'ভয় নেই। আপনার উলটো দিকেই ট্রেনার বসে আছে।'

ট্রেনারকে দেখলাম কিন্তু ভরসা পেলাম না। ট্রেনার বিপদকালে আমাকে দেখবে না নিজেকে সামলাবে! কিন্তু কী আর করব! এখন তো আসর ছেড়ে পালাতে পারব না। চুপ করে বসে ওই কনসার্টের বাজনার মধ্যেও নিজের বুকের শব্দ শুনতে লাগলাম। ইতিমধ্যে তিন নম্বর অর্থাৎ ফাইনাল বেল পড়ে গেল। আসরের বাতি মৃদু হল। মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, 'নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। জনার্দন অপেরার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। এখন শুরু হচ্ছে এ-বছরের শ্রেষ্ঠতম পালা সু-ন্দ-র ব-নে-র সু-ন্দ-রী-ই ই ই।' সুন্দর থেকে সুন্দরী পর্যন্ত সবকটা শব্দকে টেনে-টেনে এমন দীর্ঘ করে উচ্চারণ হল যে, পালার নাম উচ্চারণেই প্রায় এক মিনিট গেল। এর পর আরও কিছু ঘোষণার পর গম্ভীর গলায় ঘোষণা করা হল, 'দর্শক সমাজের কাছে একটি নিবেদন, আমাদের নিবেদনটি মন দিয়ে শুনুন। পালার প্রথম দৃশ্যেই আসরে অবতীর্ণ হবে মাস্টার প্রিন্স। সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়াল বেঙ্গল টাইগার। আপনারা ওকে দেখে চায়ের ভাঁড়, ইটের টুকরো কিংবা অন্য জিনিস ওকে লক্ষ্য করে আসরে ছুড়বেন না। তাতে অঘটন ঘটতে পারে। বিপদ এড়াবার জন্য মাস্টার প্রিন্সকে কোনোভাবেই উত্তেজিত করার চেষ্টা করবেন না। ধন্যবাদ। শুরু হচ্ছে...'

আবার সেই টেনে টেনে 'সুন্দরবনের সুন্দরী' বলা হল।

একটু পরেই সবাই দেখি মাথা তুলে গ্রিনরুমের দিকে তাকাচ্ছে। গ্রিনরুমের দিক থেকে কোরাসে ভেসে এল, 'জয় বাবা দক্ষিণ রায়।'

নীচে চাকালাগানো একটা খাঁচা ঠেলতে ঠেলতে দু-জন আসরে এলেন। খাঁচার মধ্যে বেশ বড়োসড়ো একটা বাঘ। এই চেহারাতেও যদি দুধের দাঁত রয়ে যায়, তাহলে ভাতের দাঁত আর কবে গজাবে! বাঘ অবশ্য ভাত খায় না, অতএব ভাতের বদলে মাংসের দাঁত বলাই ভালো। চাকাওয়ালা খাঁচাটাকে দুই ট্রেনার আসরের মধ্যে ঘোরাতে লাগলেন। আর বাঘ খাঁচার মধ্যে বসে হাতজোড় করে দর্শকদের নমস্কার জানাতে লাগল। তাই দেখে দর্শকদের সে কী হাততালি! আমিও তালি বাজালাম। পরে আর কখনো তালি বাজাবার সুযোগ পাব কিনা জানি না। যেহেতু আসরে আমি আজ সম্মানিত অতিথি, তাই বাঘের খাঁচাটা আমার সামনেই এসে দুই ট্রেনার দাঁড় করালেন এবং বাঘ আমাকেও হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করল। এবার তালি

না বাজিয়ে আমিও হাতজোড় করে প্রতি-নমস্কার জানালাম। আমাকে খাতির দেখাবার এই পরামর্শ যদি গৌরবাবু দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা মোটেই ভালো কাজ হয়নি। নাকের ডগায় বাঘ এনে কেউ কি কোনও অতিথিকে আপ্যায়ন করে? কিন্তু এখন রাগ দেখার কার ওপর! একটু পরে খাঁচাসুদ্ধু বাঘকে নিয়ে যাওয়া হল। শুরু হয়ে গেল মূল পালা। চারটি দৃশ্য শেষ হতেই পঞ্চম দৃশ্যের গোড়ায় নায়িকা এসে কাঁদতে-কাঁদতে গান ধরল। গানটা দক্ষিণ রায়ের বন্দনাগীতি গোছের। জোতদার, মহাজনের অত্যাচার থেকে এই অভাগিনীকে কে বাঁচাবে? এই বন্দনাগীত শেষ হতেই অত্যাচারী মহাজনের প্রবেশ। নায়িকার শিশু ভাইটিকে মহাজন গলা টিপে জলে ফেলে দিতে উদ্যত, নায়িকার বিলাপ, ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই পিলে-চমকানো অট্টহাসি শোনা গেল। আমি জানি, এই কথাটি গৌরহরিবাবুর দ্বারাই সম্পাদিত। প্লে-ব্যাক সিঙ্গারের মতো উনি নেপথ্য থেকে বাঘের হয়ে অট্টহাস্য হেসেছেন। এখন টেপে সেটাই বাজছে। একটা নব্বই মিনিটের ক্যাসেটে নাকি শুধু নানাধরনের অট্টহাস্য তুলে রাখা আছে। অট্টহাস্য শুনে ভিলেন মহাজন থমকে পড়ে যেই না এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, তখন খোলা আসরে লাফ দিয়ে পড়ল মাস্টার প্রিন্স। মহাজনের সামনে এসে একবার গর্জন ছাড়ল, আর তাতেই আমার চক্ষুস্থির এবং আশপাশ থেকে কচি কণ্ঠে কারা যেন কেঁদে উঠে বলল, 'মা, বাড়ি যাব।'

আমারও তখন একই আর্তি। বাঁশিওয়ালা বাঁশি হাতে একটু পিছিয়ে গেল। অভিনেতারা প্রয়োজনে রাগ দেখায়। সেটা অভিনয়। কিন্তু বাঘ কি অতশত ভেবে রাগ দেখাবে? সত্যি-সত্যি রেগে গেলে...

আমি ঘেমে যাচ্ছি, কিন্তু পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল বের করার সাহস নেই। আমি সমালোচনা লিখব বলে অন্যরা খাতির করতে পারে, বাঘের তো সেসব বালাই নেই। বাঘ তো কাগজই পড়ে না!

কোনোরকমে দৃশ্যটা শেষ হল। কচি শিশুটিকে পিঠে নিয়ে বাঘ আসর ছেড়ে গ্রিনরুমের দিকে চলে যেতেই আসর জুড়ে প্রবল করতালিধ্বনি উঠল। এতক্ষণ তো সবাই হাতই তুলতে পারছিল না। আমি ছাপানো প্রোগ্রামে দেখলাম মাস্টার প্রিন্স আবার আসবে অষ্টম দৃশ্যে। মানে দুটো দৃশ্য একটু নিশ্চিন্তে দেখা যাবে। অষ্টম দৃশ্য শুরু হওয়ার আগে আসরে আলো আর শব্দের সাহায্যে ঝড় ওঠার পূর্বাভাস দেখানো চলছে। ওরই মধ্যে টেপে বেজে উঠল অট্টহাস্য। তার মানে মাস্টার প্রিন্স আসছে। আমি যথাসম্ভব গুটিয়ে বসলাম। হাসিটা চলতে চলতেই আসরের একদিক থেকে এবং গ্রিনরুমের ভেতর থেকে প্রবল চিৎকার উঠল, 'আগুন, আগুন...'

আমি তাকিয়ে দেখলাম, যেদিকে গ্রিনরুম সেইদিক থেকে দাউদাউ করে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে দু-পাশে। আসরের চারপাশে রঙিন কাপড়ে মোড়া যে বাঁশগুলো, তাতেও আগুন ধরে গেছে। আসরের মধ্যে, দর্শকদের ভেতর চিৎকার, আর্তনাদ আর হুড়োহুড়ি। আমার পাশ থেকে বাজনদাররা 'ওরে বাবা রে' বলে কোন দিকে যে ছুট মারল, সেটা বুঝতেই পারলাম না!

এই অবস্থায় দলের কাউকে কিংবা গৌরহরিবাবুকে খুঁজে পাওয়ার চিন্তা করাটাই বোকামি।

আমিও লাফ দিয়ে নামলাম এবং ভিড়ের ঠেলাঠেলি যেদিকে নিয়ে গেল সেই দিকে যেতে লাগলাম। যাত্রার প্যান্ডেলটা থেকে খানিকটা দূরে এসে দেখি প্যান্ডেলটা জ্বলছে। কেউ কেউ চেষ্টা করছেন বলতি বালতি জল এনে আগুন নেভাতে। একটু পরেই দুটো দমকল এল। দমকলের ঘণ্টা শুনে অনেকে কিছু স্বস্তি পেল বটে কিন্তু যা কিছু পোড়বার তা ততক্ষণে পুড়ে শেষ হতে চলেছে।

এরই মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকরা হাতে চোঙা ফুঁকে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, 'সবাই দলবদ্ধভাবে নিজ-নিজ বাড়িতে ফিরবেন। কারণ জর্নাদন অপেরার বাঘটি আগুন দেখে পালিয়ে গেছে। কোথায় আছে তা এখনও জানা যায়নি। সদর থেকে পুলিশ ফোর্স এলে অনুসন্ধানকার্য শুরু হবে। আপনারা সতর্ক থাকবেন।'

আমার অবস্থাটা এবার সহজেই অনুমেয়। দলের কাউকে পাচ্ছি না। এ-জায়গায় আমি একেবারেই নতুন। রাস্তাও চিনি না। সবাই না হয় দলবেঁধে নিজ-নিজ বাড়িতে গিয়ে দরজা দেবে। আমি যাব কোথায়? তা ছাড়া মাঝপথে যাত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে খোরাকির টাকাটাও তো প্রিন্স পায়নি। ও তো টাকার জন্য গৌরহরিবাবুকে খুঁজে বেড়াবে না! খিদে পেলে যাকে সামনে পাবে, তাকেই খাবে। তার মানে আমি। এই মুহূর্তে জঙ্গালের মধ্যে একা-একা আমিই তো আছি। আমার পেটে-পিঠে ব্যথা শুরু হল।

আমি ভাবলাম এই জঙ্গালে দাঁড়িয়ে না থেকে বরং প্যান্ডেলের দিকে যাই। দমকলকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক সকলেই ওখানে আছেন। কিন্তু প্যান্ডেলের দিকটা এখন অন্ধকার। সুন্দরবনের বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা জানার পর প্যান্ডেলের আশপাশে কী বেশি লোক থাকবে? কিন্তু কোথাও তো আমার যাওয়া দরকার। জঙ্গালের মধ্যে একা-একা দাঁড়ানো আদৌ নিরাপদ নয়। মরতে হলে লোকালয়ে গিয়ে মরাই ভালো। আমি পায়ে-পায়ে এগোতে লাগলাম, কোনদিকে এগুচ্ছি সেটা জানি না, তবুও পা চালাতে লাগলাম। রাসের আগে আকাশে যেমন চাঁদের আলো থাকে এখন সেইরকম আলো। দু-দিন পরেই তো রাসপূর্ণিমা। অন্ধকারটা চোখে সয়ে এসেছে। এবার বুঝলাম, যেখানে এসে পড়েছি সেটা একটা ঝোপঝাড়ের জঙ্গাল। ওর মধ্যে দিয়ে বড়ো নর্দমার মতো খাড়ি। বর্ষাকালে জল যাওয়ার জন্য এই অবস্থা। পায়ের নীচে শুকনো পাতা, হাঁটু অব্দি ঝোপ, মাঝে মাঝেই লম্বা-লম্বা গাছ। কীসের গাছ কে জানে! পথ চলতে এত কষ্ট হচ্ছিল যে, বাঘ, আগুন এসব আতঙ্ক আর তেমন করে মনে পড়ছিল না। তবে কোনো শব্দ শুনলেই কান খাড়া করছিলাম। বাঘের ভয় তো সহজে যাওয়ার নয়। তার ওপর রাতের খোরাকি না-পাওয়া পলাতক বাঘ। এরকম জঙ্গালে পথ হারিয়ে ফেলা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। এবার চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, আমার বাঁ-দিকে মনে হচ্ছে জঙ্গাল অপেক্ষাকৃত কম ঘন। দূর থেকে কয়েক বিন্দু আলো দেখে বুঝতে পারলাম ওইদিকে জনবসতি আছে। ওইদিকে যেতে হলে বড়ো নর্দমাটা পেরোতে হবে। আর ভাববার সময় নেই। পেরোবার আগে বুঝতে পারিনি, লাফ দিতে গিয়ে বুঝলাম আমি ওপারে না পৌঁছে শুকনো নর্দমার মধ্যেই পড়ে গেছি। গায়ে তেমন চোট লাগেনি। নর্দমাটা শুকনো

পাতায় বোঝাই। এবার ওপরে ওঠার পালা। সেইটি করতে গিয়ে বিপদ ঘটল।

আমি যখন ওপরে ওঠার চেষ্টা করছি তখন ওই নর্দমার ভেতর খসখস আওয়াজ পেয়ে ডানদিকে তাকিয়েই আমার শরীর হিম হয়ে গেল এবং আমি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লাম। আমার ডানদিকে হাতচারেক দূরত্বে মাস্টার প্রিন্স। আমার শুধু একবারের জন্য মনে পড়ল, 'মা বলেছিল, সকাল-সকাল ফিরিস। আজ গলদা রাঁধব।'

হায় গলদা! এখন রাতের খোরাকি না-পাওয়া মাস্টার প্রিন্স খাড়ির মধ্যে বসে আমাকেই গলদার মতো খাবে। আমি কিছুই করতে পারব না। খুব আস্তে আস্তে মাস্টার প্রিন্স আমার দিকে এগিয়ে এল। আর এগোবার দরকার কী! থাবাটা বাড়ালেই তো আমার ঘাড়টা ধরতে পারে। একবার টানলেই আমি তোমার দুধের দাঁতের নাগালে চলে যাব।

বাঘটা বোধ হয় খাবার আগে খাদ্যবস্তুটাকে দেখে নিতে চায়, তেমন করেই আমার সামনে এসে পড়ে বলল, 'দাদা, আপনি?'

আমার মনে হল, আমি মরে গেছি। মরে গিয়ে দেখছি বাঘ আমাকে দাদা সম্বোধন করছে। বাঘ একটা হাত আমার হাতে রেখে বলল, 'দাদা, আমি প্যালা।'

'প্যালা!' আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

প্যালা বলল, 'সবাই তো মানুষ সেজেছে, তাই দৌড়ে সবাই কোনো-না-কোনো বাড়িতে গেছে। আমি তো বাঘ সাজি, তাই আমার আর যাওয়ার জায়গা নেই। ক্লাব ঘরের জানালা দিয়ে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সবাই ক্লাব ছেড়ে পালাল। ওখানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে জঙ্গলের দিকে এলাম।'

আমি প্যালার শরীর টিপে টিপে দেখতে থাকি। তারপর বলি, 'তুই বাঘ সাজিস, সত্যির বাঘ নয়?'

প্যালা উত্তর দিল, 'সত্যির বাঘ আনা হয়েছিল, কিন্তু বাঘ নিয়ে খোলা আসরে যাত্রা করার পারমিশন পুলিশ দেয়নি। এদিকে তো প্রচার হয়ে গেছে, নাটক তৈরি, বায়নাও অনেক। তখন ভেবেচিন্তে গৌরহরিদা বললেন, 'প্যালা, দলে তোর প্রমোশন হল, একেবারে হিরো পার্ট। তোকে বাঘ সাজতে হবে। খোরাকি পঞ্চাশ টাকা। মাইনে তিন হাজার। তুই তো কিছুদিন সার্কাস দলে কাজ করেছিস, বাঘের ব্যাপারটা তুই ভালো বুঝবি।'

আমি বলি, 'তোর ট্রেনার?'

প্যালা বলে, 'ওগুলো লোক-দেখানো। ওরা বাক্স বয়। শুধু পালার আগে ট্রেনার সাজে। এই কথাটা গৌরহরিদা, ওই দুই ট্রেনার, আমি আর পুলিশ ছাড়া কেউ জানে না। বিপদ না ঘটলে আপনি জানতে পারতেন না। সমালোচনা লেখবার সময় দয়া করে এটা লিখবেন না যেন! তাহলেই গৌরহরিদা খোরাকির টাকা কমিয়ে পাঁচ করে দেবে। বিধবা মা আর পাঁচ ভাইবোনকে নিয়ে থাকি। দু-বেলা খাওয়ার জন্য না হয় বাঘই সাজলাম! কী বলেন?'

আমি তখন ভাবছি অন্য কথা। প্যালা না হয় সাজা বাঘ। তবু তো দেখতে বাঘই। ওকে নিয়ে এবার কোন পথে, কোন আশ্রয়ে যাব? বাঘ নিয়ে তো ট্রেনে-বাসেও উঠতে পারব না! এদিকে বাঘ খুঁজতে বেরিয়ে গ্রামবাসী যদি আমাদের দু-জনকে এখানে দেখে ফেলে, তাহলেও দুর্ভোগ নিতান্ত কম হবে না! প্যালার সঙ্গে কী মানুষ সাজার কোনো পোশাক নেই? সত্যি, আমাদের কারো কাছেই সেটা এখন নেই।

নির্বেদ রায়

ভুলের ওজন পঁচিশ পাউন্ড

ভুল মানুষ মাত্রেই হয়ে থাকে। সেটা এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মানুষই আবার সে ভুল শুধরে নেয়। কিন্তু উইলফ্রেড ম্যাকনিলি নামে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা শ্বেতাঙ্গ মানুষটির ভুলের ধরনটা হয়ে পড়েছিল একটু বেয়াড়া গোছের। সাধারণত এই ধরনের ভুল-টুল হলে খুব কম মানুষই সে ভুল শুধরে নিয়ে পৃথিবীর ওপর হেঁটে চলে বেড়াবার সুযোগ পায়। ম্যাকনিলি অবশ্য সে সুযোগ পেয়েছিল, তবে তার মুখের ওপর ভালোভাবে একটু চোখ বুলিয়ে আনলেই বোঝা যেত যে, সেই ভুলের মাশুল হিসেবে তাকেও কম খেসারত গুনতে হয়নি। তার কপালের প্রায় পুরোটা জুড়ে দুটো চোখের ওপর পর্যন্ত নেমে আসা গভীর দাগগুলো যে আসলে বীভৎস কতগুলো ক্ষতচিহ্নের স্মৃতি, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ভারতবর্ষ।

আজকের স্বাধীন ভারত নয়, তখন ব্রিটিশ অধিকৃত উপনিবেশ। সেই সময় বিলেতে 'কার্টার-ডাউনেস লিমিটেড' নামে একটি কাপড়ের কল থেকে ম্যাকনিলিকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল তুলোর চাষের তদারকি করতে। বিদেশে তখন ভারতের তুলোর চাহিদা খুব বেশি। ভারত থেকে তুলো নিয়ে গিয়ে, সেই তুলোয় কাপড় তৈরি করে আবার ভারতবর্ষেই সেই কাপড় বেচে তখন রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে ওঠে ম্যানচেস্টারের মিলগুলো। 'কার্টার-ডাউনেস' তারই একটা।

মাদ্রাজে নেমে ম্যাকনিলি প্রথম দেখা করল এস. টি. মজুমদার নামে এক ভদ্রলোকের

সঙ্গে। মজুমদার তাকে নিয়ে গেল উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ের ঢালে তুলোর চাষ দেখাতে। সপ্তাহখানেক ধরে চাষবাসের তদারকি করল দু-জনে।

অবসর সময়ে মজুমদার ঘুরে বেড়াত কাঞ্চনজঙ্ঘা আর হিমালয়ের কোল ঘেঁষে ছড়ানো বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর বিচিত্র বর্ণময় ফুল ও লতা-পাতার ঝোপেঝাড়ে। তার নেশা ছিল উদ্ভিদতত্ত্ব। কাজের ফাঁকে সারাদিন ঘুরে ঘুরে সে তাই ছবি তুলত যত দুর্লভ লতা-পাতা আর ফুলের। অন্য দিকে সেই সময়ে ম্যাকনিলি বসে থাকত একান্ত বেকার হয়ে। অথচ এই পরিবেশে তাঁর বেকার বসে থাকার কথা নয়। বহুদিন ধরেই উইলফ্রেড ম্যাকনিলির প্রিয় নেশা—শিকার! আর শিকারের তীর্থক্ষেত্র ভারতবর্ষের অরণ্য-প্রকৃতির মাঝে এসে একজন শিকারির পক্ষে দিনের পর দিন হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা কী করে সম্ভব?

যে বিরাট ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে শিং-এর সঙিন উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায় বুনো মোষের পাল অথবা খড়্গধারী গণ্ডার—তৃণভূমির ওপর সন্ত্রস্ত ও সদাসতর্ক হয়ে বিচরণ করে চিতল অথবা সম্বর হরিণ আর তাদের পিছনে হলুদ ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় গা মিলিয়ে শিকারের সন্ধানে হানা দিয়ে ফেরে বাঘ অথবা লেপার্ডের দল—আকাশছোঁয়া প্রকাণ্ড গাছের মোটা ডাল থেকে পাক খুলতে খুলতে বিপুল দেহকে অলস মন্থর ভঙ্গিতে নামিয়ে আনে বিরাট ময়াল—নদীর পাড়ে কাদামাটিতে শুয়ে নিঃসাড়ে রোদ পোহায় ক্ষুধার্ত কুমির আর গোলপাতার জঙ্গলে মৃত্যুর জাল বিছিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে যে বুকে-হাঁটা জীবগুলো, যাদের ছোবল মানেই যমের পরোয়ানা, সেসবের আস্তানা ভারতবর্ষে এসে একজন শিকারির পক্ষে একেবারে খালি হাতে দেশে ফেরা কি সম্ভব?

প্রায় রোজ রাত্রেই তাঁবুতে ফিরে ম্যাকনিলি তাঁর বন্দুকগুলো পরিষ্কার করে তেল-টেল দিত, কিন্তু মজুমদারের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। সে রয়েছে তার নিজের খেয়ালে—তার উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়ে। ফলে সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করার পরে ম্যাকনিলিকে নিজেই উদ্যোগী হতে হল।

আধুনিক যুগে আগ্নেয়াস্ত্রের অনেক উন্নতি ঘটেছে। তপ্ত সিসার মৃত্যুদংশন বহুদূর থেকে অব্যর্থ লক্ষ্যে শুইয়ে দিতে সক্ষম যেকোনো ভয়ংকর জানোয়ারকে। ফলে শিকারের বিপজ্জনক খেলা হয়ে পড়েছে আগের চেয়ে অনেকটাই নিরাপদ। কিন্তু 'শিকার' শব্দটি বলতেই যাদের মনে জেগে ওঠে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চের স্বাদ, শিকার বলতে যারা শুধু নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকেই বোঝে না, বোঝে সমান সুযোগ নিয়ে জীবন দেওয়া-নেওয়ার তীব্র আরকে ভেজানো এক খেলাকে, এ ধরনের মানুষেরা নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে শিকারের আনন্দ খুঁজে পায় না। জীবনকে বাজি ধরে মরণ খেলার খেলোয়াড় হয়েই তারা খুঁজে পায় আনন্দের স্বাদ। খেলার একান্ত নিয়মেই তারা কখনো হারে, আবার কখনো জেতে। পুরস্কার হিসাবে কখনো তাদের ভাগ্যে জোটে হিংস্র শ্বাপদের সুন্দর চামড়া কী অতিকায় তৃণভোজীর বিরাট সুদৃশ্য মাথা, আবার কখনো তাদের দুর্ভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে অরণ্যভূমির বুকে পড়ে থাকে নখ, দাঁত অথবা শিং-এর আঘাতে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ।

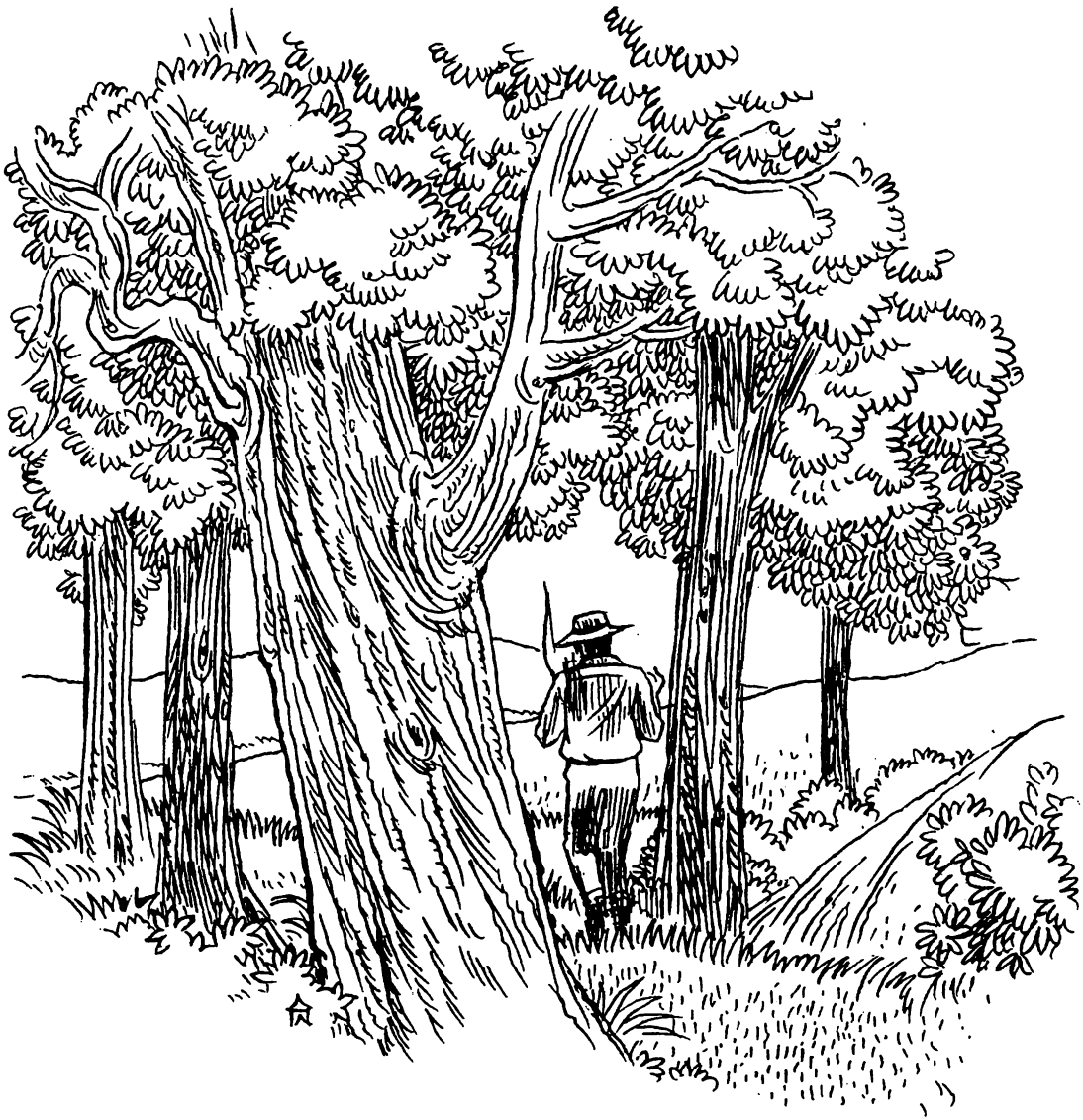

এত সব জেনেও কিন্তু বেপরোয়া মানুষ ওইভাবেই প্রাচীন অথবা মধ্যযুগীয় প্রথায় শিকার করতে ভালোবাসে। উইলফ্রেড ম্যাকনিলি ছিল ঠিক ওই ধরনের মানুষ। তাই আফ্রিকার 'মাসাই' অথবা 'নান্দি' উপজাতির মানুষরা যেরকম সামান্য একটা হাতে তৈরি বর্শা সম্বল করে পশুরাজ সিংহের মুখোমুখি হয়, আরব দেশের মানুষ যেমন শুধুমাত্র তলোয়ার হাতে ক্ষিপ্ত বন্য হাতির মোকাবিলা করে, তেমনই সঙ্গে বন্দুক থাকলেও শিকারের জন্য ম্যাকনিলির প্রিয় হাতিয়ার ছিল

তির-ধনুক। এবার ভারতে আসার সময় সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল 'ফাইবার-গ্লাসের' তৈরি একটা ধনুক, যার গুণের টান ছিল পঞ্চাশ পাউন্ড।

একদিন সকালে বেরোবার সময় সেটাকে সঙ্গে নিয়েই বেরোলো ম্যাকনিলি। আর নিল চওড়া ফলাওয়ালা কটা তির। পথ চলতে চলতে চোখে পড়ল রং-বেরঙের পাখির ঝাঁক, একটার পর একটা, অগুণতি। কিন্তু কোনোটাকেই ঠিক তিরের আওতায় পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমে সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল। তারা এসে পৌঁছোল ছোটো ছোটো পাথর-সাজানো একটা বাগানের মতো চত্বরে। ক্লান্তির পথচলা।

হঠাৎ একটু দূরে একটা ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া চোখে পড়ল ম্যাকনিলির। সঙ্গেসঙ্গে ধনুকে তির লাগিয়ে তৈরি হল সে। তারপর একটা নুড়ি তুলে নিয়ে ছুড়ে দিল ঝোপ লক্ষ্য করে। মুহূর্তের জন্য ধূসর-বাদামি রঙের একটা ধাবমান দেহ ম্যাকনিলির চোখে ধরা দিল, ভালো করে তার সঠিক রূপটাও দেখতে পেল না সে। কিন্তু শিকারির হাতের অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় সাঁ করে ছুটে গেল হাতের তির। লক্ষ্য অব্যর্থ! শিকার লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। একটা 'হগডিয়ার'—ছোটো জাতের হরিণ।

ম্যাকনিলির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওন্‌ডি। তার মুখের চামড়ায় বয়সের অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। জাতে নেপালি। ওস্তাদ পথপ্রদর্শক। পানের ছোপওয়ালা দাঁত বের করে সে হাসল—'সাহেব, তুমি খুব পাকা শিকারি। তবে তোমার একজন সঙ্গী থাকলে আরও ভালো হয়। তোমার আপত্তি না থাকলে আমিই তোমার সঙ্গী হতে পারি।' এ প্রস্তাবে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না; ম্যাকনিলিরও ছিল না।

এদিকে ততক্ষণে মজুমদারও এসে পড়েছিল। শিকার দেখে সেও বন্ধুকে অভিনন্দন জানাল, আর সেই সঙ্গে বোধহয় এত দিন পরে একটা সোজা কথা তার বোধগম্য হল যে, তার নিজের মতো ম্যাকনিলিরও একটা শখ আছে এবং তাকেও সেই শখ মেটাবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ফলে পরের দিন থেকে যে যার প্রয়োজনমতো জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে নিজের নিজের সুবিধামতো পথে বেরোতে শুরু করল। মজুমদারের সঙ্গে থাকত একজন কী দুজন পথপ্রদর্শক আর ক্যামেরা। ম্যাকনিলি সঙ্গে নিত তির-ধনুক আর ওন্‌ডিকে।

চওড়া ফলার তির ম্যাকনিলির সঙ্গে খুব বেশি ছিল না। তবে যে ক-টা ছিল সেগুলোকে কাজে লাগিয়েই দিন কয়েকের মধ্যে সে শিকার করেছিল একটা সম্বর হরিণ, দুটো চিতা আর অনেকগুলো বুনো কুকুর। কিন্তু ভারতের বনে যেসব কুলীনদের বাস, তাদের মুখোমুখি হতে গেলে আরেকটু শক্তিশালী হাতিয়ারের প্রয়োজন। ম্যাকনিলি ইস্পাত আর কাঠের তৈরি দুটো মজবুত ধনুক বিলেত থেকে আনিয়ে নিল। এই দুটো ধনুকেরই গুণের টান ছিল আগেরটার তুলনায় পঁচিশ পাউন্ড বেশি, অর্থাৎ পঁচাত্তর পাউন্ড।

পরের বছরের বসন্তাগত দিনগুলোতে ম্যাকনিলি ছুটি কাটাল গাড়োয়াল আর কুমায়ুনের মাঝের

পর্বতমালার ঢালে। তুষারমৌলি নন্দাদেবীর কোলে শিকারের খোঁজে ঘুরে এবার তার ভাগ্যে জুটল বড়ো পাহাড়ি ভালুক আর চিতাবাঘ। সুতরাং, আর কী চাই? চাই নিশ্চয়ই—এখনও বাকি ভারতীয় অরণ্যভূমির একচ্ছত্র অধিপতির সঙ্গে মোলাকাত—ডোরাকাটা কেঁদো বাঘ!

কিন্তু রাজদর্শন তো আর সহজে মেলে না, তার জন্য ধৈর্য ধরতে হয়। ম্যাকনিলিও সুযোগের অপেক্ষায় রইল। অবশেষে সে সুযোগ এল প্রায় ছ-সাত মাস বাদে, সে বছর নভেম্বর মাসে।

শিকারের অপেক্ষায় একা জলাশয়ের পাড়ে পঞ্চাশ পাউন্ডের ধনুকটায় তির জুড়ে অপেক্ষা করছিল ম্যাকনিলি। উদ্দেশ্য, যদি রাতে খাবারের টেবিলে কোনো সুস্বাদু মাংসের ব্যবস্থা করা যায়।

এমন সময় ওন্‌ডি দৌড়োতে দৌড়োতে এসে খবর দিল—'বাঘ, সাহেব বাঘ! ওই নালাটার মধ্যে ঢুকেছে।'

ওন্‌ডির কথায় নেমে এসে দেখল ম্যাকনিলি। হ্যাঁ, বাঘই বটে। ভুল হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। নালার মুখে বিরাট গোল গোল নিখুঁত পায়ের ছাপগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই অভিজ্ঞ শিকারি ম্যাকনিলির বুঝতে অসুবিধে হল না যে, বাঘটা শুধু পূর্ণবয়স্কই নয়, রীতিমতো স্বাস্থ্যবানও বটে। কিন্তু পঞ্চাশ পাউন্ডের ধনুকে বাঘ মারা যায় না, তাঁবুতে ফিরে গিয়ে উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ততক্ষণ বাঘটা কি আর এখানে থাকবে?

ওন্‌ডি সেকথা জিজ্ঞাসা করতে তার মুখে আরও গোটাকয়েক ভাঁজ পড়ল। একটু চিন্তা করে সে বলল—'আমার মনে হয় বাঘটা এখন ঘুমোবে, তাই খেয়ে-দেয়েই নালার মধ্যে ঢুকেছে।'

ওন্‌ডির কথায় ভরসা করা যায়। দেরি না করে ম্যাকনিলি সঙ্গেসঙ্গে ছুটল তাঁবুর দিকে। হিমালয়ের ঢালে নানা রঙের বাহারি ফুলের মাঝে টানটান করে বাঁধা সাদা তাঁবু। সামনের ফাঁকা জমির ওপর দাঁড়িয়ে মজুমদার একটা হেলিকপ্টারকে হাত নেড়ে বিদায় দিচ্ছিল। এই হেলিকপ্টারটা ডাকের চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া করে। ম্যাকনিলিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে দেখে সে একটু অবাক হল—'কী ব্যাপার! কী হল আবার...'

'একজনের সাথে জরুরি দেখা করার কথা। তাই একটু তাড়াতাড়ি করছি।' উত্তর দিল ম্যাকনিলি।

'দেখা করার কথা? এখানে? কার সাথে?' মজুমদার বেশ কিছুটা অবাক।

'মানে, ওই একটা বাঘের সঙ্গে আর কী...' খুব স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দেওয়ার মাঝেই কাজ করে যাচ্ছিল ম্যাকনিলি। হাতের ধনুকটা দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে সে পঁচাত্তর পাউন্ডের ধনুকে গুণ পরাতে বসল। আগেই বলেছি, পঁচাত্তর পাউন্ডের দুটো ধনুক ছিল ম্যাকনিলির। তাদের মধ্যে ইস্পাতেরটা সে আনিয়েছিল সুইডেন থেকে, আর কাঠের ধনুকটা সে বানিয়েছিল তার পছন্দমতো অর্ডার দিয়ে ইংল্যান্ডের এক পাকা কারিগরের থেকে। রাজদর্শনে যেতে হলে সব দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া ভালো। তাই এখন সে তার প্রিয় কাঠের ধনুকটাই বেছে নিয়ে গুণ পরিয়ে নিল।

নালার কাছে পৌঁছে একটা গাছের তলায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করে নিল ম্যাকনিলি। এতটা পথ দৌড়ে যাওয়া-আসা করে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। এখন কিছুটা দম নিয়ে নেওয়া দরকার। বাঘের মুখোমুখি হতে গেলে প্রথমেই দরকার ঠান্ডা মাথা, শান্ত স্নায়ু। উত্তেজনার লেশমাত্র যেকোনও সময়ে মারাত্মক বিপদ ঘটাতে পারে।

দম নিয়ে তৈরি হওয়ার পর ম্যাকনিলি এবার ওন্‌ডিকে বিদায় দিল, 'ঠিক আছে, এবার তাহলে তুমি যেতে পারো ওন্‌ডি।'

ওন্‌ডিকে সঙ্গে না নেওয়ার কারণ আছে। পথপ্রদর্শক হিসাবে ওন্‌ডি যতখানি ওস্তাদ, বন্দুক ছোড়ায় সে ততটাই আনাড়ি। আর মজার কথা হল, ওন্‌ডি নিজেও একথাটা জানত। তাই ম্যাকনিলির কথায় কোনো প্রতিবাদ করল না সে। শিকারের সময় আনাড়ি লোক সঙ্গে রেখে অযথা বিপদের ঝুঁকি বাড়িয়ে লাভ কী?

এবার ধীরে ধীরে নালার পাশে এসে দাঁড়াল ম্যাকনিলি। নালার দুটো পাড় খাড়া হয়ে উঠে গেছে—দু-দিকেই ঝোপঝাড় ভরতি। ফলে বাঘের পালাবার পথ বন্ধ। মুখোমুখি লড়াইয়ে তাকে নামতেই হবে।

নালার জল বরফের মতো ঠান্ডা। দুরন্ত স্রোত, কিন্তু কোথাও খুব একটা গভীর নয়। পায়ের গোড়ালির বেশি ডোবে না। নালা পেরিয়ে অপর পারে গিয়ে ম্যাকনিলি একটা পাথরের টুকরো তুলে নিল। নালার প্রান্তে একটা বড়ো ঝোপ। ম্যাকনিলির বুঝতে অসুবিধা হল না যে ওই ঝোপের মধ্যেই বিশ্রামের আয়োজন করেছে বাঘ। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে সে এবার পাথরের টুকরোটা ছুড়ে দিল ঝোপ লক্ষ্য করে, আর ঠিক সেই সময়ে ঝোপের দিক থেকে বয়ে-আসা একঝলক বাতাসে তার নাকে এসে লাগল বাঘের গায়ের উগ্র গন্ধ। পাথরটা গিয়ে পড়ল ঝোপের মধ্যে। ততক্ষণে পিঠের থেকে তির টেনে নিয়ে ধনুকে জুড়ে ফেলেছে ম্যাকনিলি।

ঝোপের মধ্যে বাঘ একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছিল। ম্যাকনিলির ছোড়া পাথরের টুকরো তার সেই নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। বিরক্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তার রাজত্বে ঠিক এই ধরনের বেয়াদবি সহ্য করতে সে অভ্যস্ত নয়। মৃদু গর্জনে বিরক্ত প্রকাশ করে সে বেরিয়ে এল ঝোপের বাইরে। বেরিয়ে এসে একটা অতিকায় বেড়ালের মতো সামনের দু-পা ছড়িয়ে প্রথমে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল, মাটি আঁচড়াল বার কয়েক, তারপর মাথা তুলে তাকাল। অত্যন্ত ধীরস্থির ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি বরফের মতো ঠান্ডা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ম্যাকনিলি তাকিয়ে দেখল যে ধনুকে সে ভুল তির জুড়ে বসে আছে!

মাত্র কুড়ি গজ দূরে দাঁড়িয়ে জান্তব মৃত্যু। ম্যাকনিলি সাধারণত ওই কুড়ি গজ দূরে একটা সিগারেটের প্যাকেট রেখে তার মধ্যে দিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে পরপর ছ-টা তির চালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে একটু অন্যরকম।

যে তিরটা ম্যাকনিলি জুড়ে বসেছে, এটা পঞ্চাশ পাউন্ডের ধনুক থেকে ছোড়ার পক্ষে একটা আদর্শ তির সন্দেহ নেই, কিন্তু পঁচাত্তর পাউন্ডের ধনুক থেকে ছুড়লে এ তির ধাক্কা সহ্য করতে পারবে না; কেঁপে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। আর এখন তির পালটাবার প্রশ্নই ওঠে না, বাঘ এসে পড়েছে কুড়ি গজের আওতায়। ম্যাকনিলির সমস্ত শরীর বেয়ে বয়ে গেল একটা আতঙ্কের শিহরন। তবু সেই আতঙ্কের মাঝেই ধনুকে আকর্ণ গুণ আকর্ষণ করল ম্যাকনিলি। তিরের ফলা চেপে বসল তার প্রসারিত বাঁ-হাতের মুঠোর ওপর, ছিলার দু-পাশ থেকে বেরিয়ে আসা লেজের পালকগুলো এসে ঠেকল তার গালের পাশে।

বাঘের আক্রমণের ধারাটা জানা ছিল ম্যাকনিলির। পারতপক্ষে বাঘ সোজাসুজি আক্রমণ করে না, সবসময় চেষ্টা করে ঘুরে গিয়ে পিছন থেকে শত্রুকে কাবু করতে। এখানে সে সুযোগ নেই, তবু একটু ঘুরে এসে সে গুঁড়ি মেরে বসল। আক্রমণের পূর্বাভাস বলতে ওইটুকুই। আর কোনো সংকেত নেই—নেই লেজের আন্দোলিত আস্ফালন, নেই দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসা হিংস্র দাঁতের সারি, নেই অবরুদ্ধ গলার চাপা গর্জন। এককথায়, এই বাঘটা যেন অস্বাভাবিক রকমের ঠান্ডা। ঠান্ডা মানে শান্ত নয়, পেশাদার খুনির মতোই ভাবলেশহীন।

ম্যাকনিলিও ঘুরে গিয়ে বাঘের মুখোমুখি হল। মুহূর্তমাত্র! পরক্ষণেই হলুদ-কালোর ডোরাকাটা একটা বিদ্যুৎ উড়ে এল ম্যাকনিলির দিকে। ওই উড়ন্ত বিদ্যুৎ ঝলকের মাঝে লক্ষ্য স্থির রাখা সোজা কথা নয়। তবু ম্যাকনিলির চোখে পলকের জন্য ধরা দিল হলুদ-কালোর মাঝখানে একফালি সাদা অংশ—বাঘের বুক আর পেট! সেই অংশটুকু লক্ষ্য করেই তির ছেড়ে দিল ম্যাকনিলি, আর সেই সঙ্গে ডান দিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বাঘের উদ্যত আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য। তবু শেষরক্ষা হল না। চকিতের জন্য ম্যাকনিলি অনুভব করল, যেন একটা কঠিন রবারের প্যাডের ওপর বসানো কয়েকটা ধারালো ছুরির ফলা তার কপাল ছুঁয়ে গেল—বাঘের থাবার স্পর্শ! ছিটকে পড়ল সে মাটির ওপর। মাটিতে শুয়ে প্রতিমুহূর্তে ম্যাকনিলি অপেক্ষা করছিল মৃত্যুর জন্য; এখনই যেকোনও সময়ে বাঘের নখ আর দাঁতের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তার দেহ...।

কিন্তু কই, আঘাত তো এল না। ধীরে ধীরে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাকনিলি। সারা দেহ তার অক্ষত ঠিকই, কিন্তু চোখের সামনে যেন ঝুলছে একটা পরদা; পরিষ্কারভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। ম্যাকনিলির বুঝতে অসুবিধা হল না ওই পরদার উৎস কোথায়? বাঘের থাবা তার কপালের ওপর ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি করেছে।

পরীক্ষা করার জন্য হাত দিয়ে ক্ষতস্থান স্পর্শ করতেই অসহ্য যন্ত্রণার একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ ভেদ করে; এক ঝটকায় মাথাটা পিছন দিকে সরিয়ে নিল সে। আর চোখের সামনে কালো পরদাটাও সরে গেল তখনি, অবশ্য দু-এক সেকেন্ডের জন্য, তারপরই আবার নেমে এল পরদা। কিন্তু ম্যাকনিলি এবার বুঝতে পারল ক্ষতটা কী ধরনের। আসলে বাঘের থাবায় ওই অল্প একটু আঁচড়েই তার কপালের বেশ খানিকটা চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলে পড়েছে দুটো চোখের ওপর। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করে ম্যাকনিলি সেই ঝুলে-পড়া চামড়াটাকে হাত দিয়ে চেপে ধরল যথাস্থানে। এবার পরিষ্কার দেখতে পেল সে—একটু দূরেই পড়ে আছে বাঘ—নিস্পন্দ, মৃত। কাত হয়ে পড়ে থাকা তার শরীরের মধ্যে আমূল বিঁধে রয়েছে তিরটা। শুধুমাত্র পালকগুলো ছাড়া তিরের আর কোনো অংশই দেখা যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে নালাটা পার হল ম্যাকনিলি। কিন্তু বরফের মতো ঠান্ডা জল এবার তার মধ্যে কোনো অনুভূতিই জাগাল না—তার সমস্ত শরীর-মন জুড়ে তখন শুধু এক তীব্র যন্ত্রণার স্বাদ।

কিছুদূর গিয়েই ওন্‌ডির দেখা মিলল। 'বাঘটা মরে পড়ে আছে, তুমি আমার ধনুক আর তিরগুলো একটু গুছিয়ে নিয়ে এসো,' এর বেশি আর কোনো কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না ম্যাকনিলির।

তাঁবুতে যখন ম্যাকনিলি ফিরল তখন হিমালয়ের কোল ঘেঁষে সন্ধ্যা নেমে আসছে। তাঁবুতে ফিরে দেখা হল মজুমদারের সঙ্গে।

'শেষ পর্যন্ত তির দিয়েই বাঘটাকে মারলাম, বুঝলে মজুমদার,' বলল ম্যাকনিলি, 'তবে ওটা ভুল তির ছিল।'

ওই একটিমাত্র কথা, তারপরই তার চেতনাকে লুপ্ত করে নামল মূর্ছার অন্ধকার।

পরে নিজের জীবনের এই কাহিনি কোনো বন্ধুকে বলতে বসলে ম্যাকনিলি বলত, 'আমার এই গল্পটা থেকে একটা শিক্ষা অন্তত নেওয়া উচিত—তা হল একান্তই যদি কখনো তির-ধনুক দিয়ে বাঘ শিকার করতে হয় তবে নিদেনপক্ষে তিরটা একবার ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া বড়ো দরকার। নয়তো, চরম মুহূর্তে আমার মতো ঘটনা ঘটলে, ভাগ্য ছাড়া তোমাকে আর কেউ যে নতুন করে পৃথিবীর আলো দেখাবার বন্দোবস্ত করতে পারবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

বুরুডিপাসের আতঙ্ক

বাসাডেরা না বুরুডিপাস? চ্যাংজোড়া পেরোলে আরও ভয়ংকর। কাশীদা তামুকপালও অরণ্যময়। সাতগুড়ুম নদীর অববাহিকায় এবং সুবর্ণরেখার উভয় তীরে তখন দুর্ভেদ্য জঙ্গল। লক্ষ্মণ মেটের বাড়ি ছিল বাসাডেরায়। চ্যাংজোড়া পেরিয়ে যেতে হত। তার মুখে আরণ্যক জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনি শুনে কাঁটা দিত গায়ে।

আজ থেকে ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে আমার বয়সই বা কত? খুব জোর বিশ-বাইশ। বি. আর. আই-কেজিপি'-র ক্যাজুয়্যাল লেবার হিসেবে 'নো ওয়ার্ক নো পে'-র একটা ছোটোখাটো চাকরি পেয়েছিলাম। ঘাটশিলা স্টেশনের অদূরে হিলকার্টের ধারে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাস কী মধুময়ই না ছিল! চারদিকে ঘন শাল-মহুয়ার বন। বড়ো-বড়ো সেগুন, পলাশ আর তাকে জড়িয়ে ঘন পাতার চিহ্ড়লতায় যেন বর্ণের বাহার। বাঘ-ভালুকের ভয়ে সারারাত আগুন জ্বেলে পাহারা দিত নাইট গার্ড। প্রকৃতির দৃশ্য দেখে ভরে উঠত মন। দু-চোখ মেলে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আর কত কী ভাবতাম! এরই মধ্যে কাজের ফাঁকে অথবা ব্রিজে স্ক্র্যাপ করতে-করতে লক্ষ্মণ মেটের মুখে শুনতাম বুরুডিপাসের আতঙ্কের কথা। বুনো হাতির উপদ্রবে তছনছ হয়ে যাওয়া বাসাডেরা অথবা বিধ্বস্ত চ্যাংজোড়ার কাহিনি শুনে ভয় হত। এমনই একসময় মাঘের শেষে যখন পলাশবনে রঙের আগুন, তখনই একদিন ঠিক হল, আমাদের রেস্ট-ডে-তে আমরা দু-তিনজন বাসাডেরা গ্রামে গিয়ে লক্ষ্মণ মেটের বাড়িতে থাকব। তারপর ওখান থেকে সোজা

চলে যাব বুরুডিপাস। হোক না ভয়ংকর, তবু অরণ্যের ভয়াবহতা কিছুটাও তো অনুভব করতে পারব!

ঘাটশিলার এক টিম্বার-মার্চেন্ট রোজ সকালে ধারাগিরির জঙ্গলে কাঠ আনতে যেতেন। তাঁরই ট্রাকে রওনা হলাম আমরা। রবি, আমি ও কেষ্টদা। লক্ষ্মণ মেটে একদিন আগেই চলে গেছেন। দু-দিনের নাগা। আমরা সেই অরণ্য-পর্বতের দেশে ট্রাক-বাহনে অভিযান শুরু করলাম। একসময় অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে বাসাডেরা গ্রামে যখন পৌঁছোলাম, তখন সে কী আনন্দ আমাদের! লক্ষ্মণ মেটে আমাদের জন্য পথের ধারেই অপেক্ষা করছিলেন। ট্রাক থামতেই আমরা ঝুপঝাপ নেমে পড়লাম।

সবিস্ময়ে আমরা বললাম, 'সত্যি লক্ষ্মণদা, তুমি কী ভাগ্যবান! এত সুন্দর তোমার গ্রাম!'

লক্ষ্মণদা হেসে বললেন, 'কিছুদিন থাকো না, তা হলেই বুঝবে এই সুন্দর কত রোমাঞ্চকর! কীভাবে আমরা বেঁচে আছি এই গভীর বনবাসে।'

লক্ষ্মণদা যাই বলুন না কেন, আমরা অভিভূত। লক্ষ্মণদার বউ আমাদের তেলমাখা মুড়ি, পেঁয়াজ, লঙ্কাভাজা আর ডিমের ওমলেট করে খাওয়ালেন। পাতার জ্বাল দিয়ে একটু ভেলি গুড়ের চায়ের ব্যবস্থাও হল। তাই যেন অমৃত। আশপাশ থেকে অনেক আদিবাসী ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে ধরল আমাদের। শহরের মানুষ দেখতে লাগল।

আমরা জলযোগ সেরে নিয়ে গ্রামের মানুষদের বসবাসের বুনো ঝুপড়িগুলো দেখতে লাগলাম। সেগুলোর চেয়েও ভালো লাগল এখানে গাছের ওপর ঘর দেখে।

আমি বললাম, 'লক্ষ্মণদা, গাছের ওপর ঘর কেন? কারা থাকে ওখানে?'

'কেউ থাকে না। তবে খেতে ফসল হলে পাহারা দেওয়ার সময় পাহারদাররা থাকে। বুনো শুয়োর বা হাতির উপদ্রব খুব এখানে। তারা ফসল নষ্ট করতে এলে ওই মাচাঘরে বসে ক্যানেস্তারা পেটায় পাহারাদাররা। তখন হয় ওরা ভয়ে পালায়, নয়তো সবকিছু তছনছ করে। এমনিতে তো সামনে যাওয়া যায় না ওদের।'

'এখানে বাঘ আছে?'

'আছে বই কী! বাঘ আর ভালুকেরই তো দেশ। সন্ধ্যের পর তাই ঘর থেকে বেরোনো নয়। তবে দিনমানে সচরাচর বেরোয় না এরা।'

যাই হোক, আমরা যেজন্য এখানে এসেছিলাম, সেসব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বুরুডির একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পাশে বসে আমরা পিকনিক করব। জায়গাটা নাকি ভারি মনোরম। লক্ষ্মণদা দু-একজন আদিবাসীকে তির-কাঁড় নিয়ে আমাদের সঙ্গে যেতে বললেন। মুরগিও জোগাড় করলেন দু-তিনটে। সবে রওনা হতে যাব, এমন সময় দুঃসংবাদ! বুরুডিপাসের আতঙ্ক আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। একটা বাঘ বেশ কিছুদিন ধরে উপদ্রব শুরু করেছে আবার। গ্রামবাসীদের গোরু-ছাগল খেতে-খেতে কাল একজন মানুষকে নাকি ভরদুপুরে টেনে নিয়ে গেছে।

অতএব আর যাওয়া নয়।

লক্ষ্মণদা বললেন, 'এখন ওদিকে না যাওয়াই ভালো। বাঘ যখন নরখাদক হয়, তখন সে খুবই মারাত্মক। যদিও বুরুডিপাসের সেই আতঙ্ককে এখনও চোখে দেখেনি কেউ, তবুও সে আসে নিঃশব্দে পদসঞ্চারে। মনের মতো শিকারটি তুলে নিয়েই উধাও হয়ে যায়।'

এত আশা, সবই জল। রবি, আমি, কেষ্টদা তিনজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

আমি বললাম, 'যা হয় হোক, এতদূর এসে বুরুডিপাস না দেখে যাচ্ছি না। সাবধানে থাকব আমরা। তা ছাড়া সন্ধ্যের আগেই তো ফিরে আসছি।'

লক্ষ্মণদা বললেন, 'কিন্তু...।'

'কোনো কিন্তু নয়। এই সুযোগ হাতছাড়া করলে আর হবে না। এখানকার কাজ আমাদের শেষ হয়ে আসছে। এরপর একেবারে সিনি কিংবা গিধনিতে। কবে অর্ডার আসে কে জানে!'

তাই আর দ্বিমত নয়। আমাদের যাত্রা হল শুরু।

বুরুডিপাসের সেই বিখ্যাত জলাশয়ের চারপাশ ঘিরে সে কী অরণ্যের গভীরতা! দিনমানেও যেন রাতের অন্ধকার সেখানে। আজ যারা বুরুডিতে পিকনিক করতে যান, ১৯৬১ সালের সেই বুরুডির পরিবেশ কল্পনাতেই আনতে পারবেন না তাঁরা। যাই হোক, বনের কাঠকুটো সংগ্রহ করে মুরগির মাংস আর ভাত রান্না করে খেতে খেতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। ঠিক এই সময় বাসাডেরায় ফিরতে গেলে বাঘে না খেলেও ভালুকের হাত থেকে নিস্তার নেই।

এদিকে বুরুডির গ্রামবাসীরা সেই নরখাদকের সন্ধানে তোলপাড় করছে চারদিক।

যাই হোক, লক্ষ্মণদা বলে-কয়ে আদিবাসীদের একটি ঝুপড়িতেই আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলেন। আগেই বলেছি, আমার তখন অল্প বয়েস। আমি জেদ ধরলাম রাত্রিবাসই যদি করতে হয়, তাহলে ঝুপড়িতে নয়। এখানেও গাছের মগডালে যেসব ঘর আছে তারই একটিতে থাকব আমরা।

লক্ষ্মণদা বললেন, 'পাগল নাকি? ওইভাবে কখনো তোরা থাকতে পারিস? ছেলেমানুষি করিস না। একটা বিপদ ঘটে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

কিন্তু রবি আর আমি দু-জনে নাছোড়বান্দা।

লক্ষ্মণদা বললেন, 'যা ভালো বুঝিস কর। আমি কিন্তু গাছে উঠছি না। কেননা ওখানে আমার ঘুম হবে না। আর ঘুম না হলে কাল ডিউটি করব কী করে? তিনদিন নাগা হলে চাকরি থাকবে?'

রবি বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। তুমি যা করবে করো। আমরা গাছেই থাকব।'

আমি বললাম, 'গাছে না থাকলে জঙ্গলের জন্তুজানোয়ার দেখব কী করে? তুমিই বলো?'

লক্ষ্মণদা বললেন, 'তবে মর তোরা।'

কেষ্টদাও তখন পিছু হটলেন। বললেন, 'আমিও এইসব দুষ্টমিতে নেই। আমি ঝোপড়িতেই থাকব।' বলে লক্ষ্মণদার সঙ্গ নিয়ে চলে গেলেন আদিবাসী পল্লিতে। আমরা দু-জনে খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে দড়ির মই বেয়ে উঠে পড়লাম টঙে।

সে কী আনন্দ! দেখতে-দেখতে সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হল। অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক। কিরকিরে পোকার ডাকে কানে যেন তালা ধরে গেল। মশার কামড়ে আর পোকার কামড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমরা। কিন্তু না পেলাম বাঘের দেখা, না দেখলাম...

হঠাৎ ও কী? একসময় দেখি জোড়া-জোড়া টর্চের আলো চারিদিকে যেন ঘোরাফেরা করছে। আমাদের কাছেও টর্চ ছিল। তাই জ্বেলেই দেখলাম কত-কত হরিণ! উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম আমরা। ভাগ্যিস টঙে উঠে বসেছিলাম, না হলে এই দৃশ্য কী দেখতে পেতাম কখনো? কিন্তু সে মুহূর্তের ব্যাপার। হঠাৎ কী যে হল, বিদ্যুৎগতিতে উধাও হয়ে গেল তারা।

এবারে যে দৃশ্য দেখলাম তা আরও অভিনব। বুরুডির জলাশয়ের ধারে হাঁকডাক করে ঘোরাফেরা করছে কিছু ভালুক। আর কিছু কালো পশমের ডেলা ঘোরাফেরা করছে তাদের ঘিরে। বুঝলাম ওগুলো ওদের শাবক। একসময় তারাও হারিয়ে গেল বনের অন্ধকারে।

রবি বলল, 'জায়গাটা ভালোই পছন্দ করেছি আমরা। সমস্ত জন্তু-জানোয়াররাই জল খেতে আসবে এখানে। কিন্তু বাঘ? বাঘের দেখা নেই কেন?

বলার সঙ্গেসঙ্গেই টর্চের আলোর মতো দুটো জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি পড়ল আমাদের ওপর। আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম অরণ্যের নিশাচরদের। বইয়ে পড়েছিলাম চতুষ্পদ জন্তুদের চোখ রাত্রিবেলা জ্বলে, কিন্তু তা যে এইভাবে, তা আমাদের ধারণাতেও ছিল না।

রবি চিৎকার করে উঠল, 'বাঘ! বাঘ! এই তো! এই তো বাঘ!' ওর টর্চের আলো তখন বাঘের মুখে।

সঙ্গেসঙ্গে বনভূমি কাঁপিয়ে সে কী ভয়ংকর ডাক! হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি যেন হঠাৎই থেমে যাওয়ার উপক্রম হল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনিতে দুলে উঠল গাছের ঘরটা। আর সেই ঝাঁকুনিতেই যা ঘটবার তা ঘটে গেল। অর্থাৎ চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল রবিটা। কী সর্বনাশ! কোথায় গেল ছেলেটা! আমি ওর নাম ধরে কত ডাকলাম। কিন্তু সাড়াও নেই, শব্দও নেই। ভয়ে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমস্রোত নেমে এল যেন। আমি জোরে জোরে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে ডাকতে লাগলাম সকলকে। একসময় গ্রামের দিক থেকে মশালের আলোর সংকেত দেখা গেলেও আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল না কেউ।

সে-রাতটা যে কীভাবে কাটল, তা আমিই জানি।

পরদিন সকালে যখন এল ওরা, তখন আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা স্বর বেরিয়ে এল শুধু, 'লক্ষ্মণদা, রবি...।'

'কী হয়েছে রবির?'

লক্ষ্মণদাকে সব বললাম।

লক্ষ্মণদা ভীষণ রেগে বললেন, 'ওই জন্যই আমি বারণ করেছিলাম তোদের। শুনলি না তো

আমার কথা। এখন ফিরে গিয়ে সাহেবকে আমি কী বলব? তোদের এখানে আনাটাই আমার ভুল হয়েছে।'

আমি বললাম, 'কাল যে আমি ক্যানেস্তারা পিটিয়ে অত করে তোমাদের ডাকলাম, একবার আসতে পারলে না কেউ?'

'আমরা তো আসছিলাম। আলো দেখিসনি?'

'আসছিলে তো এলে না কেন?'

'বুনো হাতির দল যে ঘিরেছিল চারদিক। তাই বাধ্য হয়েই ফিরে গেলাম। অরণ্যের ওই গণেশ দেবতা খেপলে কী রক্ষা আছে? তাই আসতে সাহস হয়নি কারো। বাঘের যম হাতি। হাতির যম বাঘ। তোদের টর্চের আলোয় নয়, হাতি দেখেই ভয়ে চিৎকার করেছিল বাঘটা। আর তখনই ঘটে গেছে অঘটন। নিশ্চয়ই রবিটা ভয় পেয়ে পড়ে গেছে বাঘের মুখে। বাঘও তার শিকার পেয়ে কেটে পড়েছে নিজের ডেরায়।'

তবুও শুরু হল খোঁজার পালা।

ঠিক এই সময় এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ল যে, তা দেখে আমরা হাসব না কাঁদব, কিছু ঠিক করতে পারলাম না। আদিবাসীদের শিকারি কুকুরের চিৎকারে আমরা সেই জলাশয়ের ধারে গিয়ে দেখি, বাঘের গলা জড়িয়ে বাঘের পিঠে শক্ত কাঠ হয়ে শুয়ে আছে অচৈতন্য রবি। আর জলে-ভেজা ধূসর রঙের বাঘটা এমনই ক্লান্ত যে, জল থেকে ওঠার আর শক্তি নেই তার।

যাই হোক, আমরা বহুকষ্টে উদ্ধার করলাম রবিকে। আর আধমরা বাঘটাকে পিটিয়ে মারল সকলে।

অনেক পরে রবির জ্ঞান ফিরলেও, রাতের কথা কিছুই বলতে পারেনি সে। তবে আমরা অনুমানে বুঝলাম, বাঘের ডাকে ভয় পেয়ে রবি পড়বি তো পড় বাঘের ঘাড়েই। বাঘও আচমকা ওইরকম একটা ভারী বস্তু তার ঘাড়ে পড়ায় আরও ভয় পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অথই জলে। তারপর সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচায়। জলাশয়ের চারপাশে নিশ্চয়ই তখন বুনো হাতির দল। ফলে তাদের নজর এড়িয়ে পালানো সম্ভব না হওয়ায় অর্ধমৃত হয়ে জলেই থাকতে হয় সারারাত। কী কষ্ট বেচারির!

এখন একই গ্রহের ফেরে একজনের পুনর্জন্ম, আর-একজনের মোক্ষলাভ হলেও বাঘের সেই করুণ পরিণতির কথা আজও ভুলিনি আমি। রেলের চাকরি আমি পরের বছরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু রবি? সে এখন মস্ত অফিসার।

সুনীল জানা

হালুম হুলুম

এক বাঘের দুই বাচ্চা। একজনের নাম হালুম আর একজনের নাম হুলুম। হালুম পাঁচ মিনিটের বড়ো, আর হুলুম ঠিক সাত মিনিটের ছোটো। হিসেবে কোনো ভুল নেই। সিঙ্গিমামা নিজেই ওদের জন্মের সময়টা হিসেব করে দিয়েছে। সিঙ্গিমামা একবার ঘড়িপরা একটা আস্ত মানুষ খেয়ে ফেলেছিল কিনা, সেই থেকে সে ঠিক-ঠিক সময় বলে দিতে পারে।

পাঁচ-সাত মিনিটের ছোটো-বড়ো হলে কী হবে, দু-জনের মধ্যে ভারি ভাব কিন্তু! হালুমের হাঁচি পেলে হুলুমেরও তক্ষুনি হাঁচি পায়। হুলুমের পেট কামড়ালে হালুমেরও অমনি পেট কামড়াতে থাকে। হালুম মনের আনন্দে গান গায় তো হুলুম ফুর্তির চোটে নাচ জুড়ে দেয়। আর খিদে পাবার বেলায়? তখন তো কোনো কথাই নেই। দু-ভাই মিলে খাই-খাই করতেই আছে সব সময়। হালুম বলে, কী খাই—কী খাই? তো হুলুম বলে, হাতি-ঘোড়া যা পাই। ওদের খাওয়াতে-খাওয়াতে বাঘ শেষকালে ফতুর হয়ে গিয়ে ওদের মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলে।

হালুম হুলুম মহা-আনন্দে মামার বাড়ি এসে হাজির।

মামার বাড়ি ঢুকতে-না-ঢুকতেই হালুম চেঁচাতে লাগল, 'ও মামা গো, খুব খিদে পেয়েছে।' হুলুমও সমানে চেঁচাতে লাগল, 'ও মামি গো, আগে খেতে দাও।'

সিঙ্গিমামা-সিঙ্গিমামি তো ভাগনেদের দেখে খুব আদর-টাদর করল, পেটভরে কত কী খেতে দিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আরামে গল্পগুজব করতে লাগল। ওমা—গল্প করতে-করতে একটু বাদেই আবার খিদে পেয়ে গেল হালুমের। দেখতে-দেখতে হুলুমেরও।

আমার কথা। এখন ফিরে গিয়ে সাহেবকে আমি কী বলব? তোদের এখানে আনাটাই আমার ভুল হয়েছে।'

আমি বললাম, 'কাল যে আমি ক্যানেস্তারা পিটিয়ে অত করে তোমাদের ডাকলাম, একবার আসতে পারলে না কেউ?'

'আমরা তো আসছিলাম। আলো দেখিসনি?'

'আসছিলে তো এলে না কেন?'

'বুনো হাতির দল যে ঘিরেছিল চারদিক। তাই বাধ্য হয়েই ফিরে গেলাম। অরণ্যের ওই গণেশ দেবতা খেপলে কী রক্ষা আছে? তাই আসতে সাহস হয়নি কারো। বাঘের যম হাতি। হাতির যম বাঘ। তোদের টর্চের আলোয় নয়, হাতি দেখেই ভয়ে চিৎকার করেছিল বাঘটা। আর তখনই ঘটে গেছে অঘটন। নিশ্চয়ই রবিটা ভয় পেয়ে পড়ে গেছে বাঘের মুখে। বাঘও তার শিকার পেয়ে কেটে পড়েছে নিজের ডেরায়।'

তবুও শুরু হল খোঁজার পালা।

ঠিক এই সময় এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ল যে, তা দেখে আমরা হাসব না কাঁদব, কিছু ঠিক করতে পারলাম না। আদিবাসীদের শিকারি কুকুরের চিৎকারে আমরা সেই জলাশয়ের ধারে গিয়ে দেখি, বাঘের গলা জড়িয়ে বাঘের পিঠে শক্ত কাঠ হয়ে শুয়ে আছে অচৈতন্য রবি। আর জলে-ভেজা ধূসর রঙের বাঘটা এমনই ক্লান্ত যে, জল থেকে ওঠার আর শক্তি নেই তার।

যাই হোক, আমরা বহুকষ্টে উদ্ধার করলাম রবিকে। আর আধমরা বাঘটাকে পিটিয়ে মারল সকলে।

অনেক পরে রবির জ্ঞান ফিরলেও, রাতের কথা কিছুই বলতে পারেনি সে। তবে আমরা অনুমানে বুঝলাম, বাঘের ডাকে ভয় পেয়ে রবি পড়বি তো পড় বাঘের ঘাড়েই। বাঘও আচমকা ওইরকম একটা ভারী বস্তু তার ঘাড়ে পড়ায় আরও ভয় পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অথই জলে। তারপর সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচায়। জলাশয়ের চারপাশে নিশ্চয়ই তখন বুনো হাতির দল। ফলে তাদের নজর এড়িয়ে পালানো সম্ভব না হওয়ায় অর্ধমৃত হয়ে জলেই থাকতে হয় সারারাত। কী কষ্ট বেচারির!

এখন একই গ্রহের ফেরে একজনের পুনর্জন্ম, আর-একজনের মোক্ষলাভ হলেও বাঘের সেই করুণ পরিণতির কথা আজও ভুলিনি আমি। রেলের চাকরি আমি পরের বছরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু রবি? সে এখন মস্ত অফিসার।

সুনীল জানা

হালুম হুলুম

এক বাঘের দুই বাচ্চা। একজনের নাম হালুম আর একজনের নাম হুলুম। হালুম পাঁচ মিনিটের বড়ো, আর হুলুম ঠিক সাত মিনিটের ছোটো। হিসেবে কোনো ভুল নেই। সিঙ্গিমামা নিজেই ওদের জন্মের সময়টা হিসেব করে দিয়েছে। সিঙ্গিমামা একবার ঘড়িপরা একটা আস্ত মানুষ খেয়ে ফেলেছিল কিনা, সেই থেকে সে ঠিক-ঠিক সময় বলে দিতে পারে।

পাঁচ-সাত মিনিটের ছোটো-বড়ো হলে কী হবে, দু-জনের মধ্যে ভারি ভাব কিন্তু! হালুমের হাঁচি পেলে হুলুমেরও তক্ষুনি হাঁচি পায়। হুলুমের পেট কামড়ালে হালুমেরও অমনি পেট কামড়াতে থাকে। হালুম মনের আনন্দে গান গায় তো হুলুম ফুর্তির চোটে নাচ জুড়ে দেয়। আর খিদে পাবার বেলায়? তখন তো কোনো কথাই নেই। দু-ভাই মিলে খাই-খাই করতেই আছে সব সময়। হালুম বলে, কী খাই—কী খাই? তো হুলুম বলে, হাতি-ঘোড়া যা পাই। ওদের খাওয়াতে-খাওয়াতে বাঘ শেষকালে ফতুর হয়ে গিয়ে ওদের মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলে।

হালুম হুলুম মহা-আনন্দে মামার বাড়ি এসে হাজির।

মামার বাড়ি ঢুকতে-না-ঢুকতেই হালুম চেঁচাতে লাগল, 'ও মামা গো, খুব খিদে পেয়েছে।' হুলুমও সমানে চেঁচাতে লাগল, 'ও মামি গো, আগে খেতে দাও।'

সিঙ্গিমামা-সিঙ্গিমামি তো ভাগনেদের দেখে খুব আদর-টাদর করল, পেটভরে কত কী খেতে দিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আরামে গল্পগুজব করতে লাগল। ওমা—গল্প করতে-করতে একটু বাদেই আবার খিদে পেয়ে গেল হালুমের। দেখতে-দেখতে হুলুমেরও।

হালুম বলে, 'আবার যে একটু একটু খিদে পাচ্ছে, মামা।'

হুলুম বলে, 'আবার যে জোর খিদে পাচ্ছে, মামি।'

ব্যাস, গল্প করা অমনি মাথায় উঠল। সিঙ্গিমামা বনে দৌড়োল শিকার ধরতে। বাড়িতে আর কিচ্ছুটি নেই। সিঙ্গিমামি একথা-সেকথা বলে ততক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করল ওদের। কিন্তু অত সহজে ভোলার পাত্র নয় ওরা। মিনিটে-মিনিটে ওরা চেঁচাতে লাগল, 'ও মামি গো—মামা কোথায় গেল? ও মামি গো, খিদের চোটে যে মরে গেলাম।'

শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল সিঙ্গিমামির। ভাগনেদের খিদের বায়না মেটাতে মেটাতে দু-দিনেই মামা-মামির অবস্থা কাহিল। সিঙ্গিমামি একদিন চুপিচুপি সিঙ্গিমামাকে বলল, 'চলো, এ-বন ছেড়ে পালাই। নইলে আমাদেরও খেয়ে সাবাড় করবে।'

সিঙ্গিমামা বলল, 'ঘাবড়াও কেন? ওদের আমি ঠান্ডা করছি। ওরাও যেমন ভাগনে, আমিও তেমনি মামা।'

তারপর সিঙ্গিমামা ভাগনেদের ডেকে বলল, 'ওরে হালুম, ওরে হুলুম, তোদের নিন্দের চোটে বনে আর কান পাতা যায় না যে রে।'

হালুম বলল, 'কেন, মামা?'

হুলুম বলল, 'কী হয়েছে মামা?'

সিঙ্গিমামা কেশে-টেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'বাঘের বাচ্চা তোরা, দেখতে-দেখতে এই এত বড়োটা হলি, অথচ আজ অব্দি একটা মানুষ মারতে পারলি না? লজ্জায় কাউকে যে আর মুখ দেখাতে পারছি না। মানুষ না মারলে যে তোদের অন্নপ্রাশনই হবে না।'

ওহো, এই কথা! হালুম হুলুম অমনি লাফিয়ে ওঠল, 'ঠিক আছে মামা। বাঘের বাচ্চা কাকে বলে, আজ দেখিয়ে দেব সবাইকে, মানুষ মেরে আজ অন্নপ্রাশন করবই করব।'

এই না বলে লেজ পাকিয়ে থাবা বাগিয়ে হালুম হুলুম মানুষ শিকার করতে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু মানুষ কাকে বলে? সে আবার কোন ধরনের জানোয়ার? জন্ম থেকে একটাও যে মানুষ দেখেনি তারা।

হালুম জিজ্ঞেস করল, 'মানুষগুলো কীরকম দেখতে মামা?'

সিঙ্গিমামা মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'ভারি বিচ্ছিরি দেখতে মানুষগুলো। কেমন লম্বা লম্বা লিকলিকে চেহারা, গায়ে একটুও লোম নেই, পেছনের পা দুটো টেনে-টেনে হাঁটে, আর সামনের পা দুটো সঙের মতো দু-পাশে ঝুলিয়ে রাখে। দেখলে তোদের ভক্তি হবে না। কিন্তু খেতে যা চমৎকার—কী বলব! একবার কামড়ে ধরলে আর ছাড়তেই ইচ্ছে করে না! ওঃ—সেই যে কবে একবার মানুষ খেয়েছিলাম—'

বলতে বলতে সিঙ্গিমামা বারবার ঠোঁট চাটতে লাগল। তাই দেখে লোভের চোটে হালুম হুলুমের জিভ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ে আর কী!

হুলুম জিজ্ঞেস করল, 'মানুষগুলো কোথায় পাওয়া যায় মামা?'

সিঙ্গিমামা বললে, 'এই বন পেরিয়ে সোজা চলে যা যেদিকে দু-চোখ যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ দেখতে পাবি। কিন্তু খুব সাবধানে যাস বাপু। ভারি হিংসুটে হয় মানুষগুলো।'

হালুম হুলুম লেজ ফুলিয়ে বলে উঠল, 'বাঘের বাচ্চা আমরা। মানুষ তো আমাদের কাছে নস্যি!'

এই না বলে আনন্দে লাফাতে-লাফাতে হালুম হুলুম চলল মানুষ শিকার করতে। কী ফুর্তি তখন দুজনের ফুর্তির চোটে খিদে পাওয়ার কথা কারুর মনেই ছিল না। লাফাতে-লাফাতে একসময় তারা বনের একেবারে শেষ মাথায় এসে পৌঁছোল।

হালুম বলল, 'এবার আমি ডান দিকে যাই।'

হুলুম বলল, 'এবার আমি বাঁ-দিকে যাই।'

তখন হালুম চলল ডান দিকে। হুলুম চলল বাঁ-দিকে। আলাদা-আলাদা শিকার ধরবে দু-জনে।

হালুম বেচারা তারপর ডানদিকে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। যাওয়ার আর শেষ নেই। যেতে যেতে অনেক মাঠঘাট পেরিয়ে বনবাদাড় পেরিয়ে সকাল দুপুর সন্ধ্যে পেরিয়ে শেষকালে এক গ্রামে এসে পৌঁছোল। তখন একেবারে মাঝরাত্তির। সবাই তখন দিব্য নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে যে যার বাড়িতে। হালুম আর মানুষ পাবে কোথায়? খিদের চোটে এদিকে বেচারার পেট চুঁই-চুঁই করছে। মানুষ খুঁজতে-খুঁজতে হালুম একসময় এক গেরস্থের বেগুন-খেতের কাছে এসে হাজির।

এদিকে গেরস্থ করেছিল কী, কাক তাড়ানোর জন্যে একটা কাকতাড়ুয়ার মূর্তি বানিয়ে বসিয়ে রেখেছিল বেগুন-খেতের মধ্যে। খড় দিয়ে বাঁধা লম্বা লম্বা হাত-পায়ের ওপর একটা ঢোলা জামা পরানো, মাথার দিকে একটা কালো হাঁড়ি উপুড় করে চুন দিয়ে তার ওপর চোখ-মুখ আঁকা। অবিকল মানুষের মতো। তাই দেখে দেখে হালুম তো আহ্লাদে আটখানা। এতক্ষণে একটা মানুষ পাওয়া গেছে। মামার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। খিদের মুখে গোটা মানুষটাকে চিবিয়ে এক্ষুনি অন্নপ্রাশন করে ফেলবে সে।

এই না ভেবে পেছন থেকে গুটি-সুটি মেরে এগোতে এগোতে হালুম করল কী, লেজ বাঁকিয়ে থাবা বাগিয়ে সোজা মারল এক তিড়িং লাফ। ক্যাঁক করে কামড়ে ধরল মানুষটার এক পায়ে। ইস্‌স্—ওয়াক্-থু-থু! কীসব গজগজ করছে তার মুখের মধ্যে। তাড়াতাড়ি পা ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে থুতু ফেলতে লাগল হালুম। মুখটা তার বিচ্ছিরি বিস্বাদ হয়ে গেছে একেবারে। রেগেমেগে মেজাজ খারাপ করে হালুম তখন আর একটা পা কামড়ে ধরল। ওমা—সেই একইরকম যে, কোনো রসকষ কিচ্ছুটি নেই। দুর দুর, এমন অখাদ্য হয় নাকি মানুষগুলো? কিন্তু সিঙ্গিমামা যে বলেছিল এত করে? ভেবেচিন্তে হালুম তখন মাথা লক্ষ করে মারল আর এক তিড়িং লাফ। অমনি হল কী, হালুমের মাথার জোর ধাক্কা লেগে কাকতাড়ুয়ার মাথার কালো হাঁড়িটা ফটাস করে ফেটে ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।

ব্যস, আর যায় কোথা! মানুষ খাওয়া তো হালুমের মাথায় ওঠল। কোত্থেকে কীসে যে কী হয়ে গেল কে জানে! কিছুই তার মাথায় ঢুকল না। বিলকুল ঘাবড়ে গিয়ে হালুম তক্ষুনি এক

লাফে পগার পার। ভয়ের চোটে কোনদিকে যে চোঁচা দৌড় মারল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

এদিকে হুলুমও বাঁদিকে যেতে যেতে এদিক পেরিয়ে ওদিক পেরিয়ে সেদিক পেরিয়ে মাঝরাত্তিরে

এক শহরের কাছে এসে হাজির। যেখানে এসে পৌঁছোল, সেখানে এক বড়োলোকের বিরাট বাগানবাড়ি। হুলুম অবাক হয়ে চারপাশে তাকাল। এ আবার কোথায় এলাম রে বাবা! যাহোক, বাড়ির চারপাশের বাগানে অনেক গাছপালা দেখে হুলুম তো সাহস করে ঢুকল ভেতরে। ঢুকে গাছের আড়ালে আবডালে এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করতে লাগল। এখন তাড়াতাড়ি একটা মানুষ জোগাড় করা দরকার। কোথায় যে থাকে হতচ্ছাড়া মানুষগুলো! খিদের চোটে এদিকে যে পেটে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে সব।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় হুলুমের চোখ আটকে গেল। ওই তো একটা মানুষ না? হ্যাঁ, ঠিক—মামার বর্ণনার সঙ্গে কাঁটায়-কাঁটায় মিলে যাচ্ছে একেবারে। ওই যে ওখানে লম্বা মতন একটা দেখা যাচ্ছে। ব্যস, অমনি হুলুমকে আর পায় কে! খিদের জ্বালায় হুলুমের আর তর সইল না। মানুষটাকে যেই না দেখা, সঙ্গেসঙ্গে পাগলের মতো ছুটে গেল হুলুম। গিয়ে একটা মোক্ষম কামড় বসিয়ে দিল মানুষটার পায়ে।

আর দেখতে হল না! বাগানের সেই মানুষটা তো আসলে মানুষ নয়, পাথরের পরীর মূর্তি একটা। কিন্তু হুলুম অতশত বুঝবে কী করে? খিদের মুখে যেই না হুলুম কামড় মেরেছে তার পায়ে, অমনি তার কচি-কচি দাঁতগুলো একেবারে মট মট মটাস—আর কী! আর ভাঙা দাঁত দিয়ে গলগল করে সে কী রক্ত! বাবা রে—মামা রে—হালুম রে—গেলুম রে—বলতে বলতে হুলুমের তো মূর্ছা যাবার জোগাড়। কিন্তু মূর্ছা গেলে চলবে কেন? কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে তো। দাঁতের যন্ত্রণা ভুলে হুলুম তখন আর পালাবার পথ পায় না।

পরের দিন ভোরবেলা হালুম হুলুমের আবার দেখা হল সেই বনের ধারে। কিন্তু কেউ কাউকে তখন আর চিনতেই পারে না। কাকতাড়ুয়ার হাড়ি ভেঙে ভুসো কালি লেগেছে হালুমের মুখ জুড়ে। আর হুলুমের সারা মুখ তো রক্তে মাখামাখি। বাঘের বাচ্চা বলে আর তাদের চেনার জো নেই।

দু-জনেই অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দু-জনের দিকে।

হালুম বললে, 'তুই কে রে?'

হুলুমও বললে, 'তুই কে রে?'

হালুম বলে, 'আমি হালুম।'

হুলুমও বললে, 'আমি হুলুম।'

তারপর দুজনে দুজনের গলা জড়াজড়ি করে সে কী কান্না! কাঁদতে কাঁদতে হালুম হুলুম যে সেখান থেকে কোথায় চলে গেল, কে জানে! তবে সিঙ্গিমামার বাড়িতে আর তারা ফিরে যায়নি।

প্রচেত গুপ্ত

কিশোরীমোহনপুরের রয়েল বেঙ্গল

আমি দম বন্ধ করে বললাম, 'তারপর?'

সায়নের ছোটোমামা একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'তারপরই হল আসল গোলমাল। বাঘ গেল উধাও হয়ে। ভ্যানিশ হয়ে গেলও বলতে পারো। গোটা গ্রাম তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। সবার মাথায় হাত। কোথায় গেল, বাঘ তো পাখি নয় যে উড়ে যাবে!'

সায়নের ছোটোমামাকে আমরাও ছোটোমামা ডাকি। মাঝে মধ্যে রবিবার করে উনি সায়নদের বাড়ি আসেন। খবর পেয়ে আমরাও চলে যাই। এখন গল্প বলার লোক একদম কমে গিয়েছে। এই মানুষটা দারুণ গল্প বলতে পারেন।

অঙ্কুর সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল। সোজা হয়ে বসল। চোখ বড়ো-বড়ো করে বলল, 'নিশ্চয়ই পালিয়ে গিয়েছে?'

ছোটোমামা মাথা নেড়ে বললেন, 'পালানো কঠিন। ধানখেতের খানিকটা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে রাস্তা। সেদিকে ফরেস্ট গার্ডরা বন্দুকে ঘুমপাড়ানি গুলি পুরে বসে আছে।'

কিংশুক বলল, 'ছোটোমামা, বাঘটা ভূত-টুত নয় তো?'

সায়ন ধমক দিয়ে বলল, 'তুই চুপ কর তো। বাঘ কখনো ভূত হয়?'

আমি মোড়ার উপর বসে মুড়ি খাচ্ছিলাম। আমরা পকোড়া খেতে চেয়েছিলাম। ছোটোমামা

বলেছেন, 'ওসব পকোড়া, স্যান্ডউইচ, পিৎজা আমার চলবে না বাপু। মুড়ি, আলুর চপ চাই। নইলে মাথায় গল্প আসবে না।'

'আমরা গল্প শুনতে চাই,' সবাই মুড়ি, আলুর চপের জন্য হাত তুললাম। সায়নের মা তেল-আচার দিয়ে মুড়ি মেখে দিয়েছেন। আমরা সায়নদের ড্রয়িংরুমে বসে মুড়ি, আলুর চপ আর বেগুনি খাচ্ছি। বললাম, 'ঝোপ-জঙ্গাল সব দেখা হয়েছিল তো?'

সায়ন দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'না, হয়নি। তোর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। তুই গেলে তারপর কাজ শুরু হবে।'

ছোটোমামা বললেন, 'আহা, রাগারাগি কেন? কিশোরীমোহনপুর গ্রামের সকলেরই তো চিন্তায় চুল খাড়া হয়ে গিয়েছে। দিন-দুপুরে একটা বাঘ গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেলটা কোথায়?'

রবিবারের সকাল। ছোটোমামা এসেছেন খবর পেয়ে আমি, অরণি, কিংশুক, অঙ্কুর, নন্দন চলে এসেছি সায়নদের বাড়ি। অরণি বলল, 'এবার পুজোয় আমরা বাঘ দেখতে যাচ্ছি।'

নন্দন মজা করে বলল, 'বাঘ দেখতে? চিড়িয়াখানায় যাবি নাকি?'

কিংশুক বলল, 'চিড়িয়াখানায় যাওয়ার কী দরকার? আমি তোকে বাঘের ক-টা ভালো ফোটো মেল করে দিচ্ছি, বাড়িতে সেগুলোই দেখে নিস।'

অরণি মুচকি হেসে বলল, 'আমি কিছুই মনে করব না। কারণ, আমি যাচ্ছি মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় টাইগার স্যাংচুয়ারি দেখতে। আশা করি, তোরা নাম শুনেছিস। যদি না শোনা থাকে, তাহলে আমার কাছ থেকে জেনে নে। বান্ধবগড় হল বাঘেদের রিজার্ভ ফরেস্ট। খুব বিখ্যাত। গোটা পৃথিবী থেকে টুরিস্টরা এখানে বাঘ দেখতে আসেন। জঙ্গালের ভিতর দারুণ-দারুণ সব বাংলো। রাতে বাঘের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে যায়। জানলার পরদা সরিয়ে দেখতে পাবি, গেটের বাইরে বাঘ ঘুরঘুর করছে। আবার দিনে বা রাতে জিপ নিয়ে জঙ্গালে ঘুরে-ঘুরেও বাঘ দেখা যায়।'

অরণির কথা শুনে আমাদেরই চোখ চকচক করে উঠল। কিংশুক বলল, 'ইস! সামনা-সামনি বাঘ দেখার মতো উত্তেজনা আর কীসে আছে?'

ছোটোমামা এতক্ষণ চুপ করে আমাদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, 'বেড়াতে যাচ্ছ যাও, কিন্তু ও বাঘ দেখার মধ্যে আর উত্তেজনা কোথায়? ও তো প্রায় চিড়িয়াখানার মতোই হল। সুন্দরবনের বাঘের মুখোমুখি যদি পড়তে, একটা ব্যাপার ছিল। বাঘ দেখা কাকে বলে বুঝতে!'

আমরা গল্পের গন্ধে নড়ে বসলাম। বললাম, 'বাঘ দেখেছেন ছোটোমামা?'

ছোটোমামা মুচকি হেসে বললেন, 'দেখেছি, তবে জিপ গাড়ির মাথায় চড়ে নয়। একেবারে তিন হাতের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ফটফটে দিনের আলোয়, তখন ক-টা বাজে? এই ধরো, সকাল ন-টা-সাড়ে ন-টা। কলকাতায় অফিস-টাইম যাকে বলে।'

সায়ন বলল, 'গল্পটা বলতে হবে।'

আমরাও একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলতেই হবে।'

ছোটোমামা বললেন, 'গল্প নয়, সত্যি ঘটনা।'

কিংশুক বলল, 'তা-ই বলুন।'

ছোটোমামা বলতে শুরু করলেন, 'তিন বছর আগের ঘটনা। আমি তখন কলকাতা থেকে বদলি হয়ে ক্যানিংয়ের কাছে একটা অফিসে বসি। অফিসের জানলা দিয়ে মাতলা নদী দেখা যায়। আমার খুব ইচ্ছে, একবার সুন্দরবন দেখে আসব। এখানে এসে সুন্দরবন দেখতে না যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। এই সুযোগ দুম করে এসেও গেল। আমাদের অফিসে পিয়োনের কাজ করে সহদেব, ভারি ভালো ছেলে। সে একদিন ঘরে এসে বলল, "স্যার, আমার গ্রামের বাড়িতে দুটো ডাল-ভাত খেতে হবে"।'

আমি বললাম, 'তোমার গ্রাম কোথায়?' সহদেব বলল, 'একেবারে সুন্দরবনের গায়ে, কিশোরীমোহনপুর।'

আমি বললাম, 'বাঃ, ভারি সুন্দর নাম তো!' সহদেব বলল, 'আমাদের গ্রামটাও সুন্দর স্যার। কাছেই নদী। নদীর নাম ঠাকুরান। নদী পেরোলেই জঙ্গল। আজমলমারি জঙ্গল। দুটো দিন যদি থাকেন, তাহলে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের দিকটা ঘুরিয়ে আনব। ভাগ্য যদি ভালো হয়, বাঘ দেখা হয়ে যেতে পারে।'

'তোমরা তো জানো, গ্রামের মানুষ কত আন্তরিক হয়! তাদের নেমন্তন্ন ফেরানো খুব মুশকিল। তা ছাড়া সুন্দরবন আর বাঘ দেখার সুযোগ কে ছাড়ে! এক শনিবার বিকেলে কিশোরীমোহনপুরে গিয়ে হাজির হলাম। সত্যি চমৎকার গ্রাম। সহদেবের বাড়িটাও চমৎকার। খিড়কির দরজা খুললেই একটা মন ভালো করে দেওয়া পুকুর। টলটলে জল। লাল সিমেন্টে বাঁধানো ঘাট। পুকুর শেষ হলে যত দূর চোখ যায়, ধানখেত চলেছে।' সহদেব বলল, 'ধানখেত শেষ হলেই ঠাকুরান নদী। নদীপথে কিছুটা গেলে জঙ্গল।'

'জার্নিতে খুব ক্লান্ত ছিলাম। খাওয়ার পর ঠিক হল, পরদিন দুপুরে সুন্দরবন যাত্রা। সহদেব লঞ্চের ব্যবস্থা করবে। দুপুরে খাওয়ার পর রওনা হব। রাত কাটাব নদীতে। পরদিনও নদী, খাঁড়ি ধরে যতটা পারি ঘুরে ফিরে আসব সন্ধ্যের আগে।'

ছোটোমামা চুপ করলেন। আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বললাম, 'সত্যিকারের বাঘের দেখা কি পেলেন?'

ছোটোমামা হেসে বললেন, 'পেলাম, তবে জঙ্গলে নয়। একেবারে গ্রামের ভিতরে।' একটু থেমে ছোটোমামা শুরু করলেন, 'পরদিন সকালে লুচি, আলুর দম দিয়ে জলখাবার খাওয়ার পর সহদেব বলল, "স্যার, আপনি গ্রামটা একটু ঘুরে দেখুন, আমি ততক্ষণে লঞ্চের ব্যবস্থা করে ফেলি। বারোটা নাগাদ রওনা দেব"।'

'আমি বেরিয়ে পড়লাম। আগেই তো বলেছি, গ্রামটা সুন্দর। আমি গোটা গ্রামটাই প্রায় চষে ফেললাম। তারপর ফেরার জন্য ধানখেতের পাশ দিয়ে চলে-যাওয়া মেঠো পথ ধরলাম। ধানখেত ধরে গেলে একেবারে শেষ প্রান্তে সহদেবের বাড়ি।' ছোটোমামা দম নেওয়ার জন্য চুপ করলেন।

সায়ন বলল, 'তারপর কী হল?'

ছোটোমামা এবার নীচু গলায় বলতে শুরু করলেন, 'তখনই পাশের ধানখেতের খানিকটা জায়গা নড়ে উঠল যেন! কীসে নড়ল, হাওয়ায়? নিশ্চয়ই তাই হবে। তারপর খানিকটা খসখসে আওয়াজ। আওয়াজটা ঠিক ধান গাছের হাওয়ায় দোলার মতো নয়। মনে হল, কে যেন নড়ছে। মুহূর্তের জন্য বিটকেল একটা গন্ধ পেলাম। গন্ধটা কেমন চেনা চেনা। আগেও কোথাও যেন পেয়েছি। নিমেষে মনে পড়ল, চিড়িয়াখানায়। সঙ্গেসঙ্গে বাঘটাকে দেখতে পেলাম। বাঘ নয়, বাঘের মুখ। সেই মুখ ধান গাছের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার! কী মারাত্মক! বুঝতে পারলাম, শরীরের সব রক্ত যেন আতঙ্কে জমে যাচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে নিতে পারছি না। মাত্র তিন হাত দূরে থাকা রয়েল বেঙ্গল আমাকে সম্মোহন করে ফেলেছে। মনে হল, হঠাৎ মানুষ দেখে বাঘটাও যেন ঘাবড়েছে। ঘোর কাটতেই বিপদ বুঝতে পারলাম। আমি পালাতে পারলাম না। ভাবতে না ভাবতেই চাপা গরগর আওয়াজ তুলে সুন্দরবনের মহারাজ মুখ ফিরিয়ে নিলেন, মিলিয়ে গেলেন ধানখেতে। এরপর আমি যে কীভাবে সহদেবের বাড়ি পৌঁছেছিলাম, সে শুধু আমিই জানি।'

ছোটোমামা থামলেন। আমরাও যেন আর কথা বলতে পারছি না। ফের গল্প শুরু হল।

'বাড়ি গিয়ে ঘটনাটা বলতেই সহদেব ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। সুন্দরবনের গ্রামে বাঘ ঢুকে পড়া নতুন কিছু নয়। এতে ভয়ংকর কাণ্ড হয়। গোরু, ছাগল তো মরেই, এমনকী মানুষও টেনে নিয়ে যায় জঙ্গলে।

আধঘণ্টারও কম সময়ে গোটা গ্রাম জেনে গেল। লাঠিসোঁটা, বল্লম, যে যা পারল হাতে নিয়ে ছুটে গেল ধানখেতের দিকে। আমার তখন ভয় করতে শুরু করেছে। ভুল দেখিনি তো? তাহলে খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে! না, ভুল দেখিনি। ধানখেতে বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। ধানখেত পার হয়ে আলপথ ডিঙিয়ে সেই পায়ের ছাপ উধাও। বলতে পারো ভ্যানিশ আর তারপর শুরু রহস্য।'

চা শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখলেন ছোটোমামা। বললেন, 'গ্রামের মধ্যে বাঘ ঢুকে লুকিয়ে পড়া যে কী ভয়ংকর ব্যাপার, তা কেবল সুন্দরবনের মানুষই জানেন। গ্রামের মানুষ ধানখেত ঘিরে ফেলল। খবর দেওয়া হল গোসাবার ফরেস্ট অফিসে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিরাট দলবল নিয়ে রেঞ্জার বিমল পাণ্ডে চলে এলেন। সেই দলে দেখি বন্দুকও আছে, আবার ঢাক, ঢোল, পটকা, কাঁসরঘণ্টা, জালও আছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসার নিলয় গুহও বন্দুক নিয়ে এসে হাজির হলেন কিছুক্ষণের মধ্যে। তিনি ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে বাঘ, ভল্লুক ঘুম পাড়াতে ওস্তাদ। অনেকে তাঁকে ঘুমপাড়ানি অফিসার নামে ডাকে। নিলয়বাবু আমাকে ধানখেতের পাশে নিয়ে গেলেন। আমি দেখিয়ে দিলাম ঠিক কোন জায়গায় বাঘটাকে আমি দেখেছি।' নিলয়বাবু বললেন, 'বাঘটা নিশ্চয়ই আজমলমারির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঠাকুরান নদী পার হয়ে এসেছে।'

'ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন জাল দিয়ে ধানখেতের খানিকটা ঘিরে ফেলল। একদিকে গাছের উপর বন্দুক নিয়ে বসলেন অফিসার আর রেঞ্জারবাবু। তারপর তেড়ে ঢাক-ঢোল, টিনের ক্যানেস্তারা পেটানো শুরু হল। বাপরে! কান ফেটে যাওয়ার জোগাড়। সেই সঙ্গে ফাটানো হচ্ছে পটকা। ধানখেত ঘিরে ফেলা জালটিকে ধীরে-ধীরে চারপাশ থেকে ছোটো করে আনা হচ্ছে। পরিকল্পনা হল, বাঘ খোলা দিক দিয়ে পালাবে। বেরিয়ে আসবে ধানখেত থেকে। আর তখনই গুলি ছোড়া হবে। কোথায় কী? জাল গুটিয়ে গেল, বাঘ ধানখেত থেকে বেরোলো না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা ঘোষণা করলেন, "বাঘবাবাজি ধানখেতে লুকিয়ে নেই। তিনি অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছেন"।'

অরণি বলল, 'কোথায় গা ঢাকা দিল?'

নন্দন বলল, 'অত বড়ো একটা চেহারা নিয়ে গা ঢাকা দেওয়া যায় নাকি?'

কিংশুক ঢোক গিলে বলল, 'অসম্ভব।'

ছোটোমামা বললেন, 'কিছুই অসম্ভব নয়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার প্রাণীটি অত্যধিক বুদ্ধিমান শুনেছিলাম। কিন্তু তার বুদ্ধির পরিমাণ যে এতখানি, তা জানতাম না। সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, বাঘ ধানখেতে নেই, গ্রামের মানুষের আতঙ্ক আরও দশ গুণ বেড়ে গেল। নিলয়বাবু এবার বললেন, "গ্রামের ভিতরে ঢুকে তল্লাশি করতে হবে"।'

'তাই শুরু হল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। সবার আগে বন্দুক হাতে নিলয়বাবু আর পাণ্ডে। পিছনে লাঠিসোঁটা, বল্লম নিয়ে একদল, তার পিছনে কয়েক-শো গ্রামের মানুষ। বাঘের টিকিও দেখা গেল না। এমনকী বাঘটা তার পায়ের ছাপটুকুও কোথাও রাখেনি। এদিকে বেলা পড়তে শুরু করেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হব-হব করছে। রেঞ্জারবাবু বললেন, "যে করেই হোক অন্ধকার নামার আগে খোঁজ চাই। যদি বাঘ গ্রাম ছেড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সেই প্রমাণটাও দরকার। নইলে ধরে নিতে হবে গ্রামেই গা ঢাকা দিয়ে আছে। রাতে গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি যা পাবে নিয়ে যাবে। মানুষ পেলেও ছাড়বে না"।'

ছোটোমামার কথার মাঝে অরণি কাঁপা গলায় বলল, 'বাঘ গ্রামে রয়ে গেল?'

ছোটোমামা হেসে বললেন, 'সেটাই তো এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। বাঘ কী রয়ে গেল? নাকি সবার অলক্ষ্যে অন্য কোনো পথে ফিরে গিয়েছে ঘন জঙ্গলে? নাকি এমন কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। নিলয়বাবু বললেন, "ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। গ্রামের সবাইকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে হবে। রাতে ঘর ছেড়ে কিছুতেই বেরোনো চলবে না। যদি খুব দরকার হয়, তবে দল বেঁধে বেরোতে হবে। সঙ্গে যেন মশাল বা জোরালো আলো থাকে"।'

'ঠিক হল, বাঘের জন্য ফাঁদ পাতা হবে। দুটো ছাগল বেঁধে রাখা হবে গ্রামের দু-দিকে। একদিকে ঘুমপাড়ানি গুলির বন্দুক নিয়ে পাহারায় বসবেন রেঞ্জার বিমল পাণ্ডে, অন্যদিকে নিলয়

গুহ। বাঘ যদি সত্যি গ্রামে থেকে যায়, তাহলে টোপ গিলতে আসবেই। তখনই গুলি করে...।' আমি বললাম, 'আর যদি না আসে?' নিলয়বাবু হেসে বললেন, 'আসবেই। আপনার বন্ধু সারাদিন কিছু খেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই তার খিদে পেয়েছে। আপনাকে দেখা দিয়ে যে বেমালুম উবে গেল, তাকে আপনার বন্ধু বলব না? মশাই, "টাইগার লাক" বলে একটা ব্যাপার আছে। বাঘ দেখার ভাগ্য। আপনি লঞ্চে চেপে বনে বাঘ দেখতে যাবেন ভেবেছিলেন, আর উনি নিজে এসে দেখা দিয়ে গেলেন।'

আমি বললাম, 'আপনাদের সঙ্গে রাত জাগতে পারি?' পাশেই বিমল পাণ্ডে ছিলেন। বললেন,

'ইমপসিবল। একটা কিছু হয়ে গেলে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা কাউকেই অ্যালাউ করব না।'

'আমি জেদ ধরলাম। আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে। যেহেতু বাঘটাকে কেবল আমিই দেখেছি, আমার থাকার অধিকার আছে।' নিলয়বাবু খানিকটা ভেবেচিন্তে বললেন, 'তৈরি হয়ে আসুন। গাছে মাচা বেঁধে থাকতে হবে কিন্তু!'

'আমি উত্তেজনায় ফুটছি। নিজেকে জিম করবেটের মতো মনে হচ্ছে। দেরি না করে ছুটলাম সহদেবের বাড়ি। অল্প কিছু খাব। সহদেবের পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে নেব। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে হবে। রাত জাগতে হবে না?'

ছোটোমামা থামলেন। আমরাও চুপ করে রইলাম, কথা বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে, নিজেরাই সেই কিশোরীমোহনপুর গ্রামে রয়েছি। উধাও হয়ে যাওয়া বাঘকে খুঁজছি।

সায়ন বলল, 'তুমি সারারাত জেগে বসে রইলে?'

ছোটোমামা বললেন, 'দরকার হল না।'

ছোটোমামা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'বাড়ি ফিরে সহদেবের কাছে একটা গামছা চাইলাম। বললাম, "ঝট করে অল্প কিছু খেতে দাও, আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি। যার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, তার শেষ পর্যন্ত কী হল, জানতে হবে না?" আমি খিড়কির দরজা খুলে পুকুরের দিকে চলে গেলাম। চাঁদের আলো এসে পড়েছে বাঁধানো ঘাটে। নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে, তখনই গরগর আওয়াজ।'

ছোটোমামা চুপ করে আমাদের সকলের দিকে তাকালেন। আমাদের চোখের পাতা কী পড়ছে? মনে হয় না।

ছোটোমামা ফিসফিস করে বললেন, 'পুকুরঘাটের আড়ালে সে বসেছিল চুপটি করে, গা ঢাকা দিয়ে। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার। যেন অপেক্ষা করেছিল আমারই জন্য। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর জলে লাফ দিল। আলতো আওয়াজ করে অত বড়ো শরীরটা নিয়ে নিঃশব্দে সাঁতরে পার হয়ে গেল চোখের নিমেষে। জল থেকে উঠে মিশে গেল ওপারের অন্ধকারে, ধানখেতের মধ্যে। বুঝতে পারলাম, বাতাস উলটো দিকে বইছে বলে বাঘের গায়ের গন্ধও কেউ পায়নি। অথবা বুদ্ধিমান মহারাজ বাতাসের উলটো দিকেই এসে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। সকালেই সহদেব আমাকে বলেছে, তার বাড়ির পিছনে ধানখেত পেরোলে জঙ্গলে যাওয়ার নদী। গভীর রাতে বাঘ নিশ্চয়ই লম্বা সাঁতার দিয়ে নিজের আস্তানায় পৌঁছে যাবে। আমি পুকুরে ক-টা ডুব দিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম।'

সায়নদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সেই না-দেখা বাঘটার জন্য আমাদের মন কেমন করছে!

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

তিনি যখন বাইরে

শীতকালে এ গ্রামের সন্ধ্যে। রাতের তফাত করা যায় না। খানিক আগেই হলুদ আলোর বিকেল ছিল। এখন ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। আজও বিদ্যুৎ পৌঁছোয়নি এখানে। অনেকক্ষণ হল হরিডাক্তারের চালাঘরের চেম্বারে পেশেন্ট নেই। ডাক্তারবাবু ভাবছেন, এবার তাহলে ঝাঁপ ফেললেই হয়। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগাছা করবেন, রেডিয়ো শুনতে-শুনতে চা-টা খাওয়া হবে।

ডাক্তারবাবু না থাকলে স্ত্রী বাড়িতে একা। সরকারি হাসপাতাল থেকে রিটায়ার করার পর হরিডাক্তার চলে এসেছেন গণ্ডগ্রাম এই বাদাখালিতে। বড়ো শান্ত, নিস্তরঙ্গ এখানকার জীবনযাত্রা। প্রায় পনেরো বছর থাকা হয়ে গেল এই গ্রামে। মানুষের সেবার কথা ভেবেই আসা। ছেলেমেয়েরা সব কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত।

বাদাখালির সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বিকেল চারটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর হরিডাক্তারই ভরসা। লোকাল রুগি তো আছেই। বাদাখালি ঘিরে সুন্দরবনের অসংখ্য দ্বীপ। ভুটভুটি নৌকোয় নদী পেরিয়ে হামেশাই সিরিয়াস পেশেন্ট নিয়ে আসে গ্রামের লোক। ম্যালেরিয়া, ভেদবমি, সাপে-কাটা, বাঘে থাবা-মারা, আরও কত কী! সবে সাতটা বাজে। এখনই কী চেম্বার ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে? ভাবতে ভাবতে লণ্ঠনের আলোয় মেডিসিনের বই পড়ছিলেন ডাক্তারবাবু। এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দুটি ছায়ামূর্তি। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোতেই ডাক্তারবাবু আন্দাজ করতে পারলেন, এরা এলাকার লোক নয়, দূরের কোনো দ্বীপ থেকে এসেছে। একেবারে হতদরিদ্র গেঁয়ো চেহারা। ডাক্তারবাবু ডাকলেন, 'এসো, ভিতরে এসো। কী হয়েছে?'

একজনের বয়স পঁয়তাল্লিশের কম বেশি। অন্যজন কুড়ি-বাইশ হবে। বাবা আর ছেলে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। চেহারায় বেজায় মিল। ছেলেটি কেমন যেন ভ্যাবলা মেরে আছে। বাবা তার কনুই ধরে এনে বসালো চেয়ারে। নিজে বসল পাশেরটায়। টেবিলের ওপারে হরিডাক্তার এখন তাদের মুখোমুখি। ছেলেটিকে দেখিয়ে লোকটি বলল, 'এর জন্যই আসা। আমার ছেলে, একটিই সন্তান। পাঁচদিন হয়ে গেল মুখে কোনো কথা নেই। ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে আছে। খাইয়ে দিলে অল্প একটু খাচ্ছে। একফোঁটা ঘুমোচ্ছে না।'

কপালে ভাঁজ পড়ল হরিডাক্তারের। তাঁর সুদীর্ঘ ডাক্তারি জীবনে এ ধরনের রুগি প্রথম দেখছেন। ছেলেটি শুধু বড়ো বড়ো চোখ করে চেয়ে আছে, তা নয়। চোখের পাতা পড়ছে অনেক দেরি করে। কোনো নির্দিষ্ট কিছু দেখছে না সে। শূন্যে ভাসছে দৃষ্টি। মুখটা আবার একটু হাঁ করে রেখেছে।

'বিশেষ কোনো ঘটনার পর কী এরকম হয়ে গেল?' জানতে চাইলেন হরিডাক্তার। আসলে বুঝতে চাইছেন ছেলেটা কোনো শক পেয়েছে কি না? গভীর দুঃখ বা ভয়ের কিছু দেখেছে কি না?

লোকটি বলে, 'না, ডাক্তারবাবু, এমনি হঠাৎ। উঠোনে বসে দা দিয়ে কাঠ সাইজ করছিল, ওর মা খেতে ডেকেছে, ছেলে এই চেহারায় উপস্থিত।'

'তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমি নদীর ধারে নৌকো থেকে জল ছেঁচছিলাম। বউ দৌড়ে এসে জানালো ছেলের অবস্থা। আমার প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। বাড়ি এসে দেখি, আজব ব্যাপার! বউ ঠিক কথাই বলেছে।'

লোকটা থামতে হরিডাক্তার জানতে চাইলেন, 'তারপর কী করলে?'

'কী আর করব! গ্রামের মুরুব্বিদের ডাকলাম। কেউ বলল, ভূতে ধরেছে। অনেকে বলছে, বাণ মেরেছে আমার কোনো শত্রু। ছেলেটাকে হাবা বানিয়ে দিয়েছে। অনেক ওঝা-বদ্যি করলাম। জলপড়া খাওয়ানো, ঠাকুরথানে নিয়ে যাওয়া, সবই হল। কোনো উন্নতি নেই।'

হরিডাক্তার খাঁটি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। ভূত, ওঝা এসবে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। হাবা হয়ে যাওয়া ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন রোগের প্রকৃত কারণ। ছেলেটার চোখে-মুখে এখনও পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হয়নি। অভিব্যক্তি একই রয়ে গিয়েছে। বাকি দু-জনের আলাপ-আলোচনা মাথায় ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে ওর বাবা বলছে, মা খেতে ডাকছে শুনে ছেলেটি কাজ ছেড়ে উঠে গিয়েছিল। কান তার মানে ঠিক আছে। হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে এল হরিডাক্তারের। লোকটির কাছে জানতে চান, 'তোমার ছেলে বাঘটাঘ দেখেনি তো? তারপর থেকে হয়তো ভয় খেয়ে আছে।'

'না-না, বাঘ দেখবে কী করে! আমাদের ন্যাজাট গ্রামে বড়োমামা কোথা থেকে আসবে? কত লোকের বসবাস!'

সুন্দরবনের লোক বাঘকে 'বড়োমামা' ডাকে, কেউ বা বলে 'বড়ে মিঁঞা'। হরিডাক্তার বললেন, 'অশক্ত, বুড়োবাঘ তো মাঝে মধ্যে চলে আসে গ্রামে। দৌড়ে গিয়ে শিকার ধরার ক্ষমতা যে বাঘের নেই, মানুষ হচ্ছে তাদের কাছে সহজ শিকার।'

একটু ভেবে নিয়ে লোকটি বলে, 'তা অবিশ্যি ঠিক। তবে বড়োমামা শুধু আমার ছেলেকে ভয় দেখিয়ে পালাবে? গ্রামের আর কোনো ক্ষতি করবে না? গ্রামে বাঘ পড়া মানে তো হুলস্থূল কাণ্ড!'

পয়েন্টটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হরিডাক্তার ছেলেটিকে বললেন, 'হাতটা একটু দেখি।'

ছেলেটির মুখে কোনো ভাবান্তর হল না। হাতটা কিন্তু বাড়িয়ে দিল। পাল্‌স ধরলেন ডাক্তারবাবু। সামান্য দ্রুত চলছে। ছেলেটির চোখের পাতা টেনে দেখলেন। জিভ ঢুকিয়ে নেওয়ার পর আগের মতোই সামান্য হাঁ হয়ে রইল মুখ। ডাক্তারবাবু চোয়াল ধরে নাড়ালেন, হয়তো কিছু আটকে আছে। আলতোর ভান করে বেশ জোরেই চাঁটি মারলেন গালে। ছেলেটির বাবা বোধহয় বুঝে ফেলল। বলল, 'আমরাও অনেক মারধর করেছি ডাক্তারবাবু। কোনো ফল হয়নি।'

হরিডাক্তার বিব্রত বোধ করলেন। ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে। একটা প্যাড টেনে কিছু লিখতে লিখতে বললেন, 'মনে হচ্ছে, মেন্টাল প্রবলেম। মনের রোগের চিকিৎসা আমার সাধ্যের মধ্যে নয়। কলকাতায় ভবানীপুরে আমার ভাইপোর চেম্বার। ও মনের ডাক্তার। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। ছেলেকে নিয়ে গিয়ে দেখাও। ছেলের আর তোমার নাম বলো।'

'আমি মাধব বেরা। ছেলে লাল্টু', বলার পরে লোকটি হাতজোড় করে কাঁচুমাচু হয়ে বলে, 'কলকাতার ডাক্তার মানে তো মেলা টাকার ব্যাপার। আমি দিন আনি দিন খাই। জোয়ান ছেলেটা তবু কাজে হাত লাগাত, সে এখন হাবা হয়ে বসে রইল। ওর মা কেঁদেকেটে একশা করছে। যা করার হয়, আপনিই করুন। আপনি আমাদের ভগবান।'

চিঠির শেষটুকু লিখে হরিডাক্তার বললেন, 'সায়ন, মানে আমার ভাইপো টাকা নেবে না। চিঠিতে লিখে দিয়েছি আমি। শুধু একটু সকাল-সকাল যেয়ো। ওর বিরাট পসার।'

আশ্বাসে কোনো লাভ হল না। মাধব বেরা বলল, 'দু-জনের কলকাতা যাওয়ার টাকা কোথায় পাব, বলুন। আমাদের অবস্থা আপনার চেয়ে আর কে ভালো জানে!'

এ ক্ষেত্রে হরিডাক্তার যা করে থাকেন, তাই করলেন। পকেট থেকে এক-শো টাকার নোট বের করে চিঠিসমেত বাড়িয়ে ধরলেন মাধব বেরার দিকে। বললেন, 'সায়নকে দেখিয়ে আমাকে একবার রিপোর্ট কোরো।'

করুণ মুখ করে ঘাড় হেলিয়ে মাধব বেরা জিনিস দুটো জামার পকেটে ঢোকাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে নমস্কার করল ডাক্তারবাবুকে। ছেলেটিও করল। মুখের ভাব সেই একইরকম।

ওদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে হরিডাক্তার ভাবেন, 'আশ্চর্য রোগ! এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁকে জানতেই হবে। আলোচনা করতে হবে ভাইপো সায়নের সঙ্গে। আচমকা একটা কথা মাথায় এল, ছেলেটা অভিনয় করছে না তো? হয়তো সাংঘাতিক কোনো অপরাধ করেছে কিংবা দেখেছে ঘটতে। তারপরই বোবা সেজে বসে গিয়েছে, যাতে কেউ ওর মুখ থেকে কথা বের করতে না পারে।'

অভিনয়টা করেছে মাধব বেরা। ডাক্তারবাবু চেম্বার থেকে বেরিয়ে পা চালিয়েছে ঘাটের দিকে। হাবা হয়ে যাওয়া ছেলেকে বলেছে, 'তাড়াতাড়ি পা চালা লাল্টু। নিরাপদ না আবার নৌকো ছেড়ে দেয়। অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে এনেছি।'

কাছাকাছি অমাবস্যা। আকাশে ফালি চাঁদ। চারপাশ নিকষ কালো। মাধব বেরার হাতে চার ব্যাটারির জ্বলন্ত টর্চ। মাটির রাস্তা ধরে নদীর দিকে যেতে যেতে নিজের ভাগ্যদেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে মাধব। হরিডাক্তার তো যে-সে ডাক্তার নন, রোগটা প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন। অথচ গ্রামের ছ-জন ছাড়া সকলের চোখেই ধুলো দিয়ে রেখেছে মাধব। আসল ঘটনা লোক জানাজানি হলে মাধবদের কপালে জেল একেবারে বাঁধা। পাঁচ দিন আগে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে মাধবরা। নদীতে মাছ ধরা মাধবদের পেশা। শীতকালে মাছেদের আনাগোনা কম। জালে মাছ প্রায় ওঠেই না। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছিল মাধবদের। বাড়িতে হাঁড়ি না চড়ার হাল। মাধবরা পাঁচ বন্ধু মিলে ঠিক করে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবে আর মধু আনতে। অবশ্যই আইনের চোখে ধুলো দিয়ে। সুন্দরবনের কিছু দ্বীপ সরকার বাঘেদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সেখানে মানুষের যাওয়া মানা। কিছু দ্বীপে মানুষ যেতে পারে মধু সংগ্রহ করতে, তবে কাঠ কখনোই কাটা চলবে না। সেই সব জঙ্গলে বাঘ নেই। যেতে হয় সরকারের ঘরে টাকা দিয়ে পারমিট করিয়ে। সে দ্বীপে বাঘ তেমন নেই, মধুও তেমন পাওয়া যায় না। টাকা ওঠে না পারমিটের। মাধবদের দল ঠিক করে, লুকিয়ে বাঘেদের জন্য সংরক্ষিত দ্বীপে গিয়ে কাঠ, মধু চুরি করে আনবে। কিছুদিন হল মাধবদের দলে তার ছেলে লাল্টুও যোগ দিয়েছে। বাবা, কাকাদের সঙ্গে মাছ ধরে। মাধব ঠিক করে, ছেলেকে জঙ্গলে নিয়ে যাবে না। সেখানে পদে-পদে বিপদ। বাঘ, সাপ, অন্যান্য জীবজন্তু, তা ছাড়া জলপুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয় তো আছেই। মাধবরা অভাবে পড়ে বেশ কয়েকবার গিয়েছে কাঠ, মধু চুরি করতে। দলের দু-জন খাদ্য হয়েছে বাঘের। বাবার নিষেধ ছেলে শুনল না। যাবেই যাবে জঙ্গলে। বিপদের যে আলাদা একটা আকর্ষণ থাকে। লাল্টু হুমকি দিল, 'তুমি যদি আমাকে না নিয়ে যাও, মাকে বলে দেব।'

মাধবদের দলের কেউই নিজের বউকে বলে বাঘের জঙ্গলে যায় না। বললে তারা যেতে দেবে কেন? সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে কে আর নিজের প্রিয়জনকে ছাড়তে চায়! অগত্যা লাল্টুকে সঙ্গে নিতে হল। শুভদিন দেখে সাতজনের দল নৌকো করে জলপুলিশের টহলদারি এড়িয়ে পৌঁছেছিল এগারো নম্বর ব্লকে। তখন দুপুর। ওই দ্বীপে তারা আগেও গিয়েছে, বাঘের কবলে পড়তে হয়নি। বাঘ তো আর জঙ্গলে থিকথিক করে না। থাকে অনেক গভীরে। এমনিতেই পৃথিবীতে বাঘ কমে আসছে।

শিবাই গুনিন নৌকো থেকে নেমে মন্ত্র পড়ে জঙ্গল বেঁধে দিল। এতে নাকি বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়। দলের সকলেই জানে, এটা অন্ধ বিশ্বাস। মন্ত্র পড়ার পরও বাঘের পেটে যায় মানুষ। তবু মনে একটা সান্ত্বনা থাকে, সাহস বাড়ে।

সাতজনের দল থকথকে কাদা মাড়িয়ে ঢুকে গিয়েছিল জঙ্গলে। তাদের হাতে মোটাসোটা লাঠি, মাথার পিছনে মানুষের মুখওলা মুখোশ। বাঘকে ঠকানোর কায়দা আর কী! এতেও কাজ হয় না। সুন্দরবনের বাঘ ভীষণ চালাক, ঘাপটি মেরে অনুসরণ করে মানুষের দলকে। এগিয়ে

যাওয়া লক্ষ করে মানুষের সামনে পিছন বুঝে নেয়। দলের একজনকে নিশানা করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ে। নিমেষে টেনে নিয়ে জঙ্গালের গভীরে চলে যায়। যে মানুষটাকে বাছে, সে দলের সামনের অথবা পিছনের নাও হতে পারে। মাঝখান থেকে একজনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাই বেশি। বাঘ কী দোষ বা গুণ দেখে মানুষ বাছে, তা মাধবদের জানা নেই।

দশ মিনিটের ওপর জঙ্গাল ধরে এগিয়ে গিয়েছিল দলটা। কোথাও কোনো বিপদের গন্ধ পাওয়া যায়নি। গাছের ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে যাচ্ছে বাঁদর। হেঁতালের ঝোপ থেকে উঠে আসছে ছোটো কোনো জন্তুর চলে যাওয়ার সরসর আওয়াজ। ভরদুপুরে বিস্তর মশা। একদম সামনে হাঁটছে বলাইদা। জঙ্গাল সে সবচেয়ে ভালো চেনে। তারপরই মাধব, দু-জনের পরে লাল্টু। সবশেষে শিবাই গুনিন। তার চোখ চতুর্দিকে।

হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে হুড়মুড়ে শব্দ, মুহূর্তের মধ্যে মাধব শুনতে পায় লাল্টুর গলা, 'ও বাবা গো, মা রে...'

মাধব ধরেই নিয়েছিল, যা সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গিয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল, এক আশ্চর্য কাণ্ড, শিবাই গুনিন লাঠির ঘায়ে বাঘটাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। বড়ে মিঁঞার নিশানা ছিল লাল্টুর ওপর। মাটিতে পড়ে বাঘটা দাঁত খিঁচিয়ে ফের লাফ দিয়েছিল শিবাইয়ের দিকে, এতক্ষণে যে যার লাঠি বাগিয়ে ধরে তুমুল চিৎকার করতে-করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের ওপর। বেসামাল হয়ে হলুদ ডোরাকাটা বিদ্যুতের মতো জঙ্গালের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছিল।

লাল্টু তখন মাটিতে বসে জ্বোরো রুগির মতো কাঁপছে, চোখ বড়ো-বড়ো, মুখে চাপা গোঁ-গোঁ আওয়াজ। হাঁটার শক্তি ছিল না লাল্টুর। পাঁজাকোলা করে তোলা হয়েছিল নৌকোয়। তারপর দলটা নিজেদের গ্রামে ফেরার নদীপথ ধরে। নৌকোয় আসতে আসতে সকলেই প্রায় ঘটনার আতঙ্ক কাটিয়ে স্বাভাবিক হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছিল। একমাত্র লাল্টু ছিল ব্যতিক্রম। চোখ বড়ো-বড়ো করে, গুম মেরে আছে। মাধব ভেবেছিল, প্রথম অভিজ্ঞতা তো, ভয় ভাব থেকে বেরোতে একটু সময় লাগবে। নৌকোয় বসেই সকলে ঠিক করে নিল, আজকের ঘটনার কথা কাউকে জানানো হবে না। গ্রামের কেউ যদি খবরটা পুলিশের কানে তুলে দেয়, শাস্তি অনিবার্য।

সমস্যা হল লাল্টুকে নিয়ে, হতভম্ব ভাবটা কাটছে না। ছেলেকে ওই অবস্থায় বাড়ি নিয়ে ঢুকতেই, ওর মা প্রথমে একটু থতমত খেয়ে মড়াকান্না জুড়ল, 'এ তুমি ছেলেকে কী করে নিয়ে এলে! সুস্থ, সবল ছেলের এই হাল কেন হল?'

মাধব বউকে মিথ্যে করে বলল, 'পারমিট নিয়ে তিন নম্বর ব্লকে মধু ভাঙতে গিয়েছিলাম। ওই দ্বীপে কোনো বিপদ-আপদ নই। ছেলে দিব্যি এদিক-ওদিক ঘুরছিল, হঠাৎ দেখি এরকম হয়ে গিয়েছে।'

বউ ধরে নিল লাল্টুকে ভূত বা অপদেবতায় ধরেছে। ডাকা হল ওঝা, শুরু হল ঝাড়ফুঁক। দলের সাতজন আসল ঘটনা জানে। যার মধ্যে লাল্টুও আছে। ওর মুখে কথা ফিরিয়ে আনাটাই

মাধবের প্রধান কাজ। কথা ফুটলেও ঘটনাটা লাল্টু কাউকে বলবে না। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কথা। নৌকোয় বসে বাবা-কাকাদের আলোচনা থেকে জেনে নিয়েছে, ঘটনাটা চেপে যেতে হবে।

হরিডাক্তারকে ভরসা করে ঘটনাটা বলতে পারেনি মাধব, যদি কোনোভাবে ফাঁস হয়ে যায়, কলকাতার ডাক্তারকেও বলবে না। সে আবার হরিডাক্তারের ভাইপো। কথাটা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছোতে সময় লাগবে না। ডাক্তার যখন নামী, সব কিছু না শুনেও সারিয়ে দিতে পারবেন রোগ।

যাক, এই সুযোগে কলকাতাটা আর-একবার দেখা হয়ে যাবে মাধবের। সেই কোন ছেলেবেলায় গিয়েছিল। লাল্টু তো কলকাতা দেখেইনি। কত দোকানপাট, গাড়িঘোড়া, হইচই!

ছেলেকে নিয়ে ঘাটের কাছাকাছি চলে এসেছে মাধব, নিরাপদ এখনও আছে। নৌকোর গলুইয়ে জ্বলছে টেমির আলো।

একসপ্তাহ কেটে গেল। বাদাখালিতে আজ হাটবার। এই দিনটাতেই বাদাখালি একটু মুখর হয়ে ওঠে। অন্য দিনগুলো একেবারে ঠান্ডা। মানুষজন কথা বলে আস্তে। বাতাসের শব্দ শোনা যায়। হরিডাক্তার সকালবেলা ঝোলা হাতে হাটে এসেছেন জিনিস কিনতে। এদিক-ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে চোখ থামল দু-জনকে দেখে, মাধব বেরা ও তার ছেলে। মাটিতে বসে মাছ বেচছে তারা। ছেলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রীতিমতো চেঁচিয়ে, হেঁকে খদ্দের ডাকছে। ডাক্তারবাবু ভাবেন, ব্যাপার কী হল! ছেলেটার রোগ নিয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। অনেক ভেবেছেন, পড়াশোনা করেছেন। মাধব বেরা রিপোর্ট দিচ্ছে না দেখে নিজেই ফোন করেছিলেন ভাইপোকে। সায়ন কাগজপত্র খুঁজে জানাল, গত তিনদিন আগে মাধব বেরার নাম লেখা আছে লিস্টে। নাম লেখানোর পর পেশেন্ট আর আসেনি।

ব্যাপারটা ভারি আশ্চর্য ঠেকেছিল হরিডাক্তারের কাছে। এখন আরও অবাক লাগছে ছেলেটাকে সুস্থ দেখে। বৃত্তান্তটা কী, জানতে হবে। হরিডাক্তার এগিয়ে যান ওদের দিকে।

হরিডাক্তারকে দেখে গদগদ হয়ে ওঠে মাধবের মুখ। বলে, 'মাফ করে দিন ডাক্তারবাবু। আজই আপনার কাছে যেতাম। ক-দিন একদম সময় পাইনি।'

ভাইপোর সঙ্গে কথা হওয়াটা চেপে গিয়ে হরিডাক্তার জানতে চাইলেন, 'ছেলে তো ভালো হয়ে গিয়েছে, দেখছি। সায়নের ওষুধেই হল?'

মাধব কিন্তু কোনো ছলনার আশ্রয় নিল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কলকাতার ডাক্তারবাবুর কাছে নাম লিখিয়েছিলাম, দেখাতে হয়নি। তার আগেই সেরে গেল ওর অসুখ।'

'কীভাবে?' বিস্ময়ের গলায় জানতে চান হরিডাক্তার।

মাধব বলে, 'আমার নাম লেখা হল আটচল্লিশ নম্বরে। যে দিদিমণি লিখলেন, বললেন, "ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে আসুন। তার আগে ডাক আসবে না।" দিদিমণিকেই জিজ্ঞেস করলুম, "কোথায় যাওয়া যায় বলুন দিকিনি।" উনি বললেন, "কাছেই চিড়িয়াখানা। চলে যান"।'

'বুদ্ধি মন্দ দেননি। কখনো চিড়িয়াখানায় যাইনি আমি। লাল্টুরও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে পৌঁছে গেলাম। চিড়িয়াখানায় গিয়েই লাল্টু সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেল। তারপর আর ডাক্তারবাবুর কাছে যাইনি।'

হরিডাক্তার যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'সে কী কথা! এ আবার হয় না কি?' একটু থেমে কপাল কুঁচকে বললেন, 'ব্যাপারটা একটু ভেবে বলো দেখি।'

'বলার মতো কিছু নয়। দুজনে মিলে ঘুরছি। যেসব পশুপাখি আমরা গ্রামে খোলা জায়গায় দেখি, খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে এরা। লোকে হামলে পড়ে দেখছে। হাসি পাচ্ছিল খুব।'

থামল মাধব। হরিডাক্তার চোখ কুঁচকে রেখেছেন। বললেন, 'বলে যাও।'

মাধব ফের শুরু করে, 'ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখে লাল্টু পাশে নেই। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, নতুন জায়গা, হাবা ছেলে, লোকের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি পৌঁছোতে পারবে না। ছুটোছুটি করে খুঁজতে গিয়ে দেখি, লাল্টু বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে খুব হাত-পা নাড়ছে। আমি তো অবাক! ছেলের আমার এ কী বদল! সাত-আট দিন থম মেরেছিল যে ছেলে, এখন একেবারে চনমন করছে। কাছে গিয়ে শুনি, লাল্টু কথাও বলছে। যদিও খুব খারাপ কথা। বাঘটাকে তেড়ে গালিগালাজ করছে, ভেংচি কাটছে, মারবে বলে শাসাচ্ছে। বাঘটা অবশ্য ওকে পাত্তাই দিচ্ছিল না, নিজের মতো পায়চারি করে যাচ্ছিল। লাল্টুকে টেনে নিয়ে এলাম। লাফালাফি বন্ধ হল ওর। তাই নাম লিখিয়েও কলকাতার ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম না। এখন একেবারে সুস্থ আছে ছেলে। ওই দেখুন না।'

হরিডাক্তার লাল্টুর দিকে তাকালেন। সে লজ্জা-পাওয়া হাসি হাসল। চুপ করে একটু ভেবে নিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'বুঝেছি।'

ঘুরে গিয়ে হাঁটা দিলেন। মাধবের ছেলে দৌড়ে এসে একটা আড়মাছ ঢুকিয়ে দিল ডাক্তারবাবুর ঝোলায়। বলল, 'খুব টাটকা, আজ সকালেই ধরেছি। নিয়ে যান।'

হরিডাক্তার দাম দিতে গেলেন। লাল্টু কিছুতেই নিল না। ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

হাটের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে নিজের মনে হাসছেন হরিডাক্তার। মাধবের ছেলের রোগটার সমস্ত রহস্য এখন তাঁর কাছে পরিষ্কার। তিনি প্রথমেই ঠিক ধরেছিলেন, ছেলেটা ভয়ংকর কিছু দেখে ভয় পেয়েছে। সুন্দরবন বলেই বাঘের কথা বলেছিলেন। মাধব তখন স্বীকার করেনি। সম্ভবত নিষিদ্ধ জঙ্গলে গিয়ে বাঘের মুখোমুখি হয়েছিল ছেলেটা। পুলিশের ভয়ে মাধব কথাটা চেপে গিয়েছিল। চিড়িয়াখানায় বাঘকে খাঁচার মধ্যে দেখে সাহস ফিরে পায় ছেলেটা। মনের সুখে মেজাজ দেখায়। চিড়িয়াখানায় বাঘগুলো খাঁচাবন্দি থাকে বলেই কলকাতার লোকদেরও এত হম্বিতম্বি। দু-চারটে বাঘ ছেড়ে দিলে, কলকাতাও এই এলাকার মতো শান্ত, নিরীহ হয়ে যাবে।

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঠাকুরদার বন্দুক

অফিসের ঠিকানায় গোটা-গোটা অক্ষরে আমার নাম লেখা নীল ইনল্যান্ড লেটারটা পেয়ে অবাকই হয়েছিলাম। আরও অবাক হয়েছিলাম, প্রেরকের নামটা দেখে। আলিপুরদুয়ারের রায়ডাক থেকে চিঠিটা পাঠিয়েছেন অমিয়ভূষণ মল্লিক। অমিয়ভূষণ নামটার সঙ্গে আমি পরিচিত এবং এই নামটা আমাদের বাড়িতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় না।

এক সময় আমার ঠাকুরদা শিবনাথ লাহিড়ী আলিপুরদুয়ারে থাকতেন। সেখানে ঠাকুরদার কাঠচেরাই কলের একটা ছোটো ব্যাবসা ছিল। কিন্তু ওঁর আসল নেশা ছিল শিকার। আমার জন্মের আগেই ঠাকুরদা মারা গিয়েছিলেন। বাড়িতে যেটুকু শুনেছি, অমিয়ভূষণ ছিলেন শিকারে ঠাকুরদার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। শেষ শিকারে তিনি ঠাকুরদাকে এমন ঠকিয়েছিলেন যে, ঠাকুরদা চিরদিনের মতো শিকার ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। আসার আগে নিজের হাতে নষ্ট করে দিয়ে এসেছিলেন শিকার সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিসপত্র। তাই মরা বাঘকে পায়ের নীচে রেখে বন্দুক হাতে সদর্পে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, এরকম একটা ছবিও আমাদের কলকাতার বাড়িতে নেই।

একটা কৌতূহল নিয়ে অমিয়ভূষণবাবুর চিঠিটা খুলে ফেললাম। উনি লিখেছেন, 'বহু চেষ্টায় তোমার অফিসের ঠিকানা জোগাড় করে তোমাকে এই চিঠি দিচ্ছি। কারণ, তোমার বাড়ির ঠিকানায় চিঠিটা পাঠালে এই চিঠি তোমার হাতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোবে কি না, আমি নিশ্চিত নই। তুমি হয়তো আমার নাম এবং বদনাম দুই-ই শুনে থাকবে। নিশ্চয়ই জানো, যুবক বয়সে শিবনাথ

আর আমি দু-জনেই শিকারি ছিলাম। স্পষ্ট ভাষায় বলা ভালো, শিকার নিয়ে আমাদের দু-জনের মধ্যে একটা চাপা প্রতিযোগিতাই ছিল।

'ভারত যে বছর স্বাধীন হল, সেই সময়ের আশপাশে এক নরখাদক চিতাবাঘিনি আলিপুরদুয়ার দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি আর তোমার ঠাকুরদা নিরন্তর চেষ্টা করেছিলাম বাঘিনিটিকে মারার জন্য। এক রাত্রে বাঘিনিটি অবশ্য মারা পড়েছিল। সেদিন তোমার ঠাকুরদা এবং আমি দু-জনেই জঙ্গালে ছিলাম। সেই ছিল তোমার ঠাকুরদার শেষ শিকারযাত্রা। কার গুলিতে বাঘিনিটি মারা গিয়েছিল, সেই নিয়ে তোমাদের পরিবারে হয়তো ভিন্ন মত আছে। তবে মৃত বাঘিনির মাথায় বেঁধা গুলিটা বের করে যখন দেখা গিয়েছিল সেটা আমার বন্দুক-নিঃসৃত ছিল, নিঃসন্দেহ স্বীকৃতি এবং সরকারি পুরস্কার আমার ভাগ্যেই জুটেছিল।

বাঘিনি শিকারের সেই জঙ্গাল দিনে দিনে ক্রমশ পাতলা হয়েছে। অনেক জায়গায় বসতি, গ্রাম গড়ে উঠেছে। এরকমই এক গ্রামের কিছু কাঠুরে সম্প্রতি এক জায়গায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে কিছু বাঘের হাড়গোড়ের সঙ্গে তোমার ঠাকুরদার বন্দুকটি খুঁজে পেয়েছে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বন্যপ্রাণীর হাত থেকে বহুকাল রক্ষা করায় আমার যে অবদানটুকু আছে, তাতে এলাকার গ্রামবাসীদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা আছে আমার উপর। বন্দুকটি থানায় না জমা দিয়ে ওরা আমার কাছে দিয়ে গিয়েছে।

'বন্দুকটা আমার হাতে আসা পর্যন্ত আমি প্রচণ্ড অস্বস্তিতে আছি। জীবনের উপান্তে এসে অদ্ভুত এক মনস্তাপ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তোমার ঠাকুরদার শিকার ছেড়ে দেওয়ার রহস্য তার কোনো উত্তরপুরুষকে বলে না গেলে আমি মৃত্যুর পরেও শান্তি পাব না। ফোনে তোমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। উনি আমার নাম শুনে ফোন রেখে দিয়েছিলেন। তাই তোমাকে এই চিঠিটা লিখছি, যাতে তুমি সময় নিয়ে, ধৈর্য ধরে এই চিঠিটা পড়তে পারো এবং তারপর যদি তুমি আলিপুরদুয়ারে একবার আসতে পারো, তাহলে তোমাকে ঘটনাটা বিস্তারিত বলতে পারি। আর তোমার ঠাকুরদার বন্দুকটা যাতে স্মারক হিসেবে তোমাদের পরিবারে ফেরত যায়, তাও যথাযথ হস্তান্তর করতে পারি...'।

এক নিশ্বাসে আমি চিঠিটা পড়ে ফেললাম এবং সত্যিই ঠাকুরদার শিকারি জীবনের ইতির রহস্যটা জানবার জন্য অদম্য একটা আগ্রহ তৈরি হল। বাড়িতে আমি যা এতকাল শুনেছি, তার সঙ্গে অমিয়ভূষণবাবুর চিঠিটার বক্তব্যে অনেক মিল আছে। আমি শুনেছি, এক রাত্রে ঠাকুরদা এবং অমিয়ভূষণবাবু বাঘিনি শিকারের উদ্দেশে জঙ্গালে গিয়েছিলেন। সেই রাতে গুলিতে বাঘিনিটি মারা পড়েছিল। তবে পরের দিন সকালে অমিয়ভূষণবাবুকে যখন মৃত বাঘিনির কাছে পাওয়া গিয়েছিল এবং ঠাকুরদা জঙ্গাল থেকে রক্তমাখা জামা পরে বন্দুক ছাড়াই বেরিয়ে এসেছিলেন, সকলের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, ঠাকুরদা বাঘিনির আক্রমণে জখম হয়ে বন্দুকটা খুইয়েছেন এবং অমিয়ভূষণ মল্লিক শুধু বাঘিনিটিকেই মারেননি, ঠাকুরদাকেও প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। জঙ্গাল

থেকে বেরিয়ে ঠাকুরদা হয়ে গিয়েছিলেন এক পালটে-যাওয়া মানুষ। শুধু ঠাকুরমাকে একবারই বলেছিলেন, বাঘিনিকে উনিই মেরেছিলেন। তবে সেটা করতে গিয়ে একটা বড়ো পাপ করে ফেলেছেন। কী সেই পাপ, সেই নিয়ে অথবা শিকার নিয়ে বাকি জীবনে ঠাকুরদা আর-একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি।

আমরা গোটা পরিবার বিশ্বাস করি, ঠাকুরমাকে বলে-যাওয়া ঠাকুরদার কথাটা পুরো সত্যি। তাই অমিয়ভূষণ মল্লিক সম্পর্কে আমাদের বাড়িতে ধারণা এতটাই খারাপ যে, বাবাকে অমিয়ভূষণবাবুর চিঠিটার কথা বললে এক্ষুনি আমাকে কুচিয়ে ফেলে দিতে বলবেন। কিন্তু চিঠিটা আমাকে ভাবালো। বাবা-মাকে পুরো সত্যিটা জানালাম না। ডুয়ার্সের লাটাগুড়িতে আমার এক বন্ধু থাকে, অর্ণব। ওর কাছে বেড়াতে যাব বলে একদিন চেপে বসলাম কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে।

অর্ণবকে অবশ্য আমি খুলে জানিয়েছিলাম সব কিছু। অর্ণবও আলিপুরদুয়ার যাওয়ার পথে ময়নাগুড়ি স্টেশনে উঠে পড়ল ট্রেনে। দু-বন্ধু মিলে ঠিক করলাম, অমিয়ভূষণবাবুর বাড়ি গিয়ে একরাত্রির আতিথেয়তা নিয়ে ঠাকুরদার গল্পটা শুনে আর বন্দুকটা নিয়ে পরের দিন লাটাগুড়িতে অর্ণবের বাড়িতে চলে আসব। অমিয়ভূষণবাবুর চিঠিতে ওঁর ফোন নম্বর ছিল। আমাদের যাওয়ার দিনক্ষণ জানিয়ে দিলাম ওঁকে। স্টেশনে উনি গাড়ি আর লোক পাঠিয়েছিলেন আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য।

অমিয়ভূষণবাবুর বাড়িটা সাবেকি ধরনের বড়ো বাড়ি। বসার ঘরটা গোলাকৃতির। দরজার মুখে দু-দিকে দুটো বড়ো হাতির দাঁত। দেওয়ালে জায়গায়-জায়গায় বাঘ আর হরিণের স্টাফ করা মাথা ঝুলছে। কয়েক জায়গায় বড়ো-বড়ো বাঘছাল ঝুলছে। এ ছাড়া শিকারসুদ্ধ অমিয়ভূষণবাবুর বাঁধানো ছবি, বাঁধানো সরকারি সার্টিফিকেট, বিভিন্ন সংস্থার মানপত্র, শিকারে ব্যবহার করা বিভিন্ন বন্দুক ঝুলছে। ঘরে ঢুকে সোফায় বসব কী! আমি আর অর্ণব হাঁ করে ঘুরে-ঘুরে সেই সব দেখতে থাকলাম। এমন সময় ভারী চটির আওয়াজ পেলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, এক বৃদ্ধ লাঠি হাতে ঘরে ঢুকছেন। ইনিই যে অমিয়ভূষণ মল্লিক, পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার হল না।

অমিয়ভূষণ এগিয়ে এলেন আমার দিকে। চোখটা একটু উদাস। আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন শিবনাথ এসে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।' ভদ্রলোক আমাদের বসিয়ে নানান গল্প করতে লাগলেন। তবে আমরা উসখুস করছিলাম, কখন উনি ঠাকুরদার শেষ বাঘিনি শিকারের গল্পটা বলবেন আর ঠাকুরদার বন্দুকটা দেখাবেন। কিন্তু বিকেল বেলার আগে তার সুযোগ হল না।

দুপুরে ভালো খাওয়া-দাওয়া হল, তারপর বিশ্রাম। বিকেলবেলায় অমিভূষণবাবু বাড়ির বাগানে আমাদের চা খাওয়ার জন্য ডাকলেন। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সরাসরি চলে এলেন শিকারের প্রসঙ্গে। গল্পটা ভূমিকা দিয়ে শুরু করে দিলেন, 'বাঘ বা বাঘিনিরা একটা বয়স পেরিয়ে নরখাদক হয়। তখন এরা হয়ে যায় অত্যন্ত ধূর্ত। এদের শিকার করার জন্য রাতের পর রাত শিকারিদের

অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে জঙ্গলে মাচায় কাটাতে হয়। তবে নরখাদক বাঘ, বাঘিনিদের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ বা পশু, যা এরা শিকার করে, সেটাকে মেরে ফেলে বহুদূর নিয়ে যায়।

যতটা পারে খায়, বাকিটা রেখে যায় পরে খাবে বলে। বাঘের খাওয়া মৃতদেহের ভুক্তাবশেষকে "মড়ি" বলে। মড়ি শিকারিদের কাছে একটা বড়ো টোপ।'

'সেটা ১৯৪৮ সাল। গ্রীষ্মের সময় একটা চিতাবাঘিনির মানুষখেকো হয়ে ওঠার খবর প্রথম পাওয়া গেল। তখন অবশ্য বাঘিনিটির গতিবিধি আর ত্রাস রাজাভাতখাওয়া অঞ্চলে ছিল। আমি আর শিবনাথ দু-জনেই বর্ষাকালে ওই অঞ্চলে আলাদা-আলাদা করে ওকে মারতে গিয়েছিলাম। বাঘিনিটি ছিল অত্যন্ত ধূর্ত। দু-জনেই কয়েকবার অল্পের জন্য ফসকে ছিলাম। মনে হয়, বাঘিনিটি আমাদের চিনে ফেলেছিল। আমরা যেমন ওর পায়ের ছাপ চিনে নিয়েছিলাম, বাঘিনিটিও তেমনি আমাদের গায়ের গন্ধ চিনে নিয়েছিল। আর তাই বোধ হয় শিকার-শিকারির খেলা খেলতে রাজাভাতখাওয়া ছেড়ে একসময় এই অঞ্চলে চলে এসেছিল।'

'সেবার দুর্গাপুজো সবে শেষ হয়েছে। এই অঞ্চলে হঠাৎ করে বাঘিনিটির উপস্থিতির কথা জানা গেল। তারপর দিনে-দিনে তার উপদ্রব ক্রমশ বেড়ে গেল। দিন-পনেরোর মধ্যে তিন-তিনটি মানুষ মেরে ফেলল। সেই সঙ্গে গোরু, ছাগল তো ছিলই। লোকে ভয়ে সূর্য ডোবার পর বাড়ির বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিল। কালীপুজোর কয়েকদিন আগে বাঘিনিটি মারল এক সরকারি অফিসারকে। প্রশাসন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তখনকার ম্যাজিস্ট্রেট একদিন ওঁর অফিসে আমাকে আর শিবনাথকে একসঙ্গে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "আমরা যেন বাঘিনিটিকে যেমন করে হোক মেরে ফেলি। যে মারতে পারবে, তাকে হাজার টাকা সরকারি পুরস্কার দেওয়া হবে"।'

'কালীপুজোর ঠিক আগের দিন জঙ্গলের এক জায়গায় একটা অর্ধভুক্ত গোরু পাওয়া গেল। শিকার খাওয়ার ধরন দেখে ততদিনে আমরা অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছি। কাছাকাছি পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারলাম, গোরুটা সেই বাঘিনিটিরই শিকার। যেহেতু সেটা অর্ধভুক্ত, তাই বাকিটা খাওয়ার জন্য তার সেখানে ফিরে আসার প্রবল সম্ভাবনা আছে। আমি আর শিবনাথ নিজের-নিজের মতো পরিকল্পনা করতে থাকলাম। আমি অতিরিক্ত একটা টোপ ফেললাম। মড়ি অর্থাৎ মরা গোরুটার কাছে একটা কচি ছাগলও বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করলাম।'

'মড়িটাকে মধ্যে রেখে দু-দিকের দুটো গাছের উপর আমার আর শিবনাথের মাচা বাঁধা হল। দিনের আলো থাকতে থাকতে স্থানীয় লোকেরা আমাদের মাচায় পৌঁছে দিয়ে গ্রামে ফিরে গেল। রাতের অন্ধকারে বাঘিনির আসার অপেক্ষায় রইলাম আমরা। নীচে ছাগলছানাটা খুঁটিতে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় ঘোরাফেরা করছে। আস্তে-আস্তে রাত ঘনিয়ে এল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কয়েক হাত দূরের মাচাটায় শিবনাথকে, এমনকী খুঁটিতে বাঁধা ছাগলছানাটিকেও দেখতে পাচ্ছি না। জঙ্গলে জেগে উঠল রাতের আওয়াজ। ঘড়ির কাঁটাটা যেন খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। তবে রাতের পর রাত জঙ্গলে এভাবে মাচায় কাটানোর অভ্যেস আমাদের দু-জনেরই ছিল।

'বাঘ বা বাঘিনি যখন আসে, তখন জঙ্গলে আওয়াজের একটা পরিবর্তন হয়। সেটা দিনে একরকম, রাতে আর একরকম। দিনের আলোয় বড়ো বড়ো গাছের মগডালে বসে-থাকা পাখি বা

বাঁদরের মতো জন্তুরা অনেক দূর থেকে দেখতে পায় মহারাজ বা মহারানি আসছে। ওরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। বার্কিং ডিয়াররা অদ্ভুত গলায় ডাকে। কিন্তু রাতে অন্যরকম। রাতের বেলায় জঙ্গল বোধ হয় তার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারে, সে আসছে।

'সেদিনও সেরকমই এক সময় জঙ্গলের ডাক পালটে গিয়ে থমথমে হয়ে গেল। নিজেকে টানটান করে নিলাম। মনে মনে একটাই প্রতিজ্ঞা, শিবনাথকে হারিয়ে নরখাদক বাঘিনিটিকে আমি মারবই। হাতঘড়ির ডায়ালে রেডিয়ামের বিজবিজে আলোর ফুটকিতে দেখলাম, রাত সাড়ে বারোটা। মাচার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখে আমি নিজেকে একদম প্রস্তুত করে নিলাম। তারপর শুধুই প্রতীক্ষা।

'ঘন অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম যে, সে আমার কাছাকাছি এসে গিয়েছে। গাছের নীচ দিয়ে খসখসে একটা আওয়াজ মাচাটার কাছে এসে থামল। আমার মনে শুধু একটাই খটকা, মড়িটার কাছে বেঁধে রাখা ছাগল ছানাটার আওয়াজে কেমন যেন একটা আহ্লাদি ভাব, যেন কারো সঙ্গে খেলা করছে। আমি এক মিনিট, দু-মিনিট করে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলাম। মনে হল ধূর্ত বাঘিনি আমাদের উপস্থিতি বুঝতে পেরে গিয়েছে আর আমাদের ধন্ধে ফেলতে ছাগলছানাটার সঙ্গে খেলা করছে। আমার কাছে ছিল একটা জোরালো পেন্সিল টর্চ। ডান হাতে বন্দুক আর বাঁ হাতে টর্চটা ধরে ছাগলছানার দিকে তাক করে সুইচটা টিপতেই টর্চের ছোট্ট ফোকাসে ঝলসে উঠল হলুদের উপর সাদা ডোরাকাটা একটা চামড়া এবং প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠল উল্টো দিকের মাচা থেকে শিবনাথের বন্দুক।

আমি কপাল চাপড়ালাম। টর্চের আলো ফেলে এ যেন শিবনাথকে হাতে ধরিয়ে দেখিয়ে দিলাম কোথায় বন্দুক চালাতে হবে। হতাশ হয়ে আমি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। আর তখনই আমার চোখে পড়ল, আমি যে গাছের মাচাটায় আছি, তার মগডালে জ্বলজ্বল করছে দুটো হলদেটে চোখ। এই হলুদ চোখ আমি চিনতাম। ওই বাঘিনি ছাড়া কারও চোখ ওরকম হলুদ হয় না। চোখদুটো আমাকে সরাসরি দেখছে। যেকোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'বন্দুক আর টর্চটা আঁকড়ে ধরে আমি ঝাঁপ দিলাম মাচা থেকে। গুলি চালিয়ে শিবনাথও ততক্ষণে নেমে এসেছে মাচা থেকে। শিবনাথ ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত বাঘিনিটিকে মারতে পেরেছে। কিন্তু অচিরেই ভুলটা ভাঙল। মগডাল থেকে বাঘিনি ততক্ষণে নেমে এসেছে আমার মাচার উপর। আমাদের ছিল ওয়ান শাটার বন্দুক। শিবনাথের তখন আর সময় ছিল না নিজের বন্দুকে গুলি ভরে নেওয়ার। চকিতে ও মাটিতে পড়ে থাকা আমার বন্দুকটা তুলে নিল। বাঘিনি যে মুহূর্তে আমার শরীর লক্ষ্য করে লাফ দিল, শিবনাথের হাতে আমার বন্দুকটা গর্জে উঠল।'

টানা এতটা গল্প বলে অমিয়ভূষণবাবু থামলেন। বাগানে বসে আমরা দু-বন্ধু রুদ্ধশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে গল্পটা শুনছিলাম। কাজের লোক গরম-গরম ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা দিয়ে গিয়েছিল। গল্পের টানে সেই লুচিও চুপসে গিয়েছে। অমিয়ভূষণবাবু শান্ত গলায় বললেন, 'খাও তোমরা।'

লুচির প্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে বললাম, 'তারপর কী হয়েছিল?'

অমিয়ভূষণবাবুর মাথাটা ঝুলে গেল। গভীর একটা শ্বাস ফেলে বললেন, 'শিবনাথ সেদিন

আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। কিন্তু খ্যাতির অন্ধ লোভে এই সত্যিটা আমি কোনোদিন কারো কাছে স্বীকার করিনি। যে শিবনাথের সঙ্গে আমার শিকার নিয়ে এত রেষারেষি ছিল, সেই শিবনাথ শুধু আমার প্রাণই বাঁচায়নি, বাঘিনিকেও মেরেছে। এই সত্য জানাজানি হলে লোকসমাজে শিকারি হিসেবে আমি আর মুখ দেখাতে পারতাম না। তা ছাড়া বাঘিনির মাথায় বেঁধা গুলিটা যেহেতু আমার বন্দুকেরই ছিল, তাই বাঘিনিকে যে আমিই মেরেছিলাম, লোকে নিঃসন্দেহ ছিল।'

অর্ণব জিজ্ঞেস করল, 'বাঘিনিকে যে শিবনাথদাদুই মেরেছিলেন এবং আপনার প্রাণও বাঁচিয়েছিলেন, এই সত্যিটা কারো কাছে কোনোদিন প্রমাণ করতে পারবেন না, এই মানসিক দুঃখেই কি উনি চিরদিনের জন্য শিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন?'

'নাঃ!' নীচু মাথাটা আস্তে আস্তে নাড়তে থাকলেন অমিয়ভূষণবাবু, 'শিবনাথ গুলি করার পর আমি একটাই আওয়াজ পেয়েছিলাম, 'ধপ!' বাঘিনিটি গলা দিয়ে শেষ ডাক ছাড়ার অবকাশ পায়নি। আমি কোনোরকমে হাতড়ে-হাতড়ে টর্চটা খুঁজে পেলাম। টর্চটা জ্বালিয়ে দেখলাম, বাঘিনি মরে পড়ে আছে। তারপর আমি টর্চটা ঘোরালাম ছাগলটা যেখানে বাঁধা ছিল সেই দিকে। দেখলাম, ছাগলটা বহাল তবিয়তে আছে আর সেখানে পড়ে আছে একটা ছোট্ট বাঘশিশু। তার সারা শরীরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তারপরেই দেখলাম, শিবনাথ এগিয়ে এল বাঘশিশুটির কাছে। হাঁটু মুড়ে বসে পরম মমতায় মৃত বাঘশিশুটিকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আসলে শিকারি হলেও শিবনাথের মনটা ছিল বড্ড নরম। একটা নিষ্পাপ বাঘশিশু যখন একটা ছাগলছানার সঙ্গে খেলা করছিল, তখন তাকে গুলি করে মারার শোকটা ও কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। আমি দেখলাম, কাঁধে বন্দুক আর কোলে বাঘশিশুটিকে নিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে ও গভীর জঙ্গালের দিকে চলে গেল।

'মাচার থেকে পড়ে গিয়ে আমার চোট লেগেছিল। শিবনাথের পিছনে-পিছনে যাওয়ার শারীরিক ক্ষমতা ছিল না। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে মনও অত্যন্ত অবসন্ন ছিল। আমি গাছের তলাতেই মৃত বাঘিনির পাশে আচ্ছন্নের মতো বসে থাকলাম। একসময় ভোর হল। গ্রামবাসীরা রাত্রেই জঙ্গালের মধ্যে দুটো গুলির আওয়াজ পেয়েছিল। সকালের আলো ফুটতেই কালীপুজোর ঢাকিদের নিয়ে ঢাক, ঢোল, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে হইহল্লা করতে-করতে ওরা চলে এল মাচার কাছে। বাঘিনিটাকে পড়ে থাকতে দেখে আনন্দে আমাকে কাঁধে তুলে নিল। আনন্দের আতিশয্যে কারো মনে পড়ল না শিবনাথের কথা। লোকে বরং বাঘশিশুর রক্তে লাল-হওয়া শিবনাথের জামাটা দেখে অন্য গল্প ভাবল। কেউ জানল না, কী গভীর দুঃখে শিবনাথ বাঘশিশুর সঙ্গে নিজের বন্দুকটাও কবরে দিয়ে দিয়েছিল।'

অমিয়ভূষণবাবু পঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমাটা খুলে রুমালটা চোখের কোলে দিয়ে চুপ করে গেলেন। আমি আর অর্ণবও চুপ করে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যে মুড়িয়ে রাতের আকাশ কালো হয়েছে। সেখানে ঝিকিমিটি করে একটা-একটা তারা ফুটে উঠেছে। আমার মনে হল, ওই

তারাদেরই কোনো একটা ঠাকুরদা। উনিও শুনছেন অমিয়ভূষণবাবুর কথা। অস্ফুটে আমি বলে উঠলাম, 'ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল ঠাকুরদা, তোমার কোনো দোষ ছিল না।'

অমিয়ভূষণবাবুর এক কাজের লোক ব্রাউন পেপারে মোড়া ঠাকুরদার বন্দুকটা এনে আমার হাতে দিল। মোড়কটা খুলে বন্দুকটার উপর আলতো করে হাত বোলালাম। কাঠের বাঁটের উপর খোদাই করে লেখা আছে ঠাকুরদার নাম, শিবনাথ লাহিড়ী।

অমিয়ভূষণবাবু বললেন, 'আমি প্রয়োজনীয় সরকারি কাগজপত্র সব করিয়ে রেখেছি। বন্দুকটা তুমি নিয়ে যাও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। মনে পড়ল জিম করবেটের কথা। শুনেছি, ঠাকুরদার আদর্শ ছিলেন জিম করবেট। জিম করবেটও কোনোদিন নিছক শিকারের জন্য বাঘ শিকার করেননি। তিনি যদিও মনেপ্রাণে একজন খাঁটি ভারতীয় ছিলেন, কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কিনিয়া চলে গিয়েছিলেন। যাওয়ার আগে ওঁর বাঘ শিকারের বন্দুকগুলো নৈনিতালের কাছে গভীর জঙ্গলের এক অজ্ঞাত জায়গায় পুঁতে দিয়ে গিয়েছিলেন।

অমিয়ভূষণবাবুকে বললাম, 'শিকার ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরদা বন্দুকটা এখানকার জঙ্গলকেই উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন। আপনি এখানকার জঙ্গলটা সবচেয়ে ভালো চেনেন। বন্দুকটা সেই জায়গাতেই রেখে দিন না, যাতে জিম করবেটের বন্দুকের মতো ঠাকুরদার বন্দুকটাও চিরকাল জঙ্গলেই থাকে।'

কথাগুলো বলে আমি আবার আকাশের দিকে তাকালাম। সেই তারাটা যেন খুব খুশি হয়ে পিটপিট করছে। আমার চোখে জল এসে আস্তে-আস্তে ঝাপসা হয়ে গেল তারাটা।

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

বান্ধবগড়ের রাজাসাহেব

শেষ ফরেস্ট লজে খোঁজ নিয়ে গাড়ির কাছ এসে সৈকত বলল, 'না রে, কোনো ঘর খালি নেই।' অনেক করে ম্যানেজারকে অনুরোধ করলাম। রেজিস্টার দেখালো লোকটা। সাতদিনের আগে কোনো ঘর পাওয়া যাবে না। কী ডিসিশন নিবি এখন?

করানো। গুমটির কাঠের বেঞ্চে বসেছিল ত্রিদিব। আমি দাঁড়িয়ে গাড়ির বনেটে হেলান দিয়ে। সৈকতের কথা শুনে ত্রিদিব বেশ হতাশভাবে বলল, 'তাহলে কী হবে? বাঘ দেখা ভাগ্যে নেই। বরং এখান থেকে অমরকণ্টক বা খাজুরাহো চলে যাই।'

দরজা খুলে আমরা গাড়িতে উঠতে যাব, এমন সময় একজন হিন্দিতে বলল, 'সাহেবরা এখানে এসে বাঘ না দেখেই ফিরে যাবেন?'

গলা শুনে পিছনে ফিরে দেখি, একজন লোক। মাঝবয়সি, মাথায় পাগড়ি, পরনে ধুতি-ফতুয়া, দেখে স্থানীয় বলেই মনে হচ্ছে।

লোকটা মুহূর্তখানেক চুপ থেকে বলল, 'আমি আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করতে পারি। বাঘও দেখাতে পারি।'

ত্রিদিব বিস্মিত হয়ে বলল, 'তাই নাকি! আপনি কি কোনো হোটেল-টোটেলের লোক?'

সে বলল, 'না, আমি হোটেলের লোক নই। তবে এখানে সব হোটেলের লোকই আমায় চেনে। আমার নাম মঙ্গল সিংহ। এখান থেকে ঘণ্টা চারেক দূরে জঙ্গলের ভিতরে এক জায়গায় থাকি।

জায়গাটাকে বলে 'রাজাসাহেবের হাভেলি'। আমি সেখানে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করব। বাঘও দেখাব।' কথাগুলো বলে আমাদের উত্তরের আশায় তাকিয়ে রইল।

লোকটার কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা আহ্বান আছে যে, আমরা 'না' করতে পারলাম না। মঙ্গাল সিংহকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। চালকের আসনে ত্রিদিব। মঙ্গাল সিংহ ত্রিদিবের পাশের সিটে বসে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলল। পর্ণমোচী বৃক্ষ, বিশেষত শালের জঙ্গাল আর ঘাসবন। মঙ্গাল সিংহের নির্দেশে কখনো তার মধ্যে দিয়ে, কখনো জঙ্গালকে বেড় দিয়ে এগিয়ে চললাম। ক্রমশ ঢুকতে লাগলাম গভীর অরণ্যের মধ্যে। দূরে নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আছে সাতপুরা পাহাড়। আমরা এগোচ্ছি সেদিকেই। মঙ্গাল সিংহ মাঝে মধ্যে বলতে লাগল জঙ্গালের নানা খবর। যাত্রাপথেই আমরা দেখতে পেলাম, একদল চিতল হরিণ আর একটা ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। এমন ঘন জঙ্গালের মধ্যে এত বড়ো বাড়ি! বাড়িটা অবশ্য অনেক পুরোনো তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। দোতলার কারুকাজ করা রেলিং, ছাদের কার্নিশ সব খসে গিয়েছে। দেউড়ির দু-পাশে অস্ত্র হাতে দাঁড়ানো পাথরের মূর্তির মাথা ভাঙা, স্তম্ভের ইট বেরিয়ে পড়েছে, পলস্তারাহীন দেওয়াল।

জানতে চাইলাম, 'জঙ্গালের মধ্যে এত বড়ো বাড়ি কে বানিয়েছিল?'

মঙ্গাল সিংহ বলল, 'পুরো বান্ধবগড়টাই একসময় মেওয়ারের মহারাজাদের প্রাইভেট শিকার খেলার জায়গা ছিল। তাঁরাই বানিয়েছিলেন। রাজপুরুষরা শিকার খেলতে আসতেন। বহু সাহেবও এসেছেন। হাভেলির ওই যে ওখানে উঁচু ছাদওলা জায়গাটা দেখছেন, ওখানে হাতি রাখা থাকত। তারপর এক সময় রাজারাজড়ার যুগ শেষ হয়ে গেল, শিকার খেলাও শেষ হয়ে গেল আর তার সঙ্গে এর রমরমাও। তবে এখনও এটা প্রাইভেট প্রপার্টি।'

ত্রিদিব বলল, 'এখন কারা থাকে?'

মঙ্গাল সিংহ একটু হতাশভাবে বলল, 'কে আর থাকবে? শুধু আমি আর রাজাসাহেব।'

'রাজাসাহেব মানে?' জানতে চাইল সৈকত।

মঙ্গাল সিংহ জবাব দিল, 'উনি একজন রাজবংশধর। প্রায় নব্বই বছর বয়স। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। এবার ভিতরে চলুন!'

বাড়িটার অধিকাংশ ঘরই বাসযোগ্য নয় বলেই মনে হল। কোনো ঘরে তেমন কোনো আসবাব নেই। বেশ কয়েকটা ঘর-অলিন্দ পেরিয়ে আমাদের নিয়ে দোতলার একটা বারান্দায় উঠে এল মঙ্গাল সিংহ। বারান্দাসংলগ্ন বেশ কয়েকটা ঘর। এ জায়গাটা বেশ সাফসুতরো। বারান্দায় ওঠার পর তিনটে জিনিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো আছে একজন যুবা রাজপুরুষের বিরাট তৈলচিত্র। তার পরনে জরির পোশাক, গলায় মুক্তোর মালা, মাথায় পালক-গোঁজা, রত্নখচিত পাগড়ি। আর এ ছবির দু-পাশে টাঙানো একটা স্টাফ করা বিরাট বাঘের মাথা,

অন্য পাশে একটা বন্দুক। বাঘের চোখ দুটো যেন এখনও জ্বলছে। মঙ্গল সিংহ বলল, 'রাজাবাবুর ছবি। বন্দুকটা দিয়ে বাঘটা শিকার করেছিলেন তিনি এই হাভেলির কাছাকাছি জঙ্গালের মধ্যে।' কথা বলতে-বলতে আমাদের থাকার জন্য একটা ঘর খুলে দিল মঙ্গাল সিংহ।

২

হাভেলির হাতায় কয়েকটা চেয়ার পেতে আমাদের বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছে মঙ্গাল সিংহ। আলো বলতে পাশে রাখা একটা হারিকেন। অন্য কোনো আলো নেই চারপাশে। খাওয়া-দাওয়া সারা। রাত প্রায় আটটা বাজে। মঙ্গাল সিংহ বলে গিয়েছে, কাল ভোর পাঁচটায় আমাদের বাঘ দেখাতে নিয়ে যাবে। আমরা যেন রাত নটায় শুয়ে পড়ি। রাতে হয়তো ঘর থেকেই বাঘের ডাক শোনা যেতে পারে। চারপাশেই তো জঙ্গাল।

পরদিন ভোরে বাঘ দেখব আমরা। তাই ভিতরে-ভিতরে বেশ উত্তেজিত। জায়গাটাও বেশ পছন্দ আমাদের। অন্য টুরিস্টদের কোনো হল্লা নেই এখানে। কিছুটা তফাতেই চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে গভীর শালবন। গল্প করছিলাম আমরা। দেখলাম, হাভেলির একটা মহল থেকে বেরিয়ে কে এগিয়ে আসছে? মঙ্গাল সিংহ নাকি?

লোকটা আমাদের কাছে এসে দাঁড়াতেই বুঝলাম, মঙ্গাল সিংহ নয়। তার পরনে খাকি পোশাক, ব্রিচেস, হাই-হিল বুট, কাঁধে বন্দুক। দীর্ঘদেহী একজন লোক। তবে বয়সের ভারেই সম্ভবত এখন কিছুটা ন্যুব্জ। লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এই হাভেলির রাজাসাহেব। পরিচয় করতে এলাম।'

রাজাসাহেব! মানে যিনি বাঘ মেরেছিলেন? মেওয়ারের রাজবংশধর? সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর দিকে তাকালাম আমরা। মঙ্গাল সিংহ তাঁর যা বয়স বলেছিল, ততটা না হলেও আশি বছর হতেই পারে। ভ্রূ, বিরাট গোঁফ সব দুধসাদা হয়ে গিয়েছে, চামড়াও কুঁচকে গিয়েছে। তবে তাঁর অবয়ব বলে দিচ্ছে, এক সময় বেশ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। বয়স তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি।

আমাদের পরিচয়ের পর তিনি বললেন, 'কাল সকালে তো নিশ্চয়ই আপনারা বাঘ দেখতে যাবেন, তা মঙ্গাল যখন বলেছে তখন ঠিকই দেখাবে। বান্ধবগড়ে এখনও অনেক বাঘ আছে।'

এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, 'তবে সেই রাজা-বাঘের মতো কোনো বাঘ নেই, যার মাথা আপনারা দেখেছেন সম্ভবত। পঞ্চাশ বছর আগে যে বাঘটা আমি শিকার করেছিলাম। বান্ধবগড়ের রাজা-বাঘ, নরখাদক বাঘ!'

তার কথা শুনে সৈকত বলে উঠল, 'আপনার বাঘ শিকারের গল্পটা আমাদের বলবেন? শিকারকাহিনি আমরা বইয়ে পড়েছি। কোনো শিকারির মুখ থেকে গল্প শুনিনি।'

রাজাসাহেব কিছুদূরের জঙ্গালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জায়গাটা এখান থেকে খুব কাছেই।

ওই জঙ্গালের মধ্যে একটা নালার ধারে যেখানে মাচায় বসে শিকারটা করেছিলাম। মাচা এখনও বাঁধা আছে। চলুন, ওখানে বসে আপনাদের গল্প শোনাব।'

গল্প শোনার আকর্ষণ আমাদের আছে, কিন্তু এত রাতে শালের জঙ্গালে ঢোকা কী ঠিক হবে?

রাজাসাহেব বললেন, 'ভয় পাচ্ছেন? আমার বন্দুক তো আছেই। জীবনে কোনোদিন দুটো গুলি ছুড়িনি। এক গুলিতেই নিকেশ হয়ে যেত শিকার।' কথাগুলো বলে বিড়বিড় করে তিনি যেন বললেন, 'সাহস ছিল বটে মহেন্দ্র সিংহের!' এ কথার মানে ঠিক ধরতে পারলাম না।

গা-ছমছমে শালের জঙ্গালের মধ্যে দিয়ে মিনিট দশেক হেঁটে আমরা পৌঁছে গেলাম সেখানে। শালগাছের খুঁটির উপর ফুট দশেক উঁচু একটা মাচা। এ মাচাটা পরে তৈরি। কাঠের পাটাতনের সিঁড়ি বেয়ে আমরা মাচার উপরে উঠে বসলাম।

সামনে কিছুটা তফাতে মানুষ-সমান উঁচু ঝোপঝাড়। সে জঙ্গাল কিছুটা এগিয়ে শেষ হয়েছে একটা শীর্ণ নদীর মরা খাতে। নালার ওপাশে শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গাল। সে জঙ্গাল উঠে গিয়েছে চন্দ্রালোকিত সাতপুরা পাহাড়ের ঢালে।

সেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রাজাসাহেব বলতে শুরু করলেন তাঁর গল্প, 'দেশ তখন স্বাধীন হয়েছে। আমাদের রাজত্বও চলে গিয়েছে। রাজপরিবারের সন্তান হিসেবে এই হাভেলির মালিকানা পেয়েছিলাম আমি। আসতাম আমার সমবয়সি মহেন্দ্র সিংহের টানে। তারা ছিল পুরুষানুক্রমে শিকারি। যেসব রাজা-মহারাজা এখানে শিকারে আসতেন, তাঁদের সঙ্গ দিত ও। জঙ্গালে পথ চিনিয়ে শিকারের কাছে পৌঁছে দিত শিকারিদের। তবে মহেন্দ্রর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক প্রভু-ভৃত্যের ছিল না। সে ছিল আমার অভিন্নহৃদয় সহচর। আমরা একসঙ্গে ছেলেবেলায় কত ঘুরে বেড়িয়েছি এই বনে। মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে তার সাহায্যে এই বনে বাঘ শিকার করেছি আমি। তবে শিকার ব্যাপারটা যে ঠিক নয় সেটা বোঝার বয়স তখন আমার ছিল না। শরীরে রাজার রক্ত, ছেলেবেলাতেই বন্দুক হাতে তুলে নেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। তবে আমার নরখাদক বাঘ শিকারের ঘটনাটা আরও পরের। তখন আমার বছর পঁচিশেক বয়স। আমি বেড়াতে এসেছি এখানে। ঠিক সেই সময় বাঘটা হানা দিতে শুরু করল এখানে। ওই যে নালাটা দেখছেন, ওর ভিতরেই ডেরা বাঁধল বাঘটা। এ নালা চলে গিয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। দু-পাশে ঘন জঙ্গাল। বাঘের লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। আমাদের প্রাক্তন প্রজারা আমাকে এসে ধরল, বাঘটাকে মারার জন্য।

'মহেন্দ্র সিংহকে নিয়ে আমি জঙ্গালে বেরোতে শুরু করলাম বাঘটাকে মারার জন্য। তাকে চাক্ষুষ না করলেও তার "খোঁচ" অর্থাৎ পায়ের ছাপ দেখে আমরা বুঝতে পারলাম বাঘটা একটা পূর্ণবয়স্ক প্রকাণ্ড বাঘ। দৈর্ঘ্যে প্রায় বারো ফুট হবে লেজের ডগা পর্যন্ত। ওজন হবে তিন-শো কেজি। পরে বুঝেছিলাম আমাদের অনুমান মিথ্যে ছিল না।'

‘যাই হোক, বাঘটা ছিল অসম্ভব ধূর্ত। মানুষখেকো বাঘ যেমন হয়। আমরা জঙ্গলে খুঁজে বেড়াই তাকে। কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পাই না। কোনো কোনো পথে তার পায়ের ছাপ দেখে বুঝি, যখন আমরা তার সন্ধানে ঘুরছি, ঠিক তখন সে আমাদের নিঃশব্দে অনুসরণ করছে, কোনো অসতর্ক মুহূর্তে শিকারিকে শিকারে পরিণত করার জন্য। সপ্তাহ তিনেক ব্যর্থ অভিযান

চলল আমাদের। শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারলাম আমরা। সে ইদানীং আমাদের খুব কাছাকাছি ছায়ার মতো ঘুরছে। তার পায়ের ছাপ সে-কথাই বলছে।

'মহেন্দ্র একদিন বলল, "এভাবে কিছু হবে না। বাঘটা যখন কাছাকাছি আছে, তখন মাচান বেঁধে টোপের ব্যবস্থা করা যাক।" আমিও রাজি হলাম তার প্রস্তাবে। ঠিক এই জায়গাতেই মাচান বাঁধা হল। কারণ, ওই নালাটা এখান থেকে দেখা যায়। ওখান থেকেই তো উঠে আসে বাঘটা। ছাগলের টোপ নীচে বেঁধে এই মাচানে রাত জাগতে শুরু করলাম আমরা।'

'ছ-টা রাত পেরিয়ে গেল কিন্তু সে সামনের ওই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঝাঁপাল না আমাদের রাইফেলের সামনে। অথচ প্রতি ভোরেই আমরা দেখি, রোজই সে আমাদের চোখ এড়িয়ে নালা থেকে উঠে এসে আশ্রয় নিয়েছে সামনের ওই ঝোপ-জঙ্গলে। সেখান থেকে মাচায় বসা আমাদের লক্ষ করেছে। তারপর আবার ফিরে গিয়েছে। খোঁচ দেখে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি।

'ষষ্ঠ রাতেও যখন কিছু হল না, তখন সেদিন হাভেলিতে ফিরে মহেন্দ্র আমাকে বলল, "এভাবেও কিছু হবে না বলেই মনে হচ্ছে। বাঘটার ছাগলের প্রতি আগ্রহ নেই। ওর আগ্রহ মানুষ অর্থাৎ আমাদের উপর। বিশেষত, তোমার উপর। হয়তো তা তোমার এই জমকালো পোশাক আর পাগড়ির জন্য। আমি খেয়াল করে দেখেছি। তুমি জঙ্গলে যে পাশ দিয়ে হাঁটছ, সে পাশ ধরেই সে অনুসরণ করে আমাদের। অর্থাৎ ও শিকার হিসেবে তোমাকেই পছন্দ করছে। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে"।'

' "কী প্ল্যান?" জানতে চাইলাম। সে যা বলল তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মহেন্দ্র বলল, "তোমার পোশাকটা আমায় আজ তুমি পরতে দেবে। আর আমার খাকি পোশাক পরবে তুমি। ছাগল নয়, আজ রাতে আমি তোমার পোশাক পরে টোপ হব মাচার নীচে। আর উপরে থাকবে তুমি। আজ চাঁদনি রাত। ও তোমার নজর এড়াতে পারবে না। আর তারপর তুমি...।" তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি বলে উঠলাম, "কী বলছ তুমি? এ যে আত্মহত্যার শামিল! না, এ কাজ করা যাবে না"।'

মহেন্দ্র হেসে বলল, 'তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? বাঘ যত দ্রুত ঝাঁপাক, একটা গুলির সুযোগ তুমি পাবেই। তাতেই কাজ হবে। তোমার সঙ্গে বহু শিকারে গিয়েছি আমি। তোমার হাতের উপর আমার ভরসা আছে।'

'আমার নিশানার উপর নিজের যথেষ্ট ভরসা আছে। তবুও তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি। ব্যাপারটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জেদের কাছে হার মেনে গেলাম আমি। সেদিন বিকেলে আমার পোশাক পরল মহেন্দ্র আর তার এই পোশাক গায়ে দিয়ে দু-জন হাজির হলাম এখানে। মহেন্দ্র রইল নীচে। আর আমি বন্দুক নিয়ে মাচায় উঠে বসলাম। এক সময় জঙ্গলে অন্ধকার নামল, তারপর চাঁদ উঠল। ঠিক আজ রাতের মতোই চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত জঙ্গল। সময় কাটতে লাগল। ঘণ্টা তিন-চার দাঁড়িয়ে থাকার পর মহেন্দ্র আমাকে একটা ইশারা করে ওই ঝোপ ভেঙে এগোতে শুরু করল নালার দিকে। তার উদ্দেশ্য বুঝতে

পারলাম আমি। সে নালার দিকে এগোচ্ছে নরখাদকটাকে প্রলুব্ধ করে তার পিছন-পিছন এখানে টেনে আনার জন্য। ভয়ংকর ব্যাপার! কিন্তু তখন তাকে বাধা দেওয়ার উপায় নেই। চিৎকার করলে বাঘটা কাছাকাছি থাকলে মহেন্দ্রর আরও বিপদ হতে পারে। আস্তে-আস্তে সে হারিয়ে গেল নালার দিকে।'

আমরা তন্ময় হয়ে তার গল্প শুনছিলাম। সৈকত বলল, 'তারপর? তারপর কী হল?'

রাজাসাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'চুপ-চুপ, একদম চুপ। ওই তো দেখুন, মহেন্দ্র নালা থেকে উঠে আসছে,' ফিসফিস করে কথাগুলো বলে তাঁর রাইফেলটা কাঁধের উপর উঠিয়ে নিলেন রাজাবাবু। তাঁর কথা শুনে নালার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমরা। সত্যিই নালার দিক থেকে এদিকে এগিয়ে আসছে একজন মানুষ। চাঁদের আলোয় তার গায়ের জরির পোশাক ঝলমল করছে। এ কী করে সম্ভব? পঞ্চাশ বছরের পুরোনো গল্প চোখে দেখা যায় নাকি?

লোকটা এক সময় আমাদের বেশ কাছাকাছি চলে এল। রাজাবাবুর বন্দুকের নল ঘুরতে শুরু করেছে লোকটার চারপাশের জঙ্গালের উপর। হঠাৎ একটা লক্ষ্যে স্থির হয়ে গেল তাঁর বন্দুকের নল। জ্বলে উঠল বন্দুকের উপর লাগানো টর্চ। সেই আলোয় আমরা দেখতে পেলাম, আলোটা ঝোপের উপর যেখানে গিয়ে পড়েছে, সেখান থেকে উঁকি মারছে একটা প্রকাণ্ড বাঘের মাথা। টর্চের আলোয় জ্বলজ্বল করছে তার হিংস্র চোখ। আর এর পরক্ষণেই কানফাটানো গর্জন করে উঠল রাজাসাহেবের হাতের বন্দুক। পরমুহূর্তেই টর্চের আলো নিভে গেল। রাজাসাহেব চিৎকার করতে থাকলেন, 'পেরেছি! পেরেছি! মহেন্দ্র আমি পেরেছি।'

হতবাক আমরা, ব্যাপারটা কী ঘটল কিছুই বুঝতে পারছি না। আর এরপরই নীচ থেকে সেই লোকটা ছুটে মাচার কাছে এসে উপরে উঠে এল। আমরা দেখলাম, রাজার পোশাক-পরা লোকটা মঙ্গাল সিংহ। তাকে দেখে একটু ধাতস্থ হয়ে আমি বিস্মিতভাবে বললাম, 'এসব কী ব্যাপার, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না! রাজাসাহেব সত্যি বাঘ শিকার করলেন নাকি? ওই তো ওখানে এইমাত্র বাঘ দেখেছি আমরা।'

মহেন্দ্র সিংহ প্রথমে বলল, 'কোথায় দেখেছেন?' তারপর অচৈতন্য রাজাসাহেবকে তুলে ধরে বললেন, 'এঁকে মাচা থেকে নামিয়ে হাভেলিতে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন আপনারা।'

৩

হাভেলিতে ফিরে এসেছি আমরা। রাজাসাহেবকে তাঁর ঘরে শুইয়ে এসে বারান্দায় আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াল মঙ্গাল সিংহ। ঠিক সেখানে, যেখানে রাজাসাহেবের ছবিটা দেওয়ালের গায়ে টাঙানো আছে। মঙ্গাল সিংহ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'আপনারা যা দেখলেন, তা সবই সাজানো ঘটনা।'

আমি বললাম, 'তার মানে?'

সে বলল, 'আপনারা নিশ্চয়ই রাজাসাহেবের মুখ থেকে তাঁর বাঘ শিকারের গল্প শুনেছেন? বাকিটা আমি আপনাদের শোনাচ্ছি।'

'সত্যি সেই রাতে মহেন্দ্র সিংহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সফল হল। নরখাদকটা ছিল নালার মধ্যে। মঙ্গল সিংহকে রাজাসাহেব ভেবে তার পিছন-পিছন উঠে এল বাঘটা। কিন্তু ধূর্ত বাঘটা এমনভাবে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে গুড়ি মেরে এল যে, মাচায়-বসা রাজাসাহেব প্রথমে দেখতে পাননি তাকে। মাচার নীচে এসে দাঁড়াল মহেন্দ্র সিংহ। সেও সম্ভবত টের পায়নি বাঘটার উপস্থিতি। আর এরপরই বাঘটা একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে কোনাকুনিভাবে ঝাঁপ দিল তাকে লক্ষ্য করে। রাজাসাহেবও সঙ্গেসঙ্গে গুলি চালালেন, কিন্তু প্রথমবার তাঁর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তবে দ্বিতীয় গুলিটা ফুঁড়ে দিল নরখাদকের হৃৎপিণ্ড। দুটো গুলির মধ্যে ছিল মুহূর্তের ব্যবধান। তবু তারই মধ্যে যা ঘটার ঘটে গেল। রাজাসাহেব যখন মাচা থেকে নীচে নামলেন, তখন মাটিতে পড়ে থাকা দুটো দেহই ছিল প্রাণহীন। ওই মুহূর্তের ব্যবধানেই নরখাদকটা দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল মহেন্দ্র সিংহের ঘাড়ে।

'এ ঘটনার পর রাজাসাহেবের মনে ধারণা জন্মাল যে, মহেন্দ্রর মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। এ গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারলেন না তিনি। থেকে গেলেন এই হাভেলিতে। মহেন্দ্রর শিশুপুত্রকে তিনি মানুষ করার দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু পরে মাথাটাও খারাপ হল। চাঁদনি রাত হলেই তিনি বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়তে শুরু করলেন জঙ্গলে। তাঁর মনে হয়, নরখাদকটা আর মহেন্দ্র আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে জঙ্গলে। তিনি এক গুলিতে বাঘটাকে সাবাড় করে ফিরিয়ে আনবেন তাঁর মহেন্দ্রকে। কিন্তু ব্যাপারটা তো বিপজ্জনক। বাঘ তো আজও আছে জঙ্গলে। তাই রাজাসাহেবকে শান্ত করার জন্য আমি একটা কাজ করি। আমি নিজেই চাঁদনি রাতে মহেন্দ্র সাজি। নরখাদকের একটা মুখোশ নিয়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে রাখি। রাজাসাহেব বন্দুক নিয়ে মাচায় বসেন। তাতে অবশ্য সত্যি গুলি থাকে না, থাকে ফাঁকা কার্তুজ। ওতে শুধু আগুন আর শব্দ হয়। আমি যখন নালা থেকে উঠে আসি, তখন ঝোপের উপর আলো ফেলে বাঘের মাথাটা দেখতে পেয়ে গুলি চালান তিনি। ব্যাপারটাকে সত্যি ভেবে এরপর বেশ কিছুদিন শান্ত থাকেন রাজাসাহেব। আমার পরিচয়টা এবার বলি, আমিই হলাম মহেন্দ্র সিংহের সেই ছেলে।'

মঙ্গল সিংহের গল্প শুনে আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'তবে বাঘ কিন্তু দেখা হয়ে গিয়েছে আপনাদের।'

আমি বললাম, 'মানে?'

'আজ জঙ্গলে যাওয়ার পর খেয়াল হল, মুখোশটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছি। এই তো এখনও আপনাদের সামনেই টাঙানো আছে মুখোশটা। যাকে আপনারা জঙ্গলে দেখেছেন; সেটা আসল বাঘ। আপনারা খেয়াল না করলেও মাচায় ওঠার পর আমি তাকে দূরে চলে যেতে দেখেছি।

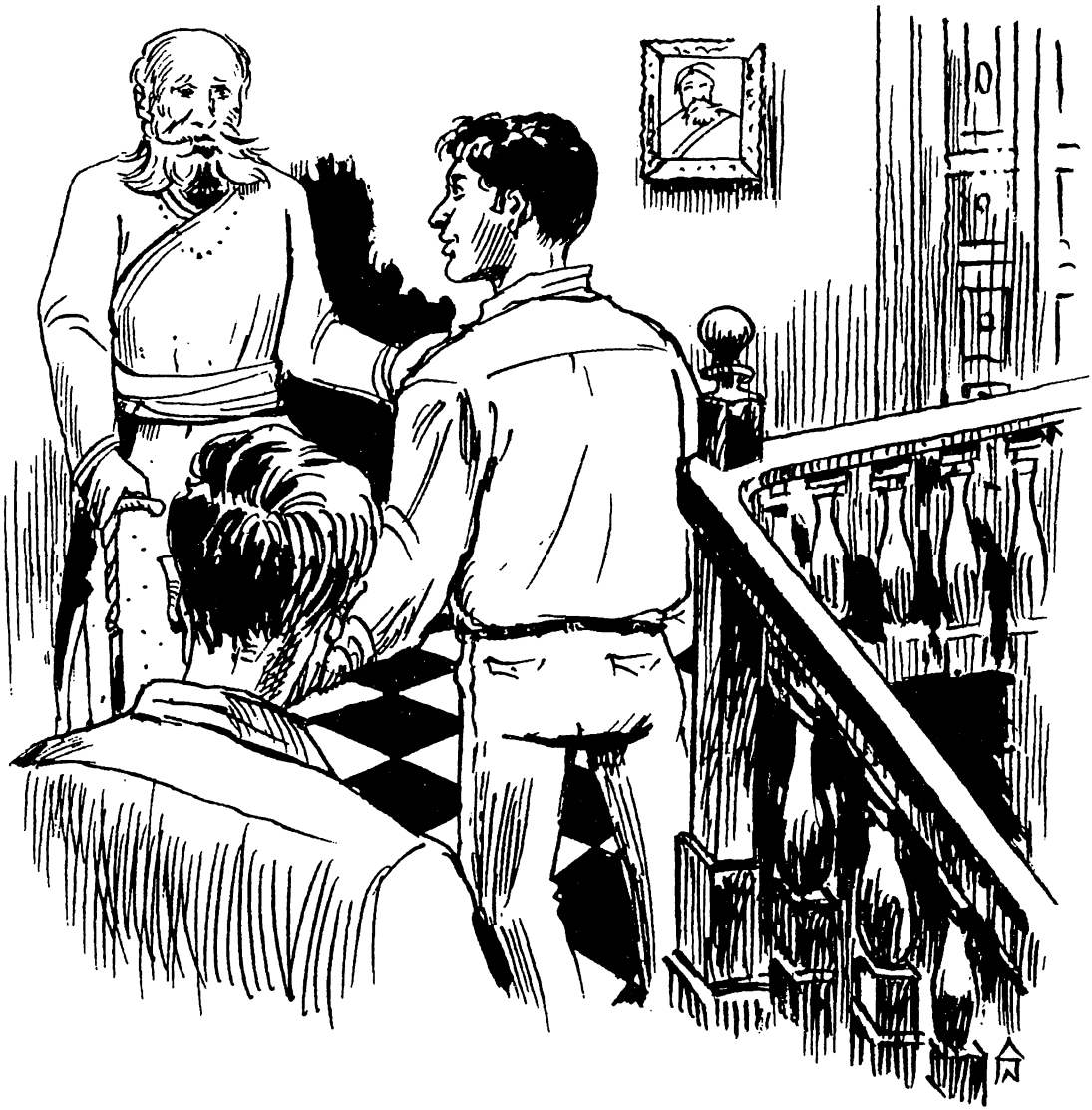

প্রকাণ্ড একটা বাঘ! সাধারণত ও বাঘটা এদিকে আসে না। রাজাসাহেবের বন্দুকে গুলি ছিল না। ইচ্ছে করলেই ও মাচা থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারত কাউকে। কাল তার সঙ্গে আপনাদের মোলাকাতের চেষ্টা করব।'

পরদিন মঙ্গল সিংহের দৌলতে সত্যি তার দেখা পেলাম আমরা। জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গায় বিরাট একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আমাদের গাড়ির কিছুটা তফাতে রাস্তার

মাঝখানে দাঁড়াল সেই মহাকায় শার্দুল। রাজকীয় তার দাঁড়াবার ভঙ্গিমা। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তার ডোরাকাটা হলুদ দেহ। ভাবখানা এমন, সে যেন আমাদের খেয়ালই করেনি। আমরা নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে আছি তার দিকে। মঙ্গল সিংহ চাপাস্বরে মন্তব্য করল, 'বান্ধবগড়ের আর-এক রাজাসাহেব! অরণ্যের রাজা!'

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল গতকাল রাতে শোনা মঙ্গল সিংহের কথাগুলো, 'রাজাসাহেবের বন্দুকে গুলি ছিল না। ইচ্ছে করলেই মাচা থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারত কাউকে।'

মঙ্গল সিংহের ডাকেই সংবিৎ ফিরল আমাদের। সে বলল, 'চলুন, এবার হাভেলিতে ফিরতে হবে। রাজাসাহেব সেখানে অপেক্ষা করছেন।'

রাজেশ বসু

নবীনের প্রতিশোধ

মা বললেন, 'শোন বাবা, খুদকুঁড়ো যা আছে দিনমান হয়ে যাবে। কালের ভাবনা কাল দেখব।'

মা-র কথায় কান দিল না নবীন। ক-দিন ধরে ওই খাবারই তো খাচ্ছে সে। আলুসেদ্ধও থাকে না রোজ। খালি নুন আর লঙ্কা। গলা দিয়ে নামতে চায় না। নেতাই সামন্ত শহরের বাবুদের বন দেখাতে এনেছেন। তাদের কেউ আস্ত মৌচাক চান। দিতে পারলে মোটা ইনাম। কথাটা শোনা ইস্তক বুকে মাদল বাজছে নবীনের। বেরিয়ে পড়েছে ডিঙি নিয়ে। কিছু রোজগার তো হবে। কদ্দিন আর আধপেটা খেয়ে থাকা যায়!

নিতাই সামন্ত বলছিল, 'সাহেব খুব দরাজ। দু-চার টাকা নাকি কিছুই না। এক হাতে চাক দিবি, অন্য হাতে টাকা। কোনও গরমিল নেই।'

বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছিল নবীনের। টাকাটা হাতে এলে প্রথমেই আস্ত মুরগি কিনবে হাট থেকে। সঙ্গে পেঁয়াজ রসুন আলু শুকনো লঙ্কা আর মিনিকিট চাল। মাকে বলবে কষে রান্না করতে। ঝাল-ঝাল করে। পেটভরে একদম গলা পর্যন্ত খাবে নবীন। ভাবতেই জিভে জল এসে গিয়েছিল। মনে-মনে নিতাই সামন্তকে ধন্যবাদ দিয়েছিল। যদিও হোঁদল কুতকুত লোকটাকে মোটেই পছন্দ করে না সে। বনবিভাগে কাজ করে বলে যেন মাথা কিনে নিয়েছে। ভাবগতিকও সুবিধের না। যেমন ঘ্যাড়ঘেড়ে গলার স্বর, তেমনি শিয়ালের মতো দৃষ্টি। কী মতলবে ঘোরে কে জানে! বায়নাটা নিতাই সামন্ত অন্য কাউকেও দিতে পারত। বরাত ভালো নবীনের। এখন

কাজটুকু সঠিক করতে পারলে হয়।

বনবিবিকে প্রণাম করে সকাল-সকাল তাই বেরিয়ে পড়েছে নবীন। মা একটু রাগল বটে, কী করা যাবে। একেবারে মুরগি নিয়ে ফিরে রাগ জল করে দেবে। একাই বেরিয়েছে ডিঙি নিয়ে। গন্তব্য কাদাখালির চর। গেঁওয়া বাইন পশুড় গর্জনে ভরতি মহাঘন জঙ্গাল সেখানে। ক-দিন আগেই বাইনগাছে চড়ে ইয়া বড়ো একখানা টুসটুসে মৌচাক দেখেছে সে সেখানে। লক্ষ্য সেটাই। সুবিধে হচ্ছে, জল থেকে খুব বেশি পথ না। মক্ষির ঝাঁকও একটু যেন কম। চাকটাও খুব বেশি উঁচুতে না। নাগালের মধ্যেই। মুশকিল শুধু একটাই। হেঁতালের বড়ো বাড়বাড়ন্ত জায়গাটায়। দক্ষিণরায়ের বাহন ঘাপটি দিয়ে থাকলেই চিত্তির!

চিন্তাটা হতেই বুকটা গুড়গুড়িয়ে উঠল নবীনের। বিশ বছরের জোয়ান শরীরটা কঠিন হয়ে এল। ভয় যেমন হল চাপা একটা ক্রোধও তুষের আগুনের মতো ভুসভুসিয়ে উঠল। বাবার মুখখানা ভেসে উঠল চোখে। আজ থেকে সাত বচ্ছর আগে এমনি একটি দিনে দক্ষিণরায়ের বাহন টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাবাকে। বাবা ছিল বাউলি। সেই সোঁদরবনের গহিনে গিয়ে আর ফিরল না সে। সাত বছর আগের কথা হলে কী হবে, ভীষণ সে দিনটা আজও চোখের সামনে ভাসে নবীনের।

আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল খুব। সকালটাও ছিল এমনি থমথমে। থেকে-থেকে দমকা হাওয়া। মার মনে কু-গেয়েছিল। মানা করেছিল বেরোতে। কিন্তু অমন বারণ শুনলে চলে না। বিশেষ করে যারা সোঁদরবনে থাকে।

শালতি চেপে তিনজন গিয়েছিল জঙ্গালে। নবীনও ছিল সঙ্গে। তেরো বছর বয়স তখন তার। বাবারা নামলেও সে নামেনি। রতনকাকার সঙ্গে সে থেকে গিয়েছিল শালতিতে। মুড়ি-বাতাসা খেতে খেতে খালের দু-পাশে বিস্তৃত বনের শোভা দেখছিল সে। পাখির কলকাকলি। চিতল হরিণের টিউ-টিউ ডাক। বাতাসে ভেসে আসা বুনোফুলের গন্ধ।

এমন সময় ভীষণ রকম চেঁচামেচির শব্দে সংবিৎ ফেরে। বাবারা ছুটে আসছে শালতির দিকে। ব্যাপারটা কী বোঝার আগেই রতনকাকা অসাধারণ দক্ষতায় শালতি ভিড়িয়ে দিল তীরে। বাবার আগে ছিল নুরচাচা। সে লাফ দিয়ে উঠতে-না-উঠতেই ঘটনাটা ঘটল। একদম ভোজবাজির মতো বিশাল একটা বাঘ এসে পড়ল কোত্থেকে। কিছু বোঝার আগেই বাবার পিছনের পায়ে কামড় বসিয়ে দিল সে। শালতিটা ডান হাতে ধরে ফেলেছিল বাবা। শুরু হল বাঘে-মানুষে প্রবল যুদ্ধ। বইঠা, কুড়ুল, খুন্তি, থালা-বাটি হাতের কাছে যা ছিল দমাদ্দম পড়তে শুরু করল বাঘের উপর। কিন্তু কী মরিয়া বাঘটা! কিছুতেই শিকার ছাড়বে না।

শেষপর্যন্ত অবশ্য নবীনরাই জিতল। নুরচাচার কুড়ুলের একটি মোক্ষম কোপ গিয়ে পড়ল বাঘের বাঁ-কানের উপর। ভয়ানক আর্তনাদ করে বাঘটা ছেড়ে দিয়েছিল বাবাকে। কিন্তু রণে ভঙ্গ দেওয়ার আগে বিরাশিসিক্কার একটি থাবা ছুড়েছিল সে। শালতিতে উঠতে পারলেও সেই থাবাতেই

গুরুতর জখম হয় বাবা। পাঁজর বেরিয়ে এসেছিল তার। ফিনকি দিয়ে কী রক্ত! হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাবাকে আর বাঁচানো যায়নি। ক্ষত বিষিয়ে উঠে তিনদিনের মাথায় চলে গিয়েছিল সে। বাঘটাকে ভোলেনি নবীন। জঙ্গলে গেলেই চোখ-কান খোলা রাখে সে। তক্কে-তক্কে থাকে। কোনোদিন যদি কানকাটা জানোয়ারটাকে বাগে পায় সে। শোধ নেবে বাবার মৃত্যুর! লোকে শুনে হাসে। বাঘের উপর বদলা! কী যে ভাবিস নবীন তুই। আসলে মনে-মনে সেও জানে ব্যাপারটা সম্ভব নয় হয়তো। কিন্তু, তবুও আশা ছাড়ে না। দা, বল্লম, কুড়ুল, এমনকী, ধারালো ছুরিকাঁচিও সঙ্গে নিয়ে ঘোরে সে। তবে আজ তার সঙ্গে বিশেষ অস্ত্র নেই। মৌচাকের চিন্তায় ভুলেছে সব।

কেবলমাত্র কাঁচিখানাই সঙ্গে আছে। তেমন বিপদে পড়লে সত্যি মুশকিল। অবশ্য বড়ো-হাত কাঁচি। ছুরির মতোও ব্যবহার করা যায়।

ডান দিক বাঁ-দিক করে কাদাখালির জঙ্গালে পৌঁছোতে একটু বেলাই করে ফেলল সে। যদিও রোদের তেজ তো নেই-ই। বরং আকাশটা থম হয়ে আছে কেমন। গুড়গুড় শব্দও উঠছে থেকে থেকে। একটু চিন্তিত হল নবীন। অসময়ে ঝড়বাদল না-হয়।

গন্তব্যে পৌঁছে ডিঙি ভেড়াল নবীন। গামছা দিয়ে কোমরে বেঁধে নিল কাঁচিটা। নরম এঁটেল মাটিতে বাঁশের খোঁট ঠুসে ডিঙিটা বাঁধল রশি দিয়ে। খেয়াল হল, মুখোশ নিতে ভুলেছে। বাঘকে বোকা বানাতে মউলি বা কাঠুরেরা বাঘের মুখ আঁকা মুখোশ পরে নেয়। একটা পিছনে। নাঃ, বড়ো তাড়াহুড়ো করেছে সে। ধোঁয়ার সরঞ্জামও আনেনি। অবশ্য এটা সে সব-সময় সঙ্গে রাখে না। আসলে মৌমাছি হটাতে ধোঁয়া লাগে না নবীনের। দেখবার মতো হাতের কাজ তার। অদ্ভুত দক্ষতায় কেবল আঙুল দিয়েই একটা-একটা করে মৌমাছি সরিয়ে চাক পরিষ্কার করতে পারে সে। এ কাজে দরকার অটল ধৈর্যের। আর নিবিড় নিষ্ঠার। বনবিবির দয়ায় নবীন তা অর্জন করেছে।

খালের এধারে হলদে-সবুজ হেঁতালের বন। এর মধ্যেই মউলিদের পায়ে-চলা শুঁড়িপথ। পথের মুখে এসে একটু থমকাল নবীন। কোমরের কাঁচিতে ডান হাতটা রাখল একটু। একলা মানুষখেকোদের ডেরায় ঢুকছে! বুক ঢিপঢিপ একটু করবে বই কী। তা ছাড়া আবহাওয়াটা সুবিধের নয়। দমকা বাতাস বইছে খুব। আকাশটাও গোলমেলে। নাঃ! মনকে বোঝাল নবীন। ভয় পেলে চলে না। মৌচাকটা তার চাই। অত টাকা। বিনা কষ্টে কেষ্ট মেলে নাকি!

কিন্তু কপাল তার সত্যিই মন্দ আজ। চাকটা কোথায় ঠিক নজর করেছিল মনে করতে পারল না সে। ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল বেমক্কা। তবুও গাছে চড়ল নবীন। মগডালে উঠে যদি চাকটা নজরে আসে কোথাও। কিন্তু চাক সে দেখতে তো পেলই না, বরং গুড়ুম করে আচমকা এমন একটা আওয়াজ হল। চমকে গিয়ে পড়েই যাচ্ছিল গাছ থেকে, পরক্ষণেই টিটি-ট্যাঁট্যাঁ করে কোত্থেকে সব পাখির দল চেঁচিয়ে উঠে উড়তে শুরু করে দিল মাথার উপর।

বুকটা ধপ করে উঠল নবীনের। এই আওয়াজ সে চেনে। বন্দুকের গুলির আওয়াজ। বনরক্ষীরা মাঝে-মধ্যে গুলিটুলি ছোড়ে বটে, কিন্তু কেন জানি তার মন অন্য কথা বলছিল। নিতাই সামন্তর কাজ না তো! শহুরে বাবুদের নিয়ে ঘোরা মানেই যত সমস্ত কুকর্ম করা। পাখি শিকার। হরিণ শিকার। কে জানে আরও কত কী!

কী মনে করে তরতরিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল নবীন। হড়কে-হড়কে কাদামাটি পেরিয়ে বাঁশের খোঁট তুলে নিল মাটি থেকে। চাক উপড়ে কাজ নেই আর তার। নিতাই সামন্তর মতো লোকের সঙ্গে কোনওরকম কারবারে যাবে না সে।

ইচ্ছে ছিল বগনাখালির দিকে যাওয়ার। সেখানে এক দঙ্গাল কাঁঠালগাছ দেখে এসেছে সে।

কাঠাঁল হয়েছে কিছু। গুঁড়ি থেকে মগডাল পর্যন্ত ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল। পাকতে দেরি আছে। সব এঁচড়। দু-চারটে ছিঁড়তে পারলে অন্তত ক-টা দিনের চিন্তা থাকে না। মাংসের মতোই রান্না হবে।

কিন্তু আজ বুঝি উপরওয়ালার সবেতেই আপত্তি। বৃষ্টির বেগ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ডিঙি বাইবে কী, নজরই চলে না যে। সব ঝাপসা। ডিঙির মধ্যিখানে দু-হাত মতো ছই করে নিয়েছিল নবীন। মাঝনদীতে ডিঙি রেখে সেই ছইয়ের ভিতর গুটিসুটি বসে রইল সে।

একটানা বৃষ্টি দেখতে-দেখতে একসময় বুঝি ঝিম এসে গিয়েছিল তার। নৌকোটা হঠাৎ জোর দুলে ওঠায় চোখ খুলল সে। কে যেন চড়ে বসেছে ডিঙিতে। প্রথমবার ঠাহর করতে পারল না নবীন। কিন্তু পরক্ষণেই আরোহীকে চিনতে পেরে হৃৎপিণ্ডটা এক লাফে গলায় উঠে এল তার।

কী ভয়ংকর দৃশ্য! এ কী দেখছে সে! বারকয়েক চোখ কচলে নিল নবীন। ক-হাত তফাতের প্রাণীটিকে চিনতেও কোনো অসুবিধে হয় না। খোদ দক্ষিণরায়ের বাহন, সোঁদরবনের ত্রাস!

কিন্তু সত্যি ত্রাস কী? বাঘটার আচরণে সেরকম কিছু দেখছে না কিন্তু নবীন। বরং বড়ো ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগছে যেন জীবটিকে। গলায় বনরক্ষীদের যন্তর দেওয়া মালা লাগানো। মানে বাঘটিকে ধরা হয়েছিল কখনও। মালা না-কলার কী যেন বলে, ঝুলিয়ে দিয়েছে নিতাই সামন্তরা। এতে নাকি বাঘের গতিবিধি ঠাহর করা যায়। কলারের একটা দিক কিছুটা ছিঁড়ে গিয়েছে। বাঘটাই হয়তো গাছেটাছে ঘষে কলারটা খোলার চেষ্টা করেছিল। নবীনের মন হল, জিনিসটা অকেজো হয়ে গেলেই ভালো। কারো নজরদারির মধ্যে স্বাধীনভাবে থাকা যায় নাকি!

বাঘটা হামাগুড়ি দিয়ে সোজা ছইয়ের দিকে এগিয়ে এল এবার। পেল্লায় চেহারা। শীর্ণ হলে কী হবে, আকারে তো কম না। অন্তত দশ-বারো হাত তো হবেই। দেহের ভারে নৌকো যা দুলছে, ডুবে না যায়! নবীন টের পেল তার হাঁটু দুটো কাঁপছে থরথর করে। বনবিবিকে স্মরণ করল সে। বাঘের চোখে সেও চেয়ে রইল অপলক।

শেষে ধীরে-ধীরে গলুইয়ের দিকে পিছোতে লাগল নবীন। পায়ে কীসের ধাতব স্পর্শ? কাঁচিটা। একটু হলেও মনে বল পেল সে। বাঘের চোখ থেকে চোখ না-সরিয়ে একটু ঝুঁকে কাঁচিটা উঠিয়ে নিল হাতে। আর ঠিক তখনই লক্ষ করল, বাঘটার বাঁ-দিকের কানের কিছুটা অংশ নেই। কাটা। আরও বড়ো কথা, বাঘটার পিঠেও একটা ক্ষতচিহ্ন। এটা কিন্তু কানের মতো পুরোনো নয়, বরং রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে।

কিন্তু সে যা হোক, বাঘের কান কাটা দেখে নবীনের গোটা শরীরটা কামারশালার আগুনের মতো জ্বলে উঠল হঠাৎ। এই সেই বাঘ নয়তো? সাত বচ্ছর আগে যে তার বাবার জীবনটা ছিনিয়ে নিয়েছিল!

এই দিনটির জন্যে কতদিন অপেক্ষা করে থেকেছে নবীন। বনবিবির কী অদ্ভুত মতি! মানুষখেকো জন্তুটি আজ তারই ডিঙি নৌকোয় নিজের থেকে উঠে এসেছে! আহত হয়ে তার কাছেই আশ্রয়প্রার্থী!

গলুইয়ে বসে পড়ল নবীন। বৃষ্টি একটু ধরেছে। লালচে হয়ে আছে আকাশ। ডিঙিটা আপন খেয়ালে চলেছে ভাসতে ভাসতে। দূরে খালটার বাঁকে মনে হল নিতাই সামন্তর ভুটভুটি। বুকটা একটু দুরদুরিয়ে উঠল নবীনের। সত্যি বলতে বনের এ প্রান্তে আসার অনুমতি তারও নেই। বনরক্ষীরা দেখলেই জরিমানা চাইবে। জরিমানা মানে নগদ টাকা। যা থাকে কপালে, সাহসে ভর করে বইঠা ধরল নবীন। চোখের পলকে সামনে বাঁকটায় ঢুকিয়ে ফেলল ডিঙিটাকে। এদিক দিয়ে ঘুরপথ আছে। ভুটভুটি আসতে পারবে না। আটকে যাবে চড়ায়।

কিন্তু তার অনুমান কিছুটা হলেও ভুল। একটুক্ষণের মধ্যেই ভুটভুটিটা বাঁকের মুখে চলে এল। ঢুকল না অবশ্য। কিন্তু নবীন স্পষ্ট শুনল নিতাই সামন্ত চিৎকার করে কীসব বলছে যেন। মনে

হল, তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। আশ্চর্য হল নবীন। তার নৌকোয় যে বাঘ আছে, সে কথাই যেন বলছে নিতাই সামন্ত। কিন্তু বুঝল কী করে? দূরবিন চোখে দিয়ে?

বাঘটার দিকে তাকাল নবীন। কী অবাক দৃশ্য! চুপটি করে বসে আছে হাঁটু ভেঙে। কয়েক হাত তফাতে আস্ত একটা মানুষ দেখেও মন নেই শিকারে। জিভ বের করে পিঠের ক্ষতটা চাটার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো খেয়াল হল নবীনের। ওই যন্ত্র না-কলটার জন্যেই নিতাই সামন্তরা বাঘকে ঠাহর করতে পারছে না তো? বলা যায় না। বন্দুকের গুলির যে আওয়াজ সে শুনেছিল, হতে পারে সেটা ওই ভুটভুটির বাবুরাই করেছে। এবং এও হতে পারে, বাঘটা ওদের গুলিতেই আহত হয়েছে!

সর্বনাশ! কথাটা সে শুনেছিল বটে। বনরক্ষীদেরই একদল টাকার লোভে নানান কুকর্ম করছে। বন কেটে ফেলছে। বাঘের গলার সর্বনেশে ওই মালাটাই যত নষ্টের মূল। ওটা দিয়েই বাঘের হদিশ অনায়াসে টের পেয়ে যাচ্ছে বদমাশগুলো। পরিশ্রম কমে যাচ্ছে চোরাশিকারিদের।

কী অন্যায়! কী অন্যায়! এভাবে বাঘগুলোকে মেরে ফেলছে এরা! ছিঃ ছিঃ! আসলে এইসব লোকগুলোর জন্যেই বাঘ এমন আচরণ করছে। মানুষের দিকে নজর দিচ্ছে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত স্কুলে পড়েছে নবীন। মাস্টারমশাই বলতেন, ইচ্ছেমতো বন কেটে ফেলছে মানুষ। বাঘের খাবারের রসদে টান পড়ছে। থাকার জায়গার অভাব ঘটছে। এমনকী, প্রয়োজনমতো মিষ্টি জলও নাকি সে পাচ্ছে না। লবণজলে ভরে যাচ্ছে চারদিক। ঠিক কথা। চিন্তা করল নবীন। বাঘের আর দোষ কী! তা ছাড়া সত্যি বলতে সে নিজেই তো আস্ত মুরগি কিনে খাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। সেও তো প্রাণীহত্যা। মানুষ বলে দোষ নেই তাতে?

কী মনে করে তিরবেগে বইঠা বেয়ে আরও দূরে সরে এল নবীন। এ জঞ্জাল সে চেনে তার হাতের চেটোর মতো। এনালা-ওনালা করে ভুটভুটির নজরের আড়ালে চলে এল সে।

দক্ষিণরায়ের বাহন চার-পা গুটিয়ে মা ষষ্টির বাহনের মতোই বসেছিল একদম। নবীনকে দেখল পিটপিট করে। ইচ্ছে করলেই বাঘটা থাবা বসাতে পারে তার মুখে। কিংবা কামড়ে ধরতে পারে তার গলা। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। বাঘটা দুলতে লাগল একটু-একটু। যা থাকে কপালে, নবীন এক ঝটকায় গলার কলারটা কেটে ফেলল কাঁচি দিয়ে।

বাঘটা কী বুঝল কে জানে। কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল তেমনি। খসে-পড়া কলারটার দিকে তাকাল একটু। লেজটা উঁচু করল। আড়মোড়া ভাঙল। তারপর একেবারে ইচ্ছে নেই এমনি ভাব করে উঠে দাঁড়াল আস্তে-আস্তে। তারপর বাধ্য কুকুরের মতো গুটিগুটি পায়ে নেমে পড়ল নৌকো থেকে। ধীরে-ধীরে ঢুকে পড়ল সবুজ গাছের ভিড়ে। কলারটা পায়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। খুলে গিয়ে কাদার মধ্যেই পড়ে থাকল।

নবীন আর দেরি করল না। সব শক্তি এক করে ডিঙি ঘুরিয়ে ফেলল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই

এসে পড়ল বড়ো খালে। আশ্চর্য! সেখানে তখনও নিতাই সামন্তর ভুটভুটি দাঁড়িয়ে আছে ইঞ্জিন বন্ধ করে। রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বাবুরা সব। একজনের হাতে বন্দুকও রেয়েছে যেন।

নবীনের ইচ্ছে হল লোকগুলোর কুকীর্তির কথা বলে প্রতিবাদ করতে হলে জায়গামতো করবে। বলল, 'তা ঠিক বলেছ বটে। তবে সে তো পালিয়েছে।'

'কোথায়?' ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল নিতাই সামন্ত।

'কেন তোমরা জানো না?' পালটা প্রশ্ন করল নবীন। হাত দেখিয়ে বলল, 'ওই দিকে গিয়েছে।'

'সে কী? ও তো সামসেরপুরের দিক। ও-পথে বাংলাদেশ পড়ে। ভারত না। ঢোকা ঠিক নয়। সীমানা বাঁধা।'

'জানি তো,' বলল নবীন, 'কিন্তু বাঘটা তো জানে না। ওর কাছে সবই জঙ্গল। বাধা নেই কোনো।'

আর কথা না। ডিঙি ছেড়ে দিল নবীন। আজ তার মনে খুব সুখ। জীবন নেওয়ার চাইতে জীবন বাঁচানোয় যে এত আনন্দ আছে জানত না সে!

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

সেয়ানে সেয়ানে

হনহন করে হাঁটছে মাল্যধর। কোমরে তার দু-খানা কাটারি। একটা নতুন, আরেকটা পুরোনো। একটা ধার দিতে নিয়ে এসেছিল মংলার হাটে রূপেন মিস্তিরির কাছে। অন্যটা নতুন কিনেছে। পিঠের বস্তায় আনাজপাতি আছে কিছু। ডান হাতে প্রায় আড়াই কেজির ভেটকি একটা। মালপত্তরের ভারে কুঁজো হয়ে গিয়েও ছোটতে কমতি নেই। মংলার হাটটা কম বড়ো নয়। লম্বায় কেন-না মাইলটাক হবে। মাল্যধর ছোটে আর হাঁফাতে হাঁফাতে নিজেকেই উৎসাহ দেয়, চালিয়ে চল্ বাপ, চালিয়ে চল্, ভদ্রার ঘাট ওই দেখা যায়, আর দেরি নাই।

অবশ্য অত ছুটেও শেষমেষ লাভ হল না কোনো। নদীর ধারে পৌঁছে টিকিট ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কী দাঁড়ায়নি, ঘাটে ভটভট শব্দ উঠল। টিকেটবাবু তার বাড়িয়ে ধরা এক টাকার কয়েনটা ঠেলে দিয়ে বললেন, 'আর টিকেটে কী হবে? শেষ ফেরিটা তো গেল। এখন যান, ঘাটে গিয়া বসেন, যদি কপালগুণে কিছুমিছু পেয়ে যান।'

মাল্যধর হাতে-ধরা মস্তবড়ো মাছটার দিকে করুণ চোখে চাইল একবার। অতবড়ো মাছটা, নিতান্তই সস্তায় পেয়ে গিয়েছিল। গরমের রাত। বেশি দেরি হলে যদি গন্ধ হয়ে যায়, মালতি কী আর আস্ত রাখবে তাকে! রাত পোহালে জামাইষষ্ঠী। বাড়িতে মেয়ে-জামাই গমগম করবে সেই সক্কাল থেকে। ঘাটে বসে বসে নিজেই নিজের কপাল চাপড়ায় মাল্যধর। কেন মরতে বিকেলবেলা রাজেন কপালির নিশানাবাজি খেলার আড্ডায় গিয়ে জমেছিল? সত্তর টাকা বারো আনা লাভ হয়েছে বটে, কিন্তু এখন এই যে বিপদ হল তার কী হবে! হে মা কংকালেশ্বরী, স-পাঁচ আনার

বাতাসাভোগ চড়াব মা, এ বিপদে তরিয়ে দাও—

তা মা কংকালেশ্বরীও নিজেরটা ভালোই বোঝেন দেখা গেল। স-পাঁচ আনা থেকে মানত চড়তে চড়তে স-পাঁচ সিকেতে গিয়ে পৌঁছুতে তবে দেখা গেল, গাংপুরের দিক থেকে চার দাঁড়ের একটা নৌকো উজিয়ে আসছে মংলার হাটের ঘাটে। নৌকোর মাথায় রঙিন হেরিকেন দেখেই মাল্যধর জিগির দিয়ে উঠল, 'জয় মা। দয়া তবে হল তোর!' এ দিগরে রাতেরবেলায় রঙিন কাচের হেরিকেন লাগিয়ে নবাবপুরের হেমবাবুর কাছারির নৌকো ছাড়া আর কোনো নৌকো ঘুরবে না। আর নবাবপুর মানেই ভদ্রার ওপার!

গাংপুর আর এই মংলার হাটের ঘাট এই দুইয়েরই ইজারা নেওয়া আছে হেমবাবুদের। ছোটো গোমস্তা রামচন্দ্র ঘোষ টিকেটবাবুর ঘরে গিয়ে দিনের হিসেবপত্র বুঝে নিচ্ছেন যতক্ষণে মাল্যধর ততক্ষণে নৌকোয় গিয়ে জুত করে বসে মাঝির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। সাকিন কোথা, ঘরে ছেলে-মেয়ে ক-টি, এমন সব সাতসতেরো কথা। আধঘণ্টাটাক বাদে ঘোষবাবু ফিরে এসে তার দিকে দেখে বললেন, 'কে ও, বাউলে যে? তা এত রাত্রে মংলার ঘাটে কী মনে করে?'

আসলে মাল্যধরকে এ দিগরে সকলেই চেনে। সাতপুরুষের বাউলে ওরা। বাঘবন্ধনের নিজস্ব মন্ত্র আছে নাকি মাল্যধরের পরিবারে। সেই মন্ত্রের জোর নিয়ে বাদা আর আবাদে অনেক গল্পকথা চালু আছে। লোকে পাছে জেনে যায় সেই ভয়ে কাগজে পর্যন্ত লেখে না। বাপ মরবার সময় ছেলেকে কানে কানে দিয়ে যায়। উপস্থিত মাল্যধর সেই মন্ত্রের মালিক।

আজকাল অবশ্য মন্ত্রতন্ত্রে অনেকের বিশ্বাস নেই। তবে বিশ্বাস থাক আর-না-থাক, নৌকো নিয়ে বাদাবনে ঢুকতে গেলে বাউলে হিসেবে সঙ্গে যাবার জন্য এ এলাকায় মাল্যধরের বেজায় চাহিদা। আজ অবধি সে যে নৌকোর দলে গিয়েছে তাতে একজন মানুষেরও বলি নিতে পারেননি বাবা দক্ষিণরায়। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই এক ডাকে বলে, গোটা বাদা এলাকায় বাঘের মতিগতি, স্বভাব-চরিত্র মাল্যধরের মতো ভালো আর কেউ বোঝে না।

তা মাল্যধরের মুখে সব কথা শুনে ঘোষবাবু বললেন, 'ওপার অব্দি নয় পার হলে, কিন্তু তারপর এত রাতে চার মাইল পথ পেরিয়ে হার্মাদিচক পৌঁছুবে কী করে? পথে কাঁটাবাড়িতে খাল পেরোতে হবে। ছিটে জঙ্গলও পড়বে বেশ খানিকটা। তার চেয়ে বলি কী, আমার সঙ্গে নবাবপুরের কাছারিতে চলো। সেখেনে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে না হয়...'

মাল্যধর কাতর গলায় বলল, 'রাতের বেলা জঙ্গলের রাস্তায় তা-ও গুরুবলে আর আপনাদের আশীর্বাদে প্রাণটা হয়তো বাঁচাতে পারব ঘোষবাবু, কিন্তু এই মাছ নিয়ে আজ রাতে ঘরে না-পৌঁছুলে আমার রায়বাঘিনিটির হাতে যে নিতান্তই বেঘোরে প্রাণটা যাবে। কাল রাত না-পোহাতে মেয়ে-জামাই আসবে। এমনিতে মাছের তো অভাব নেই, কিন্তু ঘরের ওনার হুকুম হয়েছে, বড়ো একখানা ভেটকি তেনার চাই-ই। আপনি ভাববেন না। ও আমি ঠিক চলে যাব।'

নবাবপুরের ঘাটে পৌঁছে মাল্যধর জলের ধারে উবু হয়ে বসে ভালো করে ধুলোপড়ার বন্ধন

দিয়ে নিল সারা গায়ে। ফিনফিনে ধুলো। হাওয়ায় ছুড়লে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে মন্ত্রের মিশেল দিলে সেই হয়ে যাবে মহাশক্তিধর বাঘতাড়া বর্ম। তোমার-আমার চোখে পড়বে না, কিন্তু বাঘ দেখবে, মানুষ কোথা? ধুলো আর হাওয়ার ঘূর্ণি একটা যেন হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা বেয়ে!

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তার কীর্তিকলাপ দেখে ঘোষবাবু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নিজের পথ ধরলেন। মাল্যধরও অমনি উঠে দাঁড়িয়ে সতর্ক পায়ে হাঁটা দিল। বাপের কাছে চিরকাল এইসব ধুলোপড়া, বাঘতাড়া বর্মের কথা শুনে এলেও মাল্যধরের অবশ্য তাতে খুব একটা বিশ্বাস হয় না। বাঘ যে কী দেখে-না-দেখে সে কথা কেউ কখনও বাঘকে জিজ্ঞেস করে দেখেছে নাকি?

তবে কিনা, ছোটোবেলার অভ্যেস। মনে বল তো আসে একটা! তা ছাড়া লোকজনের সামনে একটা ভড়ং-ও রাখবার দরকার। নইলে পাঁচটা গ্রামের লোকে মানবে কেন? এই যে বাঘবন্ধন দেখে গেল আজ ঘোষবাবু, সে এখন সাতকাহন করে সে কথা পাঁচটা জায়গায় রটাবে। তাতে মাল্যধরেরই লাভ।

মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা তত্ত্বে মাল্যধর বিশ্বাস রাখে। তা হল সাবধানের মার নেই। বাদাবনের বড়োমেঞার স্বভাবচরিত্র সে গুলে খেয়েছে। তাই তেনার মুল্লুকে পথ চলতে গেলে কখন যে কী করতে হবে সেই কাণ্ডজ্ঞানটাও তার খুব তুখোড়। আর এর জোরেই যে তার বাউলে হিসেবে এত সুনাম সেটা মাল্যধর ভালোই জানে।

নবাবপুরের চৌহদ্দি ছাড়াতে চারদিক একেবারে শুনশান হয়ে এল। খানিক দূর অবধি পথের দু-পাশে চাষের জমি দেখা যাচ্ছিল, তারপর তা-ও শেষ হয়ে গিয়ে ছিটে জঙ্গালের রাজত্ব শুরু হল। পথে একপাশে সে জঙ্গাল একেবারে লাগোয়া। অন্যপাশে একটা খাল চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। ভাটার সময়ে খালে জল নেই। হালকা চাঁদের আলোয় ছেয়ে রঙের কাদা দেখা যায় শুধু তার বুকে। সেইদিকে চোখ ফেলে আরও তাড়াতাড়ি পা চালাল মাল্যধর। জোয়ার একবার শুরু হয়ে গেলে ওই কাদার ওপরে ভদ্রার জল এসে ঢুকবে তিন হাত উঁচু হয়ে। খাল পেরোনো দুষ্কর হয়ে যাবে তাহলে।

কাঁটাবাড়ি পৌঁছে খালটা ডানদিকে ঘুরে দক্ষিণমুখো হল। রাস্তা এসে শেষ হয়েছে খালের পাড়ে। থেমে দাঁড়িয়ে মাল্যধর বস্তাটাকে পিঠে বেঁধে নিল উঁচু করে। তারপর মাছটাকে দু-হাতে মাথার ওপর ধরে খালের জমিতে পা দিল। থকথকে আঠালো কাদা। ভালোবেসে একবার গায়ে-পায়ে জড়িয়ে ধরলে সহজে ছাড়ে না। লোকে তাই খালের কাদাকে প্রেমকর্দমে বলে এখানে। তা সেই প্রেমকর্দমে প্রায় হাঁটুর ওপর অবধি ডুবে গিয়ে পা টেনে টেনে এগোচ্ছে মাল্যধর, এমন সময় সামনের জঙ্গালে একটা আওয়াজ পেয়ে কান খাড়া করল সে। ফেউ ডাকছে। একবার, দু-বার, তিনবার—প্রতিবারেই ডাকটা আরও একটুখানি এগিয়ে আসছিল খালের দিকে। শেষ ডাকটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খালের উলটোদিকের জঙ্গালের সুঁদুরি গাছেদের মাথায় হুপহাপ শব্দ তুলে একদল বাঁদর বেজায় লাফঝাঁপ শুরু করে দিতে মাল্যধর প্রমাদ গুনল। এগুলো সবই বাঘ

আসবার সংকেত। সামনে এগোনো বন্ধ করে দিয়ে মাঝখালে মাথার ওপর মাছ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এই এক হাঁটু প্রেমকর্দমে বাঘ আসবে না। কাদায় ডুবে গেলে তার জারিজুরি যে সব শেষ, একথা বড়োমেঞা ভালোই জানে।

প্রায় আধঘণ্টাটাক ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর জঙ্গল একটু ঠান্ডা হলে মাল্যধর আস্তে আস্তে ওপারে গিয়ে উঠল। নতুন কাটারিটা এইবার সে কোমর থেকে খুলে একহাতে নিয়েছে। জানে, বাঘের সামনে ও কিছুই নয়, তবু মনে বল থাকে একটা। খালের পাড় ছেড়ে উঠেই কয়েকটা ছোটো ছোটো তবলাগাছ আর হেঁতালের ঝোপের সার। তার পেছনদিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ফটফটে চাঁদের আলো পড়েছে। সেই আলোয় নরম মাটির ওপর বাঘের পায়ের এলোমেলো খোঁচ চোখে পড়ে। একেবারে সদ্য কাঁচা। ভালো করে থাবার ছাপগুলো নজর করে দেখল সে। বিশাল বড়ো আর পুরোনো বাঘ। পেছনের ডানদিকের পায়ের খোঁচ হালকা আর একটু এতোলবেতোল। ও পা খানায় চোট আছে বড়োমেঞার। এক মুহূর্তের জন্য গা হিম হয়ে গেল মাল্যধরের। চোট খাওয়া বুড়ো বাঘ! এরাই মানুষখেকো হয় বেশি। মানুষের সঙ্গে টক্কর দিতে হয় বলে মাথায় হাজারো ফন্দি খেলে এদের। এত বছর ধরে বাউলেগিরি করে এসে এদের কায়দাকানুন চিনতে আর বাকি নেই তার। নিশ্চয় কাছেপিঠেই কোথাও লুকিয়ে আছে। চলে যাবার ভান করে তাকে পাড়ে টেনে এনেছে। এবার বেড়ালে যেমন ইঁদুর নিয়ে শিকারের আগে খেলা করে তেমনি তাকে নিয়ে প্রথমে লুকোচুরি খেলবে খানিক। তারপর শিকার যখন তার পছন্দসই জায়গায় এসে পড়বে তখন এক লাফে এসে ধরবে। এই অবস্থায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে আর রক্ষা নেই। ফিসফিস করে মন্ত্র পড়তে শুরু করল মাল্যধর। হেই মা বনবিবি। এযাত্রা সন্তানকে তরিয়ে দাও মা!

তা মন্ত্রের জোরেই হোক কিংবা ধুলোপড়ার শক্তিতেই হোক, বাকি মাইলটাক পথ বিশেষ কোনো উৎপাত হল না আর। গোটা পথটা খুব আস্তে, আস্তে, সাবধানে হেঁটেছে মাল্যধর। কাঁটাবাড়ির খাল আগে ছিল বাঁয়ের হাতে, এখন তা তার পাশাপাশি ডানদিকে চলেছে। পথের একেবারে পাশ থেকে কেওড়া আর তবলার জঙ্গলে ঢাকা ঢালু পাড় নেমে গেছে খালের বুকে। খালেও এতক্ষণে জোয়ার এসে গেছে। জল ঢুকছে কলকল করে। তার গায়ে চাঁদের আলো পড়ে ঝকঝক করছে। তার ভরা শরীর দেখে কে বলবে খানিক আগে কাদামাখা একখানা শুকনো নর্দমার মতো হয়ে পড়ে ছিল সে। বাদা অঞ্চলের নদীনালার এই মজা। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায় তারা। তা জলভরা খালের ঢালে ঢালে বাঘ হাঁটতে চায় না সচরাচর। ওপাশ থেকে কাজেকাজেই বিপদের ভয় কম। কিন্তু ভয় হল বাঁয়ের দিকের ছিটে জঙ্গলকে। সমতল, ছড়ানো জমির ওপর হেঁতালের ঝোপ ঘন হয়ে রয়েছে ওদিকটায়। বড়োমেঞার লুকোবার প্রিয় জায়গা। বাউলে এক পা দু-পা হেঁটে যায়, আর থেমে থেমে দেখে নেয় বাঁদিকটাকে।

এমনি করে চলতে চলতে একসময় দূরে হার্মাদি গড় নজরে আসতে হাঁফ ছাড়ল মাল্যধর। বাড়ি এসে গেছে। আর ভয় নেই এবারে। হার্মাদি গড়-এ কোনো হার্মাদটার্মাদের বাস নেই অবশ্য। ও চিরটাকালই অমনি ফাঁকা পড়ে থাকে। ভেতরে জায়গায় জায়গায় উঁচু উঁচু ভিটে আর ইটের পাঁজা থেকে বোঝা যায় অনেকগুলো ঘরবাড়ি ছিল এককালে। এখন অবশ্য সেসব কিছু আর নেই। থাকবার মধ্যে আছে শুধু গোটা গড় জুড়ে গহীন জঙ্গল। তবে হ্যাঁ। গোটা ভিটেটাকে ঘিরে

জবরদস্ত পাঁচিল একটা আছে। প্রায় হাতছয়েক উঁচু। সিংহদরজার জায়গাটা ভাঙা হা হা করছে। কিন্তু ভিটে ঘিরে তার বাকি অংশটা এতটুকু টসকায়নি। লোকে বলে এ হয়তো এককালে বনের ভেতর হার্মাদ ডাকাতদের লুকোনো ঘাঁটি ছিল। সেজন্যই তার দেয়াল অত মোটা।

অবশ্য গোটা সুন্দরবন জুড়েই অমন অনেক পুরোনো বাড়িঘরের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। সে এক রহস্যময় ব্যাপার। গহীন বনে চলতে চলতে হঠাৎ করেই চোখে পড়বে পোড়ো ভিটের চিহ্ন। ভেতরে গেলে হয়তো দেখা যাবে কেওড়া, গরান, তবলাগাছের পাশাপাশি আম, জাম, কাঁঠালের গাছও হয়ে আছে। এসব মানুষের পোষা গাছ সচরাচর জঙ্গলে নিজে থেকে গজায় না। বোঝা যাবে এককালে সেখানে মানুষের বাস ছিল। কোত্থেকে এসেছে আর কোথায়ই বা গেল তারা কে তার খবর দেবে। লোকে নিজের নিজের মতো গল্প বানিয়ে নেয় ভিটেগুলোকে নিয়ে। এই হার্মাদি গড়ের গল্পটা থেকে তো মাল্যধরের গ্রামের নামটাই লোকের মুখে মুখে হার্মাদিচক হয়ে গেল।

গড়ের সিংদরজার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে এমন সময় হঠাৎ ডাইনের দিকে ঢালের গায়ে মট করে মৃদু একটা শব্দ হল। জঙ্গলে রাতের হাজারো শব্দের মধ্যে মিশে থাকা সে শব্দের সাধারণ মানুষের কাছে কোনো বিশেষত্ব না- থাকলেও বাউলের অভিজ্ঞ কান তাকে অবজ্ঞা করল না। মুহূর্তের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মাল্যধর। পিঠের বস্তা আর হাতের মাছ মাটিতে নামিয়ে রেখেছে। দু-হাতে উঠে এসেছে লম্বা চকচকে দা দু-খানা। কিন্তু না! কোথায় কী! নিঝুম বন। প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। একটা শ্বাস ছেড়ে ফের দা দু-খানা কোমরে গুঁজল সে। তারপর বস্তাটা পিঠে তুলে নিয়ে এক হাতে মাছটা তুলে নেবার জন্য নীচু হয়েছে কী হয়নি, ডাইনের জঙ্গল থেকে একটা বনমুরগি কঁক-কঁক শব্দ তুলে ডানা ঝাপটে উড়ে এসে বাঁ-দিকে জঙ্গলে ঢুকে গেল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট এক হুংকারে থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা জঙ্গল, আর চাঁদের আলোয় হলুদ-কালো বিদ্যুতের একটা ঝলক তুলে বাঁ-দিকের জঙ্গল থেকে যেন উড়ে এল জন্তুটা। চোখের পলকে মাটিতে আছড়ে পড়ে একদিকে গড়িয়ে গেল মাল্যধর। আর পরক্ষণেই দম-দেয়া পুতুলের মতো তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফের। পিঠের বস্তা তার খসে গেছে। একখানা দা-ও ছিটকে পড়েছে পায়ের কাছে। চতুর বাঘ তাকে বোকা বানিয়ে খালের ঢাল ধরেই লুকিয়ে পেছন নিয়েছিল এতক্ষণ। এইবারে সুযোগ বুঝে হামলা করেছে।

অবশিষ্ট দা-খানা হাতে ধরে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বড়োমেঞার চোখে চোখে চাইল। প্রথম ঝাঁপে কাজ না-হতে ভারি রেগে গেছে জন্তুটা। লম্বা জিভটা লকলক করে লালা ছিটোচ্ছে তার। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে যেন। লোম ফুলে উঠেছে গায়ের। গলায় চাপা গরগর শব্দ। মাল্যধরও ততক্ষণে তৈরি। বাঘ দ্বিতীয়বার লাফ দেবার ঠিক মুখটাতে লাগসই করে হাতের দা-খানা ছুড়ে মেরেছে সে। চাঁদের আলোয় একঝলক রুপোলি বিদ্যুতের মতোই উড়ে গিয়ে সেটা মোক্ষম ঘা দিয়েছে মেঞার নাকে।

ঝাঁপের নিশানায় ওতেই খানিক চুক হয়ে গিয়ে থাকবে হয়তো জীবটার। হুড়মুড় করে এসে

পড়ল বটে মাল্যধরের গায়ে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। হাঁ-করা মুণ্ডুটা তাকে কামড়ে ধরবার বদলে একখানা মোক্ষম ঢুঁ মেরেই ক্ষান্ত হল। মাটিতে আছড়ে পড়ল ফের মাল্যধর। বাঘটা এসে পড়েছে তার ঠিক পাশে। হাঁ-মুখটা ফের বাড়িয়ে ধরেছে তার দিকে। কিন্তু কামড়টা বসাবার আগেই হাতের কাছে মাছটা পেয়ে গিয়ে সেটাকে দু-হাতে তুলে নিয়েছে মাল্যধর। তারপর সেটাকে একেবারে ঠেসে গুঁজে দিয়েছে বাঘের হাঁড়ির মতো মুখটার ভেতরে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চিলচিৎকার জুড়ে গালাগাল দিয়ে চলেছে সে বাঘকে। মুখের কষ দিয়ে ফেনা ঝরছে তার, বাঘের চোখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধক ধক করে জ্বলছে দুটো চোখ। বাঘটা একটু থতোমতো খেয়ে গিয়েছিল এহেন আক্রমণে। সেই সুযোগে দ্বিতীয় দা-টা তুলে নিয়ে পাগলের মতো কোপের পর কোপ মারতে শুরু করেছে বাউলে। এইবারে পিছু হটল বাঘ। পিছু ঘুরে উলটোমুখে ছুট দিয়েছে সে। মাছটা তখনও তার মুখে লটকানো। মাল্যধরের তখন মাথায় খুন চেপে গিয়েছে। মাটি থেকে দ্বিতীয় দা-খানাও কুড়িয়ে নিয়ে দু-খানা দা দু-হাতে উঁচিয়ে গালাগাল দিতে দিতে সে-ও ফিরে তাড়া করেছে বড়োমেঞার পেছন পেছন।

বাঘ আর ঘুরে দাঁড়াল না। খানিক ছুটে গড়ের সিংদরজার একেবারে মুখোমুখি পৌঁছে এক লাফে ঢুকে গেল তার ভেতরে। ওদিকে বাউলের চিৎকার আর বাঘের ঘন ঘন গর্জনের শব্দ শুনে গ্রামের লোকজন লাঠিসোঁটা, মশাল-টশাল নিয়ে বের হয়ে এসে দেখে গড়ের সিংদরজার মুখে রক্ত মেখে, দু-হাতে দু-খানা দা নিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে মাল্যধর। লোকজন দেখে বলে, "আমার কিছু হয় নাই হে। এ বড়োমেঞার রক্ত। ব্যাটা আদমখোর ওই গড়ের মধ্যে ঢুকেছে। আমার জামায়ের মুখের মাছটা নিয়ে গেছে। তবে যাবে কোথা? চাদ্দিকে গড়ের পাঁচিল। আর এই দোরে আমি থানা দিয়ে বসেছি। ওর আর ছাড়ান নাই আজ।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে এতক্ষণে সামনে এগিয়ে এল মাল্যধরের শ্বশুর শ্রীদাম। শ্রীদাম এ চত্বরে বেশ মান্যগণ্য লোক। গোটাতিন মাছমারা নৌকো আছে তার। তা ছাড়া ফরেস্ট অফিসের সঙ্গে ভালো দহরম-মহরমও আছে। নামে-বেনামে কাঠ কাটবার গোটা ছয়েক পাস তার হাতে সবসময়েই থাকে। তবে কিনা জামাইয়ের চড়া মেজাজকে তার মতো জাঁহাবাজ ব্যক্তিও কিঞ্চিৎ সমঝে চলে। কাছে এসে মিনমিন করে বলে, 'তা বাবাজি কী বাঘ মারবার ফন্দি আঁটতেছ নাকি? ওতে কিন্তু নিঘঘাৎ হাজতবাস। নতুন রেঞ্জারবাবু কড়া মানুষ। বাঘের গায়ে হাত পড়েছে জানতে পারলে....' কথাটা তার পুরো শেষ হল না আর। তার আগেই বাঘের রক্তমাখা জামাই দা হাতে এমন চোখে ঘুরে চাইল শ্রীদামের দিকে যে সে আর সেখানে দাঁড়াল না। নজরগঞ্জের বিট অফিস এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সেখানে রাতে রাতে খবর পাঠিয়ে দিতে হবে একটা। সে নইলে ট্যাঁটা জামাইকে আটকাবার আর কোনো রাস্তা নেই।

গ্রামের লোকজন ততক্ষণে কাজে লেগে গিয়েছে। গরমের মরসুম। শুকনো কাঠপাতার অভাব নেই চারপাশে। দশ হাতে তাই টেনে এনে তারা ডাঁই করে গড়ের ভাঙা দরজার মুখে রেখে

তাতে আগুন দিয়েছে। লকলকে আগুন উঠেছে দশ হাত উঁচু হয়ে। আগুনের সেই বেড়াজাল পেরিয়ে বাঘ কেন, স্বয়ং দক্ষিণরায়ও বের হয়ে যেতে পারবেন না। সাররাত এ আগুন জ্বলবে এখানে। ভেতরে আটকে থাকুক মানুষখেকো বাঘ। অন্ধকার কাটলে তারপর না-হয় তার একটা গতি করা যাবে'খন।

ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতে বাঘ শিকারের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। লাঠি, টাঙ্গি, কোঁচ, বল্লম, যার যা সাধ্য অস্ত্রশস্ত্র জুটিয়েছে। চাঁদামারীর ট্যাকের জঙ্গালে একটা গরান গাছের খোঁদলে দু-খানা দিশি বন্দুক আর গোটা দশেক গুলি লুকিয়ে রাখা ছিল। একখানা মাল্যধরের আর অন্যখানা তার প্রাণের স্যাঙাত বিশাই মণ্ডলের। মাঝেমধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে হরিণের মাংস খাবার শখ মেটাতে কাজে লাগে। তা বাঘ মারবার উৎসাহে বিশাই শেষরাত্রে ডিঙি নিয়ে চাঁদামারীর ট্যাকে গিয়ে সেই জোড়া বন্দুক বের করে এনেছে।

মাল্যধর একপাশে বসে তেলকাগজে মোড়া তার পুঁটুলিটা যত্ন করে খুলছে এমন সময় খালের দিক থেকে হালকা ভটভট শব্দ উঠল একটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশাই দৌড়ে এসে বলে, 'খুলো না, খুলো না ওস্তাদ। পিটেল আসছে।'

মাল্যধরের ভুরু কুঁচকে উঠল। পিটেল, মানে ফরেস্ট প্যাট্রোল-এর নৌকো! বেআইনি বন্দুক দেখলেই কেড়ে নিয়ে যাবে ঠিক। কিন্তু, খবর পেল কোত্থেকে? এ নিশ্চয় তার শ্বশুরের কাজ! 'বুড়াকে আমি পরে দেখছি দাঁড়াও,' গজগজ করতে করতে তাড়াতাড়ি বন্দুকের পুঁটুলি বেঁধে-ছেদে ফের বিশাইয়ের হাতে তুলে দিল মাল্যধর। গ্রামের অন্যদিকে চাঁদামারীর খাল। তাই বেয়ে সে এখন ফের বন্দুক ফিরিয়ে রেখে আসবে তাদের গোপন আস্তানায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভটভটি এসে লাগল খালের ধারে। জনাচারেক লোক নিয়ে রেঞ্জার মধুবাবু নিজেই চলে এসেছেন খবর পেয়ে। জলের ওপর ঝুঁকে থাকা কেওড়ার শেকড় আর হেঁদোর ঝোপ ধরে ধরে সাবধানে উঠতে উঠতেই ওপর থেকে উঁকি দিয়ে থাকা মাল্যধরকে দেখে হাঁক দিয়েছেন, 'এই যে মাল্যধর। বাঘ ধরেছ শুনে নিজেই চলে এলাম হে!'

তারকাঁটার একখানা বান্ডিল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন মধুবাবু। ওপরে উঠে এসে সঙ্গের লোকগুলোকে সিংহদরজায় তারবেড়ো লাগাবার কাজে লাগিয়ে দিয়ে মাল্যধরকে নিয়ে পড়লেন তিনি, 'ঠিক কী হয়েছিল কাল রাত্রে ভেঙে বলো দেখি বাউলে?' মাল্যধর সব কথা খুলে বলে শেষে বলে, 'এ আদমখোর বাঘ হুজুর। পায়ে চোট আছে। দৌড়ে হরিণ ধরার সাধ্য হবে না এর। একে ছাড়ান দিলে আগামিতে দশটা মানুষের জান যাবে।'

মধুবাবু হেসে বললেন, 'এ এলাকায় গত তিন বছর বাঘে কোনো মানুষ নেয়নি। কাজেই এ বাঘটাও হয়তো এখনও মানুষের সোয়াদ পায়নি। তবে হ্যাঁ, চোট পাওয়া পুরোনো বাঘ। মানুষখেকো হয়ে যেতে কতক্ষণ! সাবধান তো হতেই হবে।'

চারপাশে ছড়িয়ে থাকা জঙ্গালের দিকে চোখ ফেলে মাল্যধর বলল, 'কিন্তু বাবু, এ যদি ভিন

এলাকা থেকে তাড়া খেয়ে সদ্য সদ্য পালিয়ে আসা-মানুষখেকো হয়, তবে? আপনার আপিসের খাতায় তো তার হিসাব থাকবে না।'

'হতে পারে', মাথা নাড়লেন মধুবাবু, 'তবে সেসব ভাববার আগে বাঘটাকে একবার সরেজমিনে দেখবার চেষ্টা তো করা যাক! কী বলো?'

কী আর করা! নিমরাজি হয়ে ঘাড় নাড়ল মাল্যধর। শ্রীমন্তের ওপর রাগে তখন তার গা কশকশ করছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে, পায়ে আধলা ইঁট বাঁধা একটা পুরুষ্টু ছাগলকে তারকাঁটার বেড়া অল্প ফাঁক করে গড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বুদ্ধিটা মধুবাবুর। ওতে ছাগল চলেফিরে বেড়াতে পারবে বটে কিন্তু ছুটে পালাবার জো থাকবে না তার। বাঘটার পেটে খিদে ছিল। রাতের শিকার তার ফসকে গেছে। মিনিট দশেকের মধ্যে ছাগলের পরিত্রাহি চিৎকারকে ছাপিয়ে উঠল বাঘের গম্ভীর গর্জন। তারপর ফের সব চুপচাপ।

তারকাঁটার বেড়া ফাঁক করে এইবার প্রথমে ভেতরে পা দিল মাল্যধর। সতর্ক চোখে চারদিক দেখে নিয়ে তারপর পেছন ঘুরে ইশারা করতে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে এলেন মধুবাবু। তাঁর হাতে বিচিত্রদর্শন একটি হাওয়া বন্দুক। তার মাথায় নিদালি ওষুধের ছুঁচওয়ালা কার্তুজ। মাল্যধরের হাতে মধুবাবুর রাইফেলটা। মধুবাবু ওনার ঘুমপাড়ানি বন্দুক দিয়েই যা করবার করবেন, তবে নিতান্তই যদি প্রাণসংশয় হয় তবেই রাইফেল চালাবার হুকুম আছে তার ওপরে। ভারি যন্ত্র। একেবারে নতুন। মাল্যধর তার গায়ে লোভী আঙুল বুলোচ্ছিল। আহা রে, এমন একখানা অস্তর যদি তার নিজের থাকত, তাহলে ফি—হপ্তা হরিণ কী তরখেলের মাংস খাওয়া কে আটকায় তার! আহা, আজ যদি একবারও চালাবার মওকা মিলে যায়...

...একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এলোমেলো ভাবনাগুলো মাথা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল মাল্যধর। খোলা ময়দানে খিদে-পাওয়া বাঘের চেয়ে ভয়ানক জীব আর হয় না। কাজেই সতর্ক থাকতে হবে এখন। সাতসতেরো ভাবতে বসলে চলবে না। দিনচারেক আগে বৃষ্টি হয়েছিল এদিকে। গাছপালার ছায়ায় থাকায় পায়ের নীচের জমি এখানে এখনও নরম আছে। তার অভিজ্ঞ চোখে সেই নরম মাটিতে ছাগলের ইঁট বাঁধা পা টেনে টেনে চলবার চিহ্ন ধরা পড়ছিল। তাই ধরে ধরে সাবধানে খানিক দূর এগোতে হঠাৎ খানিক দূরে হুড়মুড় করে শব্দ উঠল একটা। তারপরেই আবার সব চুপচাপ। শব্দটা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল তারা দুজন। কয়েক মুহূর্ত মরার মতন শুয়ে থেকে তারপর ফের আস্তে আস্তে বুকে হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে গেল তারা।

বড়োসড়ো একটা হেঁদোর ঝাড়কে পাক দিয়ে ঘুরেই মড়ির দেখা মিলল। ছাগলটাকে সবে মেরে খেতে শুরু করেছিল বাঘ। সেই অবস্থায় হঠাৎ মড়ি ছেড়ে উঠে পালিয়েছে। নিঃসন্দেহে টের পেয়েছিল যে কেউ আসছে। কিন্তু টেরটা পেল কেমন করে? ব্যাপারটা বুঝতে অবশ্য দেরি হল না মাল্যধরের। হালকা হাওয়া বইছে তাদের পেছনের খালের দিক থেকে সামনের দিকে।

ওইতেই শিকারির গায়ের গন্ধ পেয়ে গেছে তাহলে বড়োমেঞা। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল তার। এই সামান্য ব্যাপারটা খেয়াল রাখা উচিত ছিল।

কিন্তু কথা হল, বাঘ গেল কোথা? সাবধানে, টোটা পুরে নিয়ে বন্দুকের ঘোড়া তুলে দিল মাল্যধর। কাছেপিঠেই কোথাও লুকিয়ে ওঁত পেতে আছে নিশ্চয়। চোখের নাগালে এলে সময় দেবে না মোটে। কাজে কাজেই তৈরি থাকা দরকার। কথায় বলে সাবধানের মার নেই।

নরম মাটিতে বাঘের থাবার ছাপ ধরে ধরে একটু একটু করে এগোয় দুজন, টুঁ শব্দটি না-তুলে। পাকা শিকারি তারা। সে ছাড়া, এ দিগরের জঙ্গালের হালহকিকতও দুজনেরই ভালোভাবে জানা আছে। কাজেই চোখে চোখে ইশারার চালাচালিতেই কথাবার্তার কাজ চলে যায়, কথা বলার দরকার হয় না।

এগোতে এগোতে একসময় হঠাৎ করে থাবার ছাপ শেষ হয়ে গেল। বাঘটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে। মাথা তুলে তারা দেখল, ঠিক সামনে একটা বাজপড়া পুরোনো কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি। তার মাথাটা ছাই হয়ে উড়ে গেছে বহুকাল আগেই। পড়ে আছে শুধু হাত কয়েক উঁচু দশাসই কাণ্ডটা। পাঁচটা লোকে মিলে হাতের বেড় পাবে না এত মোটা তা।

চোখ টানটান করে এদিক-ওদিক তাকায় মাল্যধর, কোন দিকে গেছে তার কোনো চিহ্ন যদি মেলে। মনের ভেতরে একটা ভয় তার মাথা তুলছিল বারে বারে। গভীর জঙ্গালে নরশার্দূলের গল্প তার অজানা নয়। বাপঠাকুরদার মুখে তাদের গল্প সে ছোটোবেলা থেকে কম শোনেনি। এমনিতে দিব্যি যেন ভালোমানুষের ব্যাটা। খায়দায়, ঘুরে বেড়ায়, জমিতে কাজকম্মও করে। ওদিকে সবার চোখের আড়ালে মন্তর আউড়ে বাঘের রূপ ধরে জঙ্গালে রাজত্ব চালায়, গাঁয়েগঞ্জে ঢুকে মানুষের ঘাড়ও মটকায়। শিকারির হাতে ধরা পড়বার জো হলে চোখের আড়াল খুঁজে উলটে মন্তর পড়ে বাঘের রূপ ছেড়ে ভালো মানুষটি হয়ে যাবে চোখের নিমিষে। শিকারির চোখের সামনে দিয়ে ড্যাংডেঙিয়ে হেঁটে চলে যাবে তাকে বোকা বানিয়ে। আর শিকারি হাঁ হয়ে বসে ভাববে, গেল কোথায় বাঘ! এ-ও যদি তেমন কোনোকিছু হয়...হে মা বনবিবি, সন্তানকে রক্ষা কোরো মা...

ভাবনার সুতোটা তার ছিঁড়ে গেল মধুবাবুর কনুইয়ের গুঁতোয়। একেবারে পাশে চলে এসে তাকে গুঁতো দিয়ে ইশারায় পোড়া গুঁড়িটার মাথার দিকে দেখাচ্ছেন। ওনার আঙুলের ইশারা বরাবর চোখ ফেলে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না মাল্যধর। কিন্তু একটুক্ষণ খুঁটিয়ে নজর করে দেখে নিয়েই একগাল হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। গুঁড়িটার একেবারে মাথার কাছে হালকা রক্তের ছোপ ধরে আছে! আর, গুঁড়ির একেবারে মাথার ওপরে আঙুলের কড়পরিমাণ উঁচু হয়ে আছে...ও দুটো কী!! খানিক ভালো করে ঠাহর করে দেখে আর সন্দেহ রইল না তাদের। বাঘের কানের ডগা দুটোই দেখা যাচ্ছে সেখানে।

ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি রইল না মাল্যধরের। বহুকালের পুরোনো বাজপড়া গাছের গুঁড়ির ভেতরটা ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে জল খেয়ে খেয়ে আর উইয়ের আক্রমণে। চালাক বাঘটা নিশ্চয়

কিছুকাল ধরেই ঘাঁটি গেড়েছে এই বাগানে। আর তাই তাকে গোটা পথটা তাড়িয়ে এনে ঠিক এইখানে এসেই হামলা করেছিল বড়োমেঞা। মেরে এই বাগানের ঘাঁটিতে নিয়ে এসে আরাম করে খাবে বলে। বাগানের মধ্যে এই লুকোবার জায়গাটাও নিশ্চয় তার আগে থেকে জানা। শিকারির গন্ধ পেয়ে তাই এক লাফে এসে লুকিয়েছে খোঁদলের ভেতরে!

চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল দুই শিকারির। মাল্যধরের উঁচানো ভুরুর ইশারা দেখে পকেট থেকে একটা চকোলেট বোমার বাক্স আর দেশলাই বের করে তার হাতে গুঁজে দিলেন মধুবাবু,- তারপর খানিক দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা কয়েকটা কেওড়া গাছের দিকে ইশারা করে তাড়াতাড়ি বুকে হেঁটে সেইদিকে চললেন। মাল্যধরও কোনো আওয়াজ না-করে পিছু নিল তাঁর। কী করতে চাইছে মধু রেঞ্জার সেটা বুঝতে আর বাকি নেই তার। পেটের ভেতর গুরগুর করে-ওঠা হাসিটা কোনোরকমে আটকাল সে। যেমন সেয়ানা বাঘ, তেমন বিটলে এই রেঞ্জারবাবু। ভালো ফন্দিই এঁটেছে। একেবারে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

কেওড়া গাছের মাথায় বেয়ে উঠে ঘোড়া হয়ে বসে মধুবাবু বন্দুক বাগিয়ে ধরে ইশারা দিল। এইখান থেকে, বাজপোড়া গুঁড়ি থেকে মড়ি অবধি গোটা জায়গাটাই একসঙ্গে নজরে পড়ে। একটা দোডালায় সামলে বসে বন্দুকটা হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি রেখে নিয়ে দেশলাই জ্বালাল মাল্যধর। তারপর চকোলেট বোমার পলতেয় ছুঁইয়েই সেটাকে ছুড়ে মারল কাঁঠাল গাছের গুঁড়িটার মাথা লক্ষ করে।

টিপে কখনো ভুল হয় না মাল্যধরের। চিড়বিড়ে আগুনের একটা বাঁকা দাগ তৈরি করে বোমাটা সটান গিয়ে বেরিয়ে- থাকা কানদুটোর মধ্যিখানে পড়ে দুড়ুম করে ফেটে গেল আর তার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ফাটানো গর্জন করে হ্যাঁচড়প্যাঁচড় করে গুঁড়ির মাথায় উঠে এল বাঘটা। সার্কাসের খেলার মতো চারটে পা একত্র করে এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়েই শরীরটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে বাতাসে গা ভাসিয়ে উড়ে গেল নীচের দিকে।

একেবারে তার সঙ্গেসঙ্গেই ফুটুস করে একটা শব্দ হল পাশের গাছটার থেকে। মাল্যধর তাকিয়ে দেখে, কাঁধের থেকে হাওয়া বন্দুক নামিয়ে তার মাথায় আর একটা নিদালি ওষুধের ছুঁচ লাগানো টোটা পরাচ্ছে মধুবাবু। বাঘটা ততক্ষণে মাটিতে নেমে এসে একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুট দিয়েছে তার মড়ির দিকে।

কৌতূহলী চোখে মধুবাবুর দিকে মাল্যধর তাকাতে, ছুটন্ত বাঘটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে দেখতেই ফিসফিস করে মধুবাবু বললেন, 'সাবধানের মার নেই বাউলে। যদি না-লেগে থাকে তাহলে আর একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে তো। তাই আর একটা——বলতে বলতেই হঠাৎ হাসি হাসি মুখে বন্দুক নামিয়ে নিলেন মধুবাবু। বলেন, 'কাজ হয়েছে। ওই দেখো।'

বাঘটা ছুটতে ছুটতেই হঠাৎ কেমন অবসন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে। মাথাটা তার ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে সামনের পা দুটো ভেঙে সে উবু হয়ে বসে পড়ল মাটির ওপরে, তার মড়ির ঠিক পাশটাতে।

দিন সাতেক পরে আরেকবার ঘুম পাড়ানো হল বড়োমেঞাকে। গোসাবা থেকে ডাক্তারবাবু এসে ততদিনে তার পায়ের ঘা সারিয়ে-সুরিয়ে দিয়েছেন। না-খেয়ে খেয়ে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল বাঘটা। এই ক-দিন সরকারের খরচায় গাদা গাদা মাংস খেয়ে তার গায়ে একটু গত্তিও

লেগেছে। ঘুমিয়ে থাকা বাঘকে নৌকোয় তোলা হল যখন, মাল্যধরও তখন মধুবাবুর সঙ্গে চলল। নজরগঞ্জের বিট অফিসে ডি এফ ও সাহেব এসেছেন। মধুবাবুকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি মাল্যধরকে।

পুণ্যি আর বিশলা এই দুই নদী এসে মিলেছে নজরগঞ্জের কাছে। দুই নদীর ফাঁকে বিশাল তেকোনা চর গজিয়েছে একটা। লোকে তাকে বলে নজরগঞ্জের ট্যাক। নতুন পলি পেয়ে ফনফনে জঙ্গল গজিয়েছে সেইখানে। এই জঙ্গলে হরিণ আছে মেলা। ভটভটি নৌকো তার কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছেছে ততক্ষণে জালে আটকা বড়োমেঞা একটু একটু নড়তে- চড়তে শুরু করেছে ফের। সেই দেখে মাঝি ডান্ডা ঘুরিয়ে ইঞ্জিনের তেজ বাড়িয়ে দুগনো করে দিল। দেখতে দেখতে নৌকো এসে ভিড়ল ট্যাকের পাড়ে। জালসুদ্ধু বাঘকে পাড়ে নামিয়ে ওপর থেকে দড়ির হ্যাঁচকা এক টান দিতেই জাল খসে পড়ল তার শরীর থেকে। অমনি হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল বনবিবির বাহন। নৌকোর দিকে একবার ঘুরে দেখল, তারপর দুলকি চালে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ঢুকে গেল তার নিজের রাজত্বে। পায়ের চোট তার সেরে গিয়েছে একেবারে।

সেইদিকে তাকিয়ে মাল্যধর মনে মনে শুধু বলল, 'ফের দেখা হবে মেঞা। এইবারে তোমার রাজত্বে যখন ফের লোকজন নিয়ে গিয়ে পড়ব পেটের দায়ে, তখন যেন আজকের কথাটা মনে থাকে তোমার!'

রতনতনু ঘাটী

বাঘের বাড়ি

অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর-পরই তপোসুন্দরদাদু মেদিনীপুর থেকে আমাদের বাড়ি আসতেন। হিসেব করে আসতেন, না-এমনি, জানি না। তবে আমাদের অ্যানুয়াল পরীক্ষার ছুটির সঙ্গে তপোসুন্দরদাদুর আমাদের বাড়িতে আসাটা মিলে যেত। বড়োদের কাছ থেকে তখন পড়াশোনার তাড়া নেই। শুধু ছুটি আর ছুটি। সকালে ক্যারাম, বিকেলে ফুটবল, সন্ধেবেলা সাপলুডো। উনি এলে ওই সব খেলারও ছুটি হয়ে যেত। তখন শুরু হত সকাল-বিকেল আমাদের গল্প শোনার আসর।

ওঁর ছিল সব রাজারাজড়াদের নিয়ে গল্প। মহিষাদলের রাজার গল্প, তমলুকের রাজার গল্প, ময়নার রাজার গল্প। সেবার এসে বললেন, 'এবার তোদের বলব বিক্রমগড়ের রাজার গল্প।'

বিক্রমগড় নামটা একদম শোনা-শোনা লাগল না। অর্ক বলল, 'বিক্রমগড় কি মেদিনীপুরে?'

তপোসুন্দরদাদু ভুরু দুটো নাচিয়ে বললেন, 'বিক্রমগড় কোথায়, সে জেনে অত কাজ কী? রাজার গল্প হলেই তো হল?'

কথাটা খুব ঠিক। আমরা তো রাজার গল্পের পোকা। আমি বললাম, 'দেশটা কোথায় তোর জেনে কাজ কী? তুই কি সেখানে যাবি?'

অর্ক ঘাড় নেড়ে বলল, সে যাবে না। তপোসুন্দরদাদু আবার ভুরু দুটো একবার নাচিয়ে নিলেন। উনি যখন গল্প শুরু করেন ভুরুজোড়াটা নাচিয়ে নেন।

তপোসুন্দরদাদু বললেন, 'বিক্রমগড় কিন্তু ধারে-কাছে না, বেশ দূর। অর্ক যেতে চাইলে পারবে না। মেদিনীপুর থেকে যদি ও বিক্রমগড় যেতে চায়, প্রথমে পড়বে একটা নদী, নাম 'আকুলপারা'। সেই নদী পেরোলে পড়বে একটা ছোটো পাহাড়। তোরা অবশ্য তাকে পাহাড় নাও বলতে পারিস। তোরা তো টিভিতে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে কথায় কথায় এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কেটু পাহাড় দেখিস। তোদের ওটাকে টিলা মনে হতেই পারে। পাহাড়টার নাম 'অতিক্রমী'।'

পাহাড়ের নামটা পছন্দ হল না টোটার। ও আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি চোখের ইশারায় চুপ করে থাকতে বললাম।

তপোসুন্দরদাদু বলে চললেন, 'পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরনা পড়বে। সেটা পেরোলে একটা

খুব বড়ো বন। মহাভারতে 'খাণ্ডব বন'-এর কথা শুনেছিস তো? সেরকম একটা বড়ো বন, নাম 'গড়কান্তার'।'

খাণ্ডব বনের কথা শুনে মিমি চট করে ঘাড় নেড়ে দিল, সে জানে। অন্য সময় হলে তপোসুন্দরদাদু যাচাই করে নিতেন মিমি জানে কি না। আজ আর সে পথে গেলেন না। ক্লাস টুয়ে-পড়া মিমির অজ্ঞতাও আর চাউর হয়ে গেল না বটে, তবে আমরা নিশ্চিত, মিমি খাণ্ডব বন কী, জানে না।

তপোসুন্দরদাদুর গল্প শুনছি, 'তা সেই গড়কান্তার পেরোলেই বিক্রমগড়। সেখানকার রাজারা ছিলেন তিন ভাই, বড়ো মৃগয়াকুমার, মেজো মল্লকুমার, আর ছোটো ভাই সন্তরণকুমার। নাম শুনে বুঝতে পারছিস, বড়ো রাজা শিকার করতেন, মেজো রাজা কুস্তি লড়তেন আর ছোটো রাজা ছিলেন সাঁতারু। বেশ কয়েক বছর হল ভারত স্বাধীন হয়েছে। ভারতবাসীর মনে তখন আনন্দ ধরে না। রাজা মৃগয়াকুমার ঠিক করলেন, ব্রিটিশরা পালিয়েছে, সেও তো কতদিন হল। এবার একবার জমিয়ে বাঘ শিকারে যাবেন। বাঘ শিকার নিয়ে রাজা মৃগয়াকুমারের খুবই কৌতূহল। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে তিনি দু-বার নৈনিতালে গিয়ে দেখা করেও এসেছেন জিম করবেট সাহেবের সঙ্গে। অবশ্য এখনকার মতো তখন তো বাঘ শিকার বন্ধ করার জন্যে আইন হয়নি।

'দলবল, খাবারদাবার, মশাল জ্বালাবার সরঞ্জাম আর গুলি-বন্দুক নিয়ে রাজা মৃগয়াকুমার চললেন শিকারে। এই একটা নদী পেরোন তো এই একটা ছোটো টিলা পেরোন। এই একটা টিলা পেরোন তো এই একটা বন পেরোন। শেষে একটা ঘন বনের ভিতরে বড়ো দুটো গাছের মাথায় মাচা বাঁধা হল। একটা মাচায় বসলেন রাজা মৃগয়াকুমার এবং তাঁর শিকারের প্রধান সহকারী দিগম্বর গায়েন। অন্য মাচাটিতে রইল রাজার শিকারের দলের লোকেরা। একদিন গেল, দু-দিন গেল। বাঘের আর দেখা নেই। তখন বনের আরও গভীরে ফের মাচা বাঁধার আদেশ দিলেন রাজামশাই। লোকলশকর চলল গভীর বনে। একটা বড়োগাছ বাছা হল। তার উপর একটা মাচা বেঁধে দিল রাজার লোকজন। প্রথমে রাজা মৃগয়াকুমার উঠলেন মাচায়। তিনি ওঠার পর তাঁর পিছন-পিছন দুটো বন্দুক নিয়ে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে মাচায় উঠল দিগম্বর।

'তারপর রাজা আদেশ দিলেন আর সবাইকে, তারা যেন চলে যায় তাদের পুরোনো মাচায়। সবাই ফিরে গেল রাজার আদেশমতো। রাজামশাই বলে দিলেন, শূন্যে গুলি ছোড়ার শব্দ শুনলেই তারা যেন রাজামশাইয়ের মাচার কাছে চলে আসে। দেখতে-দেখতে সন্ধে নামল বনের মাথায়। প্রায় পূর্ণিমার মতো একটা গোল চাঁদও উঠল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে।

'রাজা মৃগয়াকুমার দিগম্বরকে বললেন, 'চোখ খোলা রাখো দিগম্বর। তুমি চোখ রাখো পিছনের দিকে, আমি চোখ রাখি সামনের দিকে।'

'পলকহীন চোখে দুজন সারারাত জাগলেন। দূরের মাচায় রাজার লোকজন বন্দুকের আওয়াজ শোনার জন্য কান খাড়া করে সারারাত জেগে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালবেলার আলোয়

আড়মোড়া ভেঙে রাজা বললেন, 'দিগম্বর, এ যাত্রায় বাঘের তো দেখাই মিলল না। এবার মনে হয় খালি হাতেই ফিরতে হবে।'

'দিগম্বর গলা সরিয়ে বলল, 'না মহারাজ, আর একটা-দুটো দিন তো দেখি। বাঘ ঠিক আসবেই।'

'দিগম্বরের কথামতো তৃতীয় রাতে রাজা মৃগয়াকুমারকে দূরে ঘন ঝোপের পাশে চাঁদের আলোয় একটা বাঘকে দেখতে পেলেন। বাঘটা থাবা মেলে বসে আছে ঝোপের দিকে মুখ করে। মাঝে-মাঝে মুখ নীচু করে কিছু চাটছে যেন। রাজা আঙুল তুলে দেখালেন দিগম্বরকে। দিগম্বরও দেখল, হ্যাঁ, রাজামশাইয়ের কথাই ঠিক। রাজা বন্দুকটা তাক করতে-করতে ফিসফিস করে বললেন, 'দিগম্বর, আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

'বলার সঙ্গে-সঙ্গে গর্জে উঠল রাজা মৃগয়াকুমারের বন্দুক। চাঁদের আলোয় তাঁরা দুজন মাচার উপর থেকে স্পষ্ট দেখলেন, বাঘটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন রাজা মৃগয়াকুমার গলা উঁচু করে বললেন, 'দিগম্বর, শূন্যে গুলি ছুড়ে ওদের আসতে বলো।'

'দিগম্বর শূন্যে গুলি ছুড়ল। প্রথম গুলির শব্দটা দূর থেকে ওরা আগেই শুনেছিল। এবার শূন্যে ছোড়া গুলির শব্দ শুনে মশাল জ্বালিয়ে রাজা মৃগয়াকুমারের দলবল মাচার নীচে এসে হাজির হল। মৃগয়াকুমার বললেন, 'দিগম্বর, আগে তুমি নামো মাচা থেকে। তারপর আমি নামব।'

'দিগম্বর সরসর করে নীচে নেমে এল। তারপর ধীরে-ধীরে রাজামশাই মাচা থেকে নীচে নামলেন। সবাই দেখল, মশালের আলোয় রাজামশাইয়ের মুখটা বীরত্বে চকচক করছে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে মশালধারীদের পিছনে চললেন রাজা। তাঁর পিছনে দিগম্বর। তার পিছনে আর সব লোকজন।

'বাঘটার কাছে গিয়ে দিগম্বর হেসে বলল, 'রাজামশাইয়ের নিশানা কখনো ভুল হয়?' আর সকলে চোখ বড়ো-বড়ো করে নিহত বাঘটাকে দেখতে লাগল। এ আর ক-জনের ভাগ্যে জোটে? সারাজীবন কত নাতিপুতি আর মানুষজনকে যে এই গল্প শোনাতে পারবে তারা!

'তখনও রাজার মুখ থেকে একটাও কথা সরছে না। সকলেই অবাক। এমন সময় খুব ধীরে রাজা মৃগয়াকুমার কান্না-ভেজা গলায় বললেন, 'এ আমি কী করলাম?'

'কেউ রাজামশাইয়ের এ কথার মানে বুঝতে পারল না। এ-ওর মুখের দিকে তাকাল। দিগম্বর বলল, 'কেন হুজুর, এ কথা বলছেন কেন?'

'রাজা মৃগয়াকুমার ঝোপের পাশে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'ওই দেখো। ওকে আমি মা-হারা করে দিলাম!'

'সকলে তাকিয়ে দেখল, বাঘটার একটা ছোট্ট বাচ্চা থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। মশালের আলোয় জ্বলছে তারও চোখ দুটো। রাজা মৃগয়াকুমার এগিয়ে গেলেন বাঘের বাচ্চাটার কাছে। কোলে তুলে নিলেন। সকলে দেখল, রাজামশাইয়ের চোখে টলমল করছে জল।'

অর্ক বলল, 'রাজা মৃগয়াকুমার বাঘের বাচ্চাটাকে নিয়ে কী করলেন?'

তপোসুন্দরদাদু ভুরু জোড়া নাচিয়ে বললেন, 'বাঘের বাচ্চাটাকে নিয়ে মৃগয়াকুমার ফিরতে লাগলেন বিক্রমগড়ে। শিকার করা বাঘটা রইল পড়ে। দিগম্বর একবার বাঘটার দিকে আঙুল তুলে জানতে চাইছিল। রাজামশাই নীরবে শুধু ঘাড় নেড়ে না বলে দিলেন। ফেরার পথে একটা নদীর জলে রাজামশাই বন্দুক দুটো ফেলে দিয়ে দিগম্বরকে বললেন, 'এই আমার শিকার করা শেষ!' কেউ তাঁর কথায় কোনো প্রশ্ন করার সাহস পেল না। এমনকী, দিগম্বরও না। বিক্রমগড়ের রাজপ্রাসাদে বড়ো হতে লাগল বাঘের বাচ্চাটা।'

মিমি তপোসুন্দরদাদুর কথার মাঝখানে প্রশ্ন করে বসল, 'এখনও বাঘের বাচ্চাটা রাজবাড়িতে আছে?'

তপোসুন্দরদাদু বললেন, 'গল্প এখানেই শেষ নয় গো মিমিদিদি। বাঘের বাচ্চাটা তো চিরদিন ছোট্টটি থাকল না। ধীরে-ধীরে সে বড়ো হতে লাগল। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের কাছে রাজা মৃগয়াকুমার একদিন চিঠি লিখলেন, এমন আইন চালু করা হোক, যাতে ভারতে কেউ যেন বাঘ না শিকার করতে পারে। ভারত সরকারও এ নিয়ে ভাবছিলেন। বাঘ শিকার করা বন্ধের জন্যে চালু হয়ে গেল আইন।

এদিকে রাজামশাইয়ের পোষা বাঘটা ঘুরে বেড়ায় গোটা রাজপ্রাসাদময়। রাজদরবারে যেতেও তার বাধা নেই, রাজঅন্তঃপুরেও যেতে তার বাধা নেই। মেজো রাজামশাই মল্লকুমার সুযোগ পেলেই বাঘটার মুখোমুখি হয়ে কুস্তির নকল প্যাঁচ দেখান। মুখোমুখি হলেই ছোটো রাজা সন্তরণকুমার বাঘটার সামনে নকল ফ্রি-স্টাইল, আর ব্যাকস্ট্রোক দেখিয়ে কেটে পড়েন।

'কিন্তু ঝামেলা হল ছোটো রানিমা আর দাসদাসীদের নিয়ে। বাঘের বাচ্চাটা যত বড়ো হয়, ততই তাদের ভয়ও বাড়তে থাকে। এই দেখে রাজা মৃগয়াকুমার একদিন মন খারাপ করে বসেছিলেন রাজপ্রাসাদে। এই বাঘের বাচ্চাটা তো মা-হারা হয়েছিল তাঁরই বন্দুকের গুলিতে। তাকে তিনি রাজপ্রাসাদে এনে বড়ো করলেন। এখন যদি রাজবাড়ির লোকজন বাঘটাকে ভয় পায়, তাহলে কী করা যাবে? শেষে তিনি মনস্থির করলেন, বাঘটাকে বনেই ছেড়ে দিয়ে আসবেন।'

'ফের জড়ো করা হল লোকলশকর। মোতায়েন করা হল বড়ো গাড়ি। বাঘটাকে পেট ভরে খাইয়েদাইয়ে গাড়ির সঙ্গে রাজা মৃগয়াকুমারও চললেন বনে। বড়ো রানিমা ঠাকুরের ফুল বাঘটার মাথায় ছুঁইয়ে মঙ্গল কামনা করলেন। মেজো রানিমা রাজদেবতার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে এলেন, বাঘটা বনে যেন ভালো থাকে। যে ছোটো রানিমা বাঘটাকে অত ভয় পেতেন, তাঁরও চোখ দুটো ছলছল করে উঠল বাঘটাকে নিয়ে যাওয়ার সময়।

'কিন্তু বনে গিয়ে হল এক বিপত্তি। বাঘটা গাড়ি থেকে কিছুতেই বনে যেতে চাইল না। সে শুধু রাজা মৃগয়াকুমারের পায়ের কাছে মুখ ঘষতে লাগল। রাজামশাই তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'যাও বাবা, বনই তো তোমার বাড়ি। এখানেই তুমি ভালো থাকবে।'

'বাঘটা কিছুতেই বনে গেল না। সে শুধু রাজামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। শেষে রাজা মৃগয়াকুমার বাঘটাকে নিয়ে ফিরে এলেন বিক্রমগড়ের রাজপ্রাসাদে। এসেই তিনি তাঁর রাজপ্রসাদের পাশে বেশ কয়েক বিঘে গাছপালা ঘেরা জায়গা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেললেন। তার মধ্যে জলাশয়ও তৈরি করালেন। বনের মধ্যে তৈরি করালেন গুহার মতো দেখতে একটা ছোটো ঘর। তারপর একদিন বাঘটাকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন সেই বনে। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরার পর রাজামশাই তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমার জন্যে এই বনটা আমি বানিয়েছি। এটা তোমার নিজের বাড়ি। এখানে তুমি থাকবে। কেউ তোমাকে মারতে পারবে না এখানে! আমি রোজ এসে তোমাকে দেখে যাব।' বাঘটা কী বুঝল কে জানে, আর রাজপ্রাসাদে আসার জন্যে বায়না করল না। থেকে গেল সেখানে। রাজা মৃগয়াকুমার প্রাসাদে ফিরে এসে সাইনবোর্ড

লেখার লোককে ডেকে পাঠালেন।'

আমি বললাম, 'বুঝতে পেরেছি। ওই বনটার একটা নাম দিয়ে বোর্ডে লিখে টাঙিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তো রাজামশাই?'

তপোসুন্দরবাবু হেসে বললেন, 'ঠিক ধরেছিস। রাজামশাই বনটার নাম দিলেন 'বাঘের বাড়ি'। রাজা মৃগয়াকুমারের এই কনসেপ্ট থেকেই তো গোটা পৃথিবী জুড়ে এত ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি বা অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে।'

জয়ন্ত দে

ফকির আলির হাত

নাচতে নাচতে ভ্যান-রিকশাটা দৌড়োচ্ছিল। পেছনে দুটো বাচ্চা ধরে জনা আটেক সওয়ার। অবশ্য এই জনা আটেকের বাইরে আছে আরও দুটো প্রাণী। একটা ছাগল, একটা মুরগি। ছাগলটা মাঝে মাঝে গলা তুলে ব্যা ব্যা করার চেষ্টা করলেই, তার মালিক খপাত করে মুখটা টেনে কোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মুরগিটাও কোঁ কোঁ করে সুর ধরবে কী ধরবে না ভাবছে। কিন্তু ভ্যান-রিকশাটা ক্রমাগত ক্যাঁচক্যাঁচ করেই চলেছে। তার কোনো মানা নেই। আর মানুষগুলো ঘুরিয়ে- ফিরিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। আর উশখুশ করছে কথা বলার জন্যে।

জায়গাটা গোসাবা। এ মানুষগুলো, সবাই যাবে জেমসপুরে।

এর মধ্যেই ছাগলটা বেশ জোরেই ডেকে উঠল, ব্যা ব্যা ব্যা...।

একটা লোক একটু নড়েচড়ে বলল, বেশি ডাক ছাড়িসনে বাপ, কর্তামশাই তো ধারে-কাছেই ঘুরছে, হালুম করে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেই হল।

এইবার যেন কথা পেল সওয়ারিরা। একজন বলল, লাহিড়ীপুরে শুনলাম বাঘ ঢুকেছে। তা গেছে, না আছে এখনও?

প্রথম লোকটিই আবার বলল, গারাল নদী পেরিয়ে ঢুকেছে, সহজে কী যাবে? শুনলাম তো তাড়ানোর জন্যে খুব তোড়জোড় চলছে। আর সে বেটা নাকি অচিন্ত্য পাইকের ধানখেতে গিয়ে ঢুকেছে। সব্বাই এখন ধানখেত ঘিরে হল্লা করছে।

এবার অন্য একজন, সেই ছাগল কোলে-করা বুড়ো বলে, ও তো গারাল পেরিয়ে এসেছে, সুন্দরবন দত্ত রেঞ্জের বাঘ।

ভ্যান-রিকশার একদম পেছনে বসে ফকির আলি। যাবে জেমসপুর। একটা কাজের খোঁজ পেয়ে সে চলেছে। নুলো মানুষ, কাজের বড়ো অভাব। গায়ের চাদরটা ঠিক করতে করতে সে সামনের মানুষগুলোকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে।

প্রথম লোকটা আবার বলে, বাঘটা নাকি বেশ বড়োসড়ো। সকালে একটা গোরুও মেরেছে।

আবার ফকির আলি লোকটার দিকে তাকায়। তারপর ঘড়ঘড় গলায় বলে, বাঘ কী? মদ্দা নয়, বাঘিনিই হবে। বাচ্চা বিয়োতে ঢুকেছে নির্ঘাত।

ফকির আলি জানে, বাঘিনিরা বাচ্চা হবার সময় নিরিবিলি জায়গা খোঁজে। কেন-না বাঘরা বাঘিনিদের বাচ্চা হলেই সেগুলো মেরে ফেলে। আর সেই জন্যেই, বাঘের হাত থেকে বাচ্চাদের বাঁচাতে বাঘিনিরা নিরিবিলি জায়গা খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে মাঝে-মধ্যে ভুল করে চলে আসে এখানে। না-হলে তারা জঙ্গালের প্রাণী কেন লোকালয়ে আসবে?

দ্বিতীয় লোকটা এবার ফস করে একটা বিড়ি ধরায়। লম্বা একটা টান মেরে বলে, তা সে বাঘ হোক আর বাঘিনি, ফিরে যেতে পারবে বলে তো মনে হয় না। এখানে, লাহিড়ীপুরেই খতম হয়ে যাবে।

চমকে তাকায় ফকির আলি। একমাথা বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল। একমুখ দাড়ি। মাঝে সুন্দরবনের অসংখ্য চরের মতো ঠোঁট-নাক-চোখ জেগে আছে। কিন্তু সেই চুল-দাড়ির ভেতর জেগে থাকা চোখটা কুঁচকে ছোটো করে সে দ্বিতীয় লোকটার দিকে তাকাল। এবার দ্বিতীয় লোকটার কথা টপ করে লুফে নিয়ে কথা বলে উঠল আর একজন, এ তল্লাটে তো রেকর্ড আছে, বনের বাঘ একবার ঢুকলে আর ফেরে না। ফিনিশ!

প্রথম লোকটা বলে, তা বটে। এই তো ক-দিন আগে বাঘের পায়ের খোঁজ করে করে হন্যে হয়ে পড়েছি। এমন সময় শুনলাম একটা রান্নাঘরে নাকি ঢুকেছে ব্যাটা। ব্যস, মানুষের রোখ বলে কথা, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এক্কেবারে খতম। তারপর বনদপ্তরের লোক এল, পুলিশ এল, কম ঝামেলা তো করল না। কিন্তু তারপরেও এদিকে আবার বাঘ ঢুকল। তাকেও পিটিয়ে মেরে নিকেশ করে দিল এদিককার মানুষ। এমনকী মেরে আগুন দিল গায়ে, যাতে বাঘের সব প্রমাণ সাফ হয়ে যায়। তখনও বনদপ্তর, পুলিশ আসল। সে মামলা তো এখনও চলছে। জেমসপুর-লাক্সবাগানে রেকর্ড আছে বটে বাঘ মারার। কথাগুলো যেন মনঃপূত হল না ফকির আলির। ভ্যানের পাটা থেকে হাত তুলে চুলে ঝাপটা মারল। গম্ভীর রাগত গলায় বলল, বাঘ ঢুকেছে বলে তাকে মারতে হবে। এ কেমন ধারা বিচার। তাকে তাড়িয়ে দিলেই হল। জঙ্গালের প্রাণী আবার জঙ্গালে যাবে।

দ্বিতীয় লোকটা বলল, তবু বাঘ মারা বলে কথা। সুযোগ পেলে কে আর ছাড়ে? লোকটার কথায় যেন গর্জে ওঠে ফকির আলি, তবে জঙ্গালে যাক। দখিনরায়ের এলাকায় ঢুকে মেরে আসুক তাকে, এখানে বাগে পেয়ে, সবাই মিলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে কী বীরপুরুষের কাজ বাবু!

প্রথম লোকটা ফোঁস কাটে, তোমার তো দেখছি খুব দরদ। তা তুমি জঙ্গালে গিয়ে বাঘ মেরেছ নাকি? ফকির আলির মুখটা অদ্ভুত কুঁচকে যায়, হাসে কিনা বোঝা যায় না। তারপর দাড়ি-চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, সে একটা কাহিনি আছে বটে, তবে তেমন কিছু নয়।

তবু শোনা যাক, শোনা যাক, সবাই নড়েচড়ে ওঠে।

ফকির আলি বলতে শুরু করে, আমরা হলাম গিয়ে জঙ্গাল হাঁসিল করে, চরজাগা অঞ্চলের মানুষ। আর আমাদের জাতব্যাবসা হল জঙ্গাল থেকে মধু সংগ্রহ করা। এই মধু আনতে গিয়ে আমার বাপ, কাকা, আত্মীয়বন্ধু অনেকেই বাঘের পেটে গেছে। তবু কী করব, পেটের জ্বালা। এ কাজ ছাড়তে পারি না। আর এখন তো বাঘে খেলেও কারো কাছে নালিশ জানাতে পারব না। প্রাণ বাঁচাতে বাঘ মারা তো দূরের কথা। এবার অধৈর্য গলায় প্রথম লোকটা বলে, আসল কাহিনিটা বলো দিকি বাবু। ফকির আলি একটু দম নেয়, নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু ভ্যানের তেলহীন চাকার ক্যাঁচক্যাঁচ।

ফকির আলি বলে, এখন বুঝলেন জঙ্গালে মধু কাঠ কিংবা মাছ ধরতে গেলে যদি কাউকে বাঘে খায়, গলা ছেড়ে কাঁদার জো নেই। এখন তো জঙ্গাল সরকারের, আর জঙ্গালে ঢুকতে গেলে লাইসেন্স লাগে। আমাদের কারোরই লাইসেন্স নেই। চুরি করে জঙ্গালে ঢোকা। মধু, কাঠ সব চুরি করা বলতে পারেন। ছাগল কোলে করা লোকটি এবার বলে ওঠে, তুমি কি জঙ্গালে বাঘের সামনে পড়েছিলে? সামনে মানে এক্কেবারে সামনে। যখন হুঁশ হল আমার থেকে বিশ হাত দূরে তিনি। আশপাশে কেউ নেই। আমরা সঙ্গীরা বেশ দূরে দূরে, যে যার মতো কাজে ব্যস্ত। আমরা সবাই মাথার পেছনে একটা মুখোশ পরি। যাতে তিনি বোঝেন আমরাও তেনাকে দেখতে পেয়েছি। যাতে সে অন্তত একটু থমকে দাঁড়ায়। আর আমরা একটু সুযোগ পাই। আমাদের চোদ্দোজনের দলে দশজন মহুলে, আর চারজনের দায়িত্বে চারদিকের নজরদারি। কিন্তু হলে কী হবে, 'কপালে লেখা—বাঘের দেখা।' খণ্ডাবে কে? আমার বিশ হাত দূরে বাঘ। কাউকে হাঁক পেড়ে ডাকারও সময় নেই—বনবিবির নামও স্মরণে নেই। সামানে সাক্ষাৎ মৃত্যু। বলতে বলতে বিদ্যুৎচমকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমিও তখন মনস্থির করে ফেলেছি, হাতে অস্ত্র বলতে জঙ্গাল কেটে পথ চলার জন্য সামান্য একটা কুঠার। আমিও কুঠার বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুজনেই পড়েছি। ও থাবা মারে। ওর দাঁত—থাবা—নখ মেলা অস্ত্র—আর আমার শুধু কুঠার আর মরিয়া সাহস। প্রথম ধাক্কাতেই আমি পড়ে গিয়েছিলাম। এই পড়ে যাওয়াতে কিছু সুবিধা পেয়েছিলাম বটে আমি। শুয়ে শুয়েই ওর হাঁ করে, জিব দাঁত বের করে নেমে আসা মুখে লাগালাম এক কোপ। কোপটা ঠিক ওর নাক আর হাঁ-মুখের কাছে। কিন্তু ততক্ষণে ওর শরীর আমার ওপর চেপে বসেছে। কিন্তু কুঠারটা ওর মুখের ওপর গেঁথে। একটা ঝটকা মারতেই, দেখি আমি খালাস। ওর শরীরের ভার নেই আমার ওপর। ও মাটিতে আর আমি ওর ওপর। চালালাম কুঠার, কোপের পর কোপ। ততক্ষণে আমার সঙ্গীরাও চিৎকার জুড়েছে, হল্লা লাগিয়েছে, তখন তাদের আর কিছুই করার নেই। এদিকে, কোপের পর কোপ, ওদিকে হল্লা, তিনি ঝটকা মেরে উঠলেন। উঠলেন বটে কিন্তু আর দাঁড়ালেন না, এক লাফে জঙ্গালে মিলিয়ে গেলেন চোখের নিমেষে।

ব্রেক কষল ভ্যান-রিকশা, এসে গেল জেমসপুর। প্রথম লোকটি বিস্মিত গলায় বলে, বাঘ

তাহলে তোমায় ছেড়ে দিয়ে গেল?

এবার স্পষ্ট হাসল ফকির আলি। স্পষ্ট হয়ে হো হো শব্দে ফেটে পড়ল। ছেড়ে দিয়ে কী তিনি যান? হাসি আর ব্রেক কষার ধাক্কায় গা থেকে খসে পড়েছে চাদর। হাসির মতোই স্পষ্ট হল ফকির আলির কাঁধ। কাঁধের বাঁদিকটা শূন্য। হাতহীন জামার ফাঁকা হাতটা হাওয়ায় দুলে ওঠে, যেন ফকির আলির বিজয়ঝান্ডা। আর সেই বিজয়ঝান্ডা উড়িয়ে ফকির আলি চলে...। ভাবে নুলো মানুষ, কামের ধান্দায় নয় পরেই যাবে। আপাতত লাহিড়ীপুরেই যাওয়া যাক, 'তেনার' বেঘোরে প্রাণ যাওয়ার আগে তাড়িয়ে দিয়ে আসতে হবে বাবা দখিনরায়ের অঞ্চলে।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

যেখানে বাঘের ভয়

'১৯৮৫ সালে ডেভিড হান্ট নামে একজন ব্রিটিশ বার্ড-ওয়াচিং ট্যুর গাইড এখানে বাঘের আক্রমণে মারা গিয়েছিলেন।'

অরণ্যের কথায় বুকের ভিতরে একটা চিনচিনে অনুভূতি বেজে উঠল। এই গাঢ় সবুজে আমরা কী পথ হারাতে চলেছি? পাখি আবিষ্কারের আনন্দের ঘোরে খবরটা মাথায় জানান দিতে স্নায়ুগুলো দেরি করে ফেলেছে? ক্যামেরার ডিসপ্লেতে গ্রিন-বি-ইটার পাখিটার স্থিরচিত্রটা আমার হাতের কম্পনে কেঁপে গেল। একঝলক পাখিটার কমলা মাথা, ছোট্ট গোল চোখের তলা দিয়ে সুন্দর কালো কাজল-টানার মতো দাগ আর সবুজ পালকগুলো দেখে উদ্‌বেগ কমাতে চেষ্টা করলাম। ছবি পিছিয়ে পিছিয়ে চোখ বোলালাম পিড কিংফিশার, স্টোকবিলড কিংফিশার, রোজরিংড প্যারাকেট, গ্রেহেডেড ফিশিং ইগল ইত্যাদি একের পর এক পাখির ছবিতে। ধিকালা-ফরেস্ট-লজ থেকে আমরা খুব দূরে চলে আসিনি। নিশ্চিত। আমরা আমাদের গাইড পরেশ পোখরিয়ালের সাথে ঘাস বনে ঢুকেছিলাম এখানকার ট্যুরিজম প্যাকেজের নিয়ম মেনে। হঠাৎ তিনি আমাদের জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন এই রামগঙ্গা নদীর দিকে। প্রথমটায় একটা খটকা চমকের আবহ থাকলেও এখানে বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য মাছরাঙা হয়ে। নদী-জঙ্গল-পাখির অপূর্ব ফ্রেমে সেই যে চোখ জুড়াল, আর ফিরে প্রশ্ন করিনি। কেন তিনি আমাদের ট্যুর প্রোগ্রাম বদলালেন? একের পর এক পাখি আবিষ্কারের নেশায় পিছন পিছন হেঁটেছি, আবার জিপে ফিরে এসেছি। অদ্ভুত মানুষ, গোটা জঙ্গালটা যেন তাঁর নখ-দর্পণে। তিনি বোধহয় বলতে চাইছিলেন,—চেনা পথে

অচেনা কিছু অপেক্ষায় থাকে না, তার জন্য পথ হারাতে হয়। তাই কী ইচ্ছা করে আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন?

আমরা পরস্পরের হাত শক্ত করে চেপে ধরলাম। অরণ্য সম্পদকে নিয়ে আমরা তিনজন। পরপর দু-বছর ভরতপুর, মানস হয়ে পাখির নেশায় এবার জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে। ওয়েবসাইট ঘেঁটে জেনেছিলাম এখানে প্রায় পাঁচশো পঁচাশি রকমের পাখি আছে। সেইসব মজা এখন হিমেল স্রোত হয়ে হাত-পা ঠান্ডা করে দিচ্ছে।

আমরা কতটা বিপদাগ্রস্ত?

'এটা কোর এরিয়া। এখানে বাঘ আসে।' একটু আগে মিস্টার পোখরিয়াল হিন্দিতে বোঝাচ্ছিলেন। পথ চলতে চলতে নানান গল্পের ফাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন, 'ভয় নেই, আমি তাদের গতিবিধিতে ওয়াকিবহাল।'

'লোকটাকে বিশ্বাস করাটাই ভুল হয়েছে।' সম্পদ চিৎকার করে উঠল। 'ভ্যাগাবন্ড পাগলা টাইপের লোক নিশ্চয়। নিজেও মরবে, আমাদেরও মারবে। নদী থেকে জল আনতে গিয়ে আর ফেরার নামটি নেই। কুমিরে টেনে নিয়ে গেল নাকি?'

সম্পদের রাগ ও বিরক্তিটা অমূলক নয়। এই জায়গাটায় আমরা গত চল্লিশ মিনিট ধরে জিপের ভেতর ঠায় দাঁড়িয়ে আছি অপেক্ষায়। 'চল তবে নদীর দিকে একটু পিছিয়ে গিয়ে ডেকে আনি।' ভরসা নিয়ে প্রস্তাব দিলাম।

'এখানে জিপ থেকে জঙ্গলে নামাটা কী ঠিক হবে?'

'কিন্তু কী করা যাবে, বিকেল হয়ে এল, এভাবে তো রাত কাটানো যাবে না। হয়তো সেই মানুষটা জল আনতে গিয়ে জলে-জঙ্গলে মজে গেছে।'

বাধ্য হয়েই তিনজনে যে পথে এতটা এসেছিলাম, মোটামুটি সরলরেখায় সে পথ ধরেই নদীর দিকে ফিরতে লাগলাম। কিছুটা হাঁটার পর মনে হল পিছন-পিছন যেন ভারি কিছু গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। ঝটকা দিয়ে পিছন ফিরলাম। কিছু দেখতে পেলাম না। এই অভয়ারণ্যে হিংস্র জানোয়ারের অভাব নেই। তিন জনে তিন দিকে নজর রেখে সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম। নদীর দূরত্ব বেশি নয়, তবুও সে পথ-ই যেন ফুরোতে চাইছিল না। অবশেষে যখন জলের কাছে পৌঁছোলাম তখন থেকেই আমরা এক ভয়ানক ভয়-পাতালের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগলাম।

জলের পাশে বড়ো পাথরটাতে আমি-ই প্রথম আবিষ্কার করলাম চাপচাপ রক্তের ছোপগুলো। তিনজনে থম মেরে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলাম যদি বডিটার কোনো চিহ্ন দেখা যায়।

সম্পদ হঠাৎ কাঁদোকাঁদো স্বরে বলে উঠল, 'তাকে নিয়ে গেছে। আমরাও জঙ্গলে ফেঁসে গেছি। চল জিপের দিকে দৌড়োই।'

রুদ্ধশ্বাস একটা দৌড়ের শেষে জিপে উঠে হাঁপাতে লাগলাম। এই জিপ অল্পবিস্তর আগুপিছু হয়তো করতে পারব। কিন্তু এখান থেকে ফেরার পথ অচেনা। কোনদিকেই বা যাব! যদি অন্য কোনো ট্যুরিস্ট গ্রুপ বা বনরক্ষী বাহিনী এসে উদ্ধার করে তাহলে বাঁচোয়া। কিন্তু আমরা হয়তো একেবারেই অপ্রচলিত অবস্থানে। এ রাস্তায় আদৌ কারো চলে আসার সম্ভাবনা আছে তো?

এদিকে আমাদের যিনি নিয়ে এসেছেন সেই মিস্টার পোখরিয়ালের মুখটা মনে পড়ে গেল। এত পুঙ্খানুপুঙ্খ জঙ্গাল চেনা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে এ কী হল! রামনগর ফরেস্ট অফিসে গিয়ে লজ বুকিং করার সময় আলাপ হয়েছিল তাঁর সাথে। প্রথম আলাপেই বেশ জমে উঠেছিল হৃদ্যতা। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারেন, বুঝতে পারেন স্পষ্ট। আমরা তাঁর মায়ের দেশের লোক। মিস্টার পোখরিয়ালের আদি মামার বাড়ি ছিল কোচবিহার থেকে রসিকবিল যাওয়ার রাস্তায়। পরে দাদু-মামারা ব্যাবসাসূত্রে দেরাদুনে চলে আসেন। সেখানে থাকতে থাকতেই তাঁর বাবার সাথে যোগাযোগ।

আমরা তো কোচবিহার শহরের ছেলে। শুনে হইহই করে বললেন, 'আপনারা তো পাখির এক স্বর্গরাজ্য থেকেই এসেছেন। আমি একবার মাত্র গিয়েছিলাম রসিকবিলে, দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এই যে আমার জীবজন্তু প্রেম সেটা মায়ের থেকেই পাওয়া।'

পশুপাখি, বনজঙ্গাল নিয়ে গভীর জ্ঞান যে এদের প্রতি তার ভালোবাসারই দান তা বোঝা যাচ্ছিল। কথায় কথায় বলছিলেন, 'পৃথিবীর সবকিছুই যে মানুষের ভোগের জন্যে নয়—একথাটা মানুষ যে কবে বুঝবে! দেখুন, মানুষের তৈরি নিয়ম ভাঙলে তার কতরকম শাস্তি আছে, অথচ মানুষ যে বারবার প্রকৃতির নিয়ম ভাঙে—তার বেলা?'

এরপর শালের জঙ্গালের রূপ দেখতে দেখতে ধাঙ্গাদি এনট্রি-গেট থেকে ধিকালা ফরেস্ট লজ একসাথে চলেছিলাম। যাত্রাপথে তিনি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কট্টরভাবে আইন প্রয়োগ করা কতটা জরুরি তাই নিয়ে লম্বা বক্তব্য রেখেছিলেন। বলেছিলেন, করবেট সাহেবের আত্মার আশীর্বাদে এখানে বাঘের ওপর চোরাশিকারিদের আক্রমণ কিছুটা কম। তবে আমি খবর পেয়েছি তাদের লোভের থাবার ছাপ এখানকার মাটিতেও পড়ছে। এরা প্রথমে কাছের গ্রামগুলোতে ঘাঁটি গেড়ে কমদামে অলংকার বেচার ব্যবসায় পসার বানায়। আর তলে তলে বাঘের গতিবিধির খবর রাখে তারপর ফাঁদ পাতে ঠিক ঠিক জায়গায়। অনেক রকমের ট্রাপ আছে—বক্স ট্রাপ, পিট ট্রাপ। ফাঁদ পাতা ছাড়াও অর্গানোফসফেট টাইপের বিষ দিয়েও এরা বাঘকে টার্গেট করে। বাঘ যদি কোনো বড়ো শিকার পুরোটা না-খেতে পেরে আধখাওয়া রেখে যায়, সেই মরা শিকারে বা মড়িতে এরা এই বিষ মিশিয়ে দেয়।'

আমি কাগজে-পড়া তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনায় যোগ দিলাম, 'মুরগির পেটে বিষ ঢুকিয়ে বন্যপ্রাণীকে খাইয়ে মারার খবরও তো দেখেছি।'

'সেটা সাধারণত বনসংলগ্ন গ্রামবাসীরা করে থাকে। কোনও হিংস্র প্রাণীর উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে কিংবা বারবার গবাদি- পশু তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষোভে। আসলে জঙ্গল ক্রমশ কমে আসছে। জন্তুজানোয়ারদের জন্য বাঁচার রসদ বড়ো অপ্রতুল—তাই এত ঘনঘন ম্যান-অ্যানিম্যাল কনফ্লিক্ট।'

জেনেছিলাম তিনি এই জঙ্গলে সেভ টাইগার প্রোজেক্টের অন্যতম কনজারভেশন স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করছেন বছর পাঁচেক হল। তাঁর গাইডে জঙ্গলসাফারির প্রস্তাবটা সানন্দে গ্রহণ করা ছাড়া আর কি-ই বা করার ছিল! লাঞ্চের পর একেবারে দুপুর-দুপুর ফরেস্টগার্ডের জংলা পোশাক পরে পিক-আপ করতে চলে এসেছিলেন।

'আমি এইমাত্র যেন সরসর আওয়াজ শুনতে পেলাম।'

অরণ্যের চিৎকারে মনে মনে পোখরিয়ালের স্মৃতিচারণ থামিয়ে চারপাশের পরিবেশে অনুসন্ধানী চোখে তাকালাম। জঙ্গলের কিছু নিজস্ব আওয়াজ আছে। সেগুলো একটানা বাজতে বাজতে হঠাৎ যেন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। কয়েকটা ত্রস্ত খুরের আওয়াজ পেলাম যেন। কোনো হরিণের পাল বোধহয় কিছুর উপস্থিতি টের পেয়ে পালাচ্ছে?

আমি বাকিদের সাহস জোগাতে মানস অভয়ারণ্যের ট্রেকিংয়ের গল্প তুললাম। বললাম, 'সেবারও তো নিজেরাই হারিয়েছিলাম, আবার ফিরেও এসেছিলাম। মানসে কী কোনও ভয় ছিল না। চল্, আমরা নিজেদের মতো করে জিপ চালিয়ে ফেরার রাস্তা খুঁজে দেখি।'

স্টার্ট দিয়ে উঁচুনীচু রাস্তায় কিছুটা এগোনোর পর জিপটা ঝাঁকুনি দিয়ে থামল। আমিই টেনশনে ব্রেকে পা চেপেছিলাম। রাস্তার একপাশে সবুজ ছোপছোপ জ্যাকেট পরা দেহটা উপুড় হয়ে পড়েছিল।

অরণ্য ককিয়ে উঠল, 'তার মানে বাঘ কাছাকাছি কোথাও আছে। গাড়িতে স্পিড তোল্ জুবিন!'

'মৃত মানুষটাকে এভাবে অসম্মানিত হতে দেব! তা হয় না। মিস্টার পোখরিয়ালের একটা সৎকারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব না?'

আমার কথায় বাকি দুজন ভিজে স্বরে বলল, 'কী করতে চাস? এই মুহূর্তে জিপ থেকে নামা মানে মরণকে ডেকে আনা।'

'বডিটা কেবল চটপট জিপে তুলে নেব। তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। আমরা যদি ফিরতে পারি তাঁকে নিয়েই ফিরব।'

অনেক দ্বিধা নিয়ে আমরা মাটিতে পা রাখলাম। আগু-পিছু চোখ রাখতে রাখতে উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা পূর্ণাঙ্গ শরীরটার কাছে এলাম। প্রাণভয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেহটা জিপের ভেতর ছুড়ে ফেললাম। তারপর কালবিলম্ব না-করে তিনজনেই লাফিয়ে জিপে উঠে পড়লাম। তারপর মরা-মানুষটার দিকে ফিরে তাকিয়ে থমকে গেলাম। এর ওপর তো বাঘের হামলা হয়নি। বরং

এ শরীরে কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। আর এ কার বডি? এ তো পরেশ পোখরিয়াল নয়! অন্য কোনো ফরেস্টগার্ডের? পোচাররা খুন করেছে? গুলির ক্ষত বা রক্ত সেটাই বা কোথায়?

'বিপদে পড়ে নির্বোধের মতো আমরা এসব কী শুরু করেছি!'

এই নতুন সমস্যা ডেকে আনায় বাকি দুজন আমাকে দোষারোপ করতে করতে থেমে গেল। বডিটা ফেলে দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে। চটপট তিনজনে বডিটা তুলেও ধপ করে নামিয়ে নিলাম। জুলজুলে তিন জোড়া চোখ ঝোপের মধ্যে থেকে আমাদের গাড়িটার দিকে চেয়ে আছে।

'এই শেয়ালগুলোকে মৃতদেহ ফেলে ডেকে আনা কী ঠিক হবে? এদের পিছন পিছন মাংসের গন্ধে যদি আরও কিছু আসে?'

'জিপটা স্টার্ট করে জুবিন। ধীরে ধীরে সন্ধে হয়ে আসছে।'

কথা থামিয়ে আমি ড্রাইভিংয়ে মন দিলাম। এমন পথে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই। শিক্ষানবিশের মতো করে টলমল করে চলা যাকে বলে তেমনি করেই চলেছিলাম। একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছিল ভেতরে। মনে হচ্ছিল আরও গহিন জঙ্গালের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি না তো। মিস্টার পোখরিয়ালকে কী বাঘে আক্রমণ করল? এই লোকটাকে বা কারা, কীভাবে মেরে ফেলে দিয়ে গেল?

ভাবতে ভাবতে জিপটা স্লো হতে হতে আবার থেমে গেল। সামনে রাস্তাটা ফুরিয়ে গেছে। আরেকটু পরেই ঘন ঘাসের জঙ্গাল। এই খোলা মাঠের নীচের মাটি কেমন নরম আন্দাজ নেই। এ ঘাসের ওপর হাতির পাল ঘোরাঘুরি করে। এই সময় একপাশে কিছু চিতল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। দূরে দেখতে পেলাম আকাশে লাল আভা। সূর্য এই গোলার্ধ থেকে বিদায় নিতে চলেছে।

'এই বার কী হবে? কোন দিকে ফেরার রাস্তা? সঙ্গোর এই বডিটার কী সদ্‌গতি করা হবে?'

সম্পদের এতগুলো প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে একসাথে ছিল না। একটু ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। আচমকা কিছু বাঁদর চিৎকার করে এডাল থেকে ওডালে লাফিয়ে পালাল।

'আমি একটা চিতাকে গাছে উঠতে দেখলাম যেন!' অরণ্য ভয়ার্তভাবে বলল।

'কই, কোন গাছে?' ঘাড় তুলে এগাছ-ওগাছ তাকিয়ে দেখলাম। কিছু দেখতে পেলাম না।

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'চিতা এ জঙ্গালের হিলি এরিয়াতে দেখা যায়। আমরা সমতলে। কদাচিৎ যে আসে না—এমন নয়।' বলতে বলতে স্বর মৃদু হয়ে এল আমার, আলোর বেলা শেষ হতে চলেছে, ফিসফিস করে বললাম, 'এই অরণ্যে সূর্যাস্তের পর জিপ-সাফারি নিষিদ্ধ। আমরা সেই বারণ করা সময়ে ঢুকে পড়লাম।'

সূর্য ডুবতেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। একটা গা-ছমছমে পরিবেশ। আজব সব ডাকের শব্দ—এক ভয়-ধরানো হরবোলা যেন রে রে করে আমাদের আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দিল।

এবার জিপটা কী ঘুরিয়ে নেব! হয়তো পিছন দিকের রাস্তাটাই ফেরার ছিল। আমরা ভুল করে এগিয়ে এসেছি ফরেস্ট-লজ থেকে আরও দূরে।

জিপটা ঘোরানোর জন্য একটু প্রশস্ত জায়গা খুঁজছিলাম। কিছু ডাইনে ঘুরিয়ে ব্যাক-গিয়ারে পিছনে করলাম। ঠিক যেন নিয়ন্ত্রণ হল না। একটু বেশিই পিছিয়ে জিপটা পিছন দিকে গড়াতে লাগল। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আনাড়ি হাতে স্টিয়ারিং ও পায়ের ব্রেক, অ্যাক্সেলেটরে উলটোপালটা চাপাচাপি করে আরও গণ্ডগোল করলাম। জিপটা কিছুটা নিজের মতো গড়িয়ে প্রায় আকাশের দিকে মুখ তুলে নরম কিছুতে বসে গেল। এরপর কয়েকবার লম্বা দম নিয়ে গাড়িটা ভোঁসভোঁস

আওয়াজ ছাড়ল—শেষে সব চুপচাপ। সকলের প্রায় উলটে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তড়িঘড়ি জিপ থেকে লাফিয়ে নামলাম। এখন কী হবে? কোথাও কিছু নেই। শুধু গভীর জঙ্গল। আর তার মধ্যে কোনো একটা বিপজ্জনক বিন্দুতে আমরা তিনজন।

'যে করে হোক জিপটাকে ঠেলে তুলতেই হবে।'

একবার প্রত্যেকে মোবাইলটা হাতে তুলে দেখে আবার পকেটে ভরলাম। সময় দেখার জন্য? কে জানে। ফের বার করলাম। কল করার চেষ্টা করলাম বারবার। যদি দৈব কৃপায় একটা কল লেগে যায়। কাউকে জানানো যায় আমাদের বিপদের কথা। যে যার ফোন থেকে বৃথা চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। না, কল হওয়া সম্ভব নয়। এখানে কোনো নেটওয়ার্কের সার্ভিস নেই।

জিপটাকে কয়েক দফা ব্যর্থ ঠেলাঠেলির পর ক্লান্ত নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মনে হল—এই জঙ্গল আমাদের গ্রাস করার জন্য-ই নিমন্ত্রণ করে এনেছে। পরমুহূর্তে-ই অনুভব করলাম বিশ্বাসটা কতটা সত্যি। আঁধারে কোথাও বার্কিং ডিয়ার ডেকে উঠল সাবধান করতে। এরপর অকস্মাৎ একরকম চাঞ্চল্য পরিবেশ। আমি শুকনো গলায় ফিসফিস করে বললাম, 'এটা বাঘ আসার সংকেত।'

আমরা দৌড়ে জিপে উঠলাম। সেই দোলায় জিপটা আরও কিছুটা পিছনে গড়িয়ে নালার মতো জায়গায় নেমে গেল। ওপরে আমাদের ফেলে-আসা রাস্তার ওপর দিয়ে কিছু একটা দৌড়ে গেল। সেটার হলুদ চোখ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে ইচ্ছা করলে আমাদের খাদ্য বানাতে পারে। কিন্তু আবার চারপাশ এত নিশ্চুপ লাগছে কেন? শিকারের পিছনে ধাওয়া করে চলে গেল? না পাশে কোথাও ওত পেতে অপেক্ষা করছে? পাশের জনকে ছুঁয়ে বুঝতে পারলাম—সে কাঁপছে।

'অরণ্য! এ কী করছিস!'

বলতে বলতে অরণ্য এই নালা থেকে হামা দিয়ে উঠে আমাদের ফেলে-আসা রাস্তা ধরে উলটো দিকে দৌড়োতে শুরু করল।

'ও নিজেকে সহজতম শিকার বানিয়ে তুলেছে!'

আমরা জিপ থেকে চেঁচাতে লাগলাম ফিরে আসার জন্য। কিন্তু অরণ্য আতঙ্কে পাগল হয়ে গেছে। আমি সম্পদকে নিয়ে ওকে ধরে আনার জন্য নীচের নালার পাশ দিয়ে সমান্তরাল দৌড়োতে চেষ্টা করলাম। টর্চের আলোয় দেখতে পেলাম অরণ্য কিছুটা দৌড়েই হাঁপিয়ে গিয়েছে। সে থমকে দাঁড়িয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমি দ্রুত পা চালিয়ে যেতে গিয়ে শুকনো পাতার মধ্যে নরম কিছুতে পা হড়কে আছাড় খেলাম। টর্চের আলোতে দেখলাম আমার জুতো ও প্যান্টের নীচেটায় কিছুটা রক্ত লেগে রয়েছে। আলোটা আরেকটু সরিয়ে বুঝলাম এটা পাতা চাপা একটা বড়ো বুনো শুয়োরের আধ-খাওয়া অংশ। মিস্টার পোখরিয়াল অর্ধেক খাওয়া শিকার 'মড়ি'র কথা বলেছিলেন।

'অর্থাৎ বাঘটা ভরপেটে কাছাকাছি কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে। বাকিটা খেয়ে শেষ করতে এখানে ফিরে আসবে!'

'তার মানে আমরা একদম নাগালের মধ্যে। যেকোনো সময় যেকোনো দিক থেকে হামলা হতে পারে।' সম্পদ করুণ চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকাল। সামনে কিছুটা দূরত্ব রেখে অরণ্য থম মেরে রয়েছে। ঠিক ওর পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছে গাছের পাতা চুঁইয়ে পড়া এতটুকু চাঁদের আলো।

'দৌড়ে পালিয়ে পার পাব না। জিপটাকে তুলতে পারলে হয়তো বা...'

বলতে গিয়ে কথা আটকে গেল ওর। ওটাকে তোলার চান্সও তো আমাদের বেঁচে ফেরার মতোই ক্ষীণ। আমি অরণ্যকে ধরে আনার জন্য এগোচ্ছিলাম। ছেলেটা এমন বিস্ফোরিত চোখে কী দেখছে? আমি সেদিকে টর্চ ফেলতেই বুঝতে পারলাম। একটা বড়ো শঙ্খচূড় যেতে যেতে হঠাৎ থেমে—দিক পালটে অরণ্যের দিকে আসার উদ্যোগ নিচ্ছে। আলো ফেলতেই সে লেজের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল যেন। আমরা কিছুটা পিছিয়ে এলাম। বুক কাঁপছিল, নিশ্বাস বন্ধ করে হাতের আলোটা স্থির রাখার চেষ্টা করে গেলাম। এক, দুই, তিন...বাইশ, তেইশ...সাপটা আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে দিক বদলাল। সাময়িক হাঁপ ছেড়ে হনহন করে জিপের দিকে চললাম। আমি ড্রাইভারের সিটে, বাকি দুজন নালায় পা ডুবিয়ে পিছনে। এখান থেকে চাঁদটা দেখা যাচ্ছে। মনে হল, উপরে আকাশে শুক্লপক্ষের উদ্‌যাপন চলছে। এখানে আমাদের আসন্ন মৃত্যুর কৃষ্ণছায়া ক্রমশ গ্রাস করতে চাইছে।

'জোর লাগাকে!' অরণ্য আর সম্পদ প্রাণপণ জোরে ঠেলার চেষ্টা করছিল। আমি দাঁত চিপে লাথি মারছিলাম এক্সিলারেটরে। জিপটা সচল হয়ে সামান্য ওঠার উপক্রম করতেই আমরা হইহই করে উঠলাম।

আর সেই মুহূর্তেই আওয়াজটা আমাদের সব হইচই একলহমায় মুছে দিল। আওয়াজটার পরে-পরেই তার শরীরটা প্রকট হল। সাদা আর বাদামি-হলুদের ডোরাকাটা রাজকীয় প্রাণীটা। চাঁদের আলোর আভায় নিজেকে স্পষ্ট করে দেখাল। সে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে। প্রথমে দুলকি চালে ও পরে গতি বাড়িয়ে জিপের সামনেটায় গলা তুলে কিছু মালুম করার ভঙ্গি করল। তারপর জিপের ধাতব বডিটায় সজোরে থাবার আঘাত করল। সম্পদ আর অরণ্যের অবস্থানের দিকে ফিরে তাকানোর অবকাশ ছিল না। আমি জিপের যেদিকে বাঘটা, তার উলটোদিকে যতটা পারা যায় নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইলাম। বাঘটা সামনের দুটো পা জিপের ওপর তুলে উঠে আসতে চাইছে। চোখের সামনে তিনটে সহজ শিকার। আমি দম বন্ধ করে নিজেকে পিছনে সিটের দিকে গড়িয়ে নিয়ে চলেছিলাম। পড়ে গেলাম জঙ্গল থেকে তুলে নেওয়া অপরিচিত মানুষটার মৃত ঠান্ডা দেহটার ওপর। যেন নিজের আগামী অবস্থাটার আভাস করে নিলাম। বাঘটা আরেকবার আওয়াজ তুলে নিজেকে পুরোটা জিপের ওপর তুলে নিতে চাইল। আমি শেষবারের মতো লাফিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইলাম জিপের অন্যদিকে। পারলাম না। অপরিচিতের মৃতদেহটা আমাকে জড়িয়ে নিল যেন। বাঘটা ঠিক আমার ওপরে। সে হামলার জন্য ঝাঁপ দিল

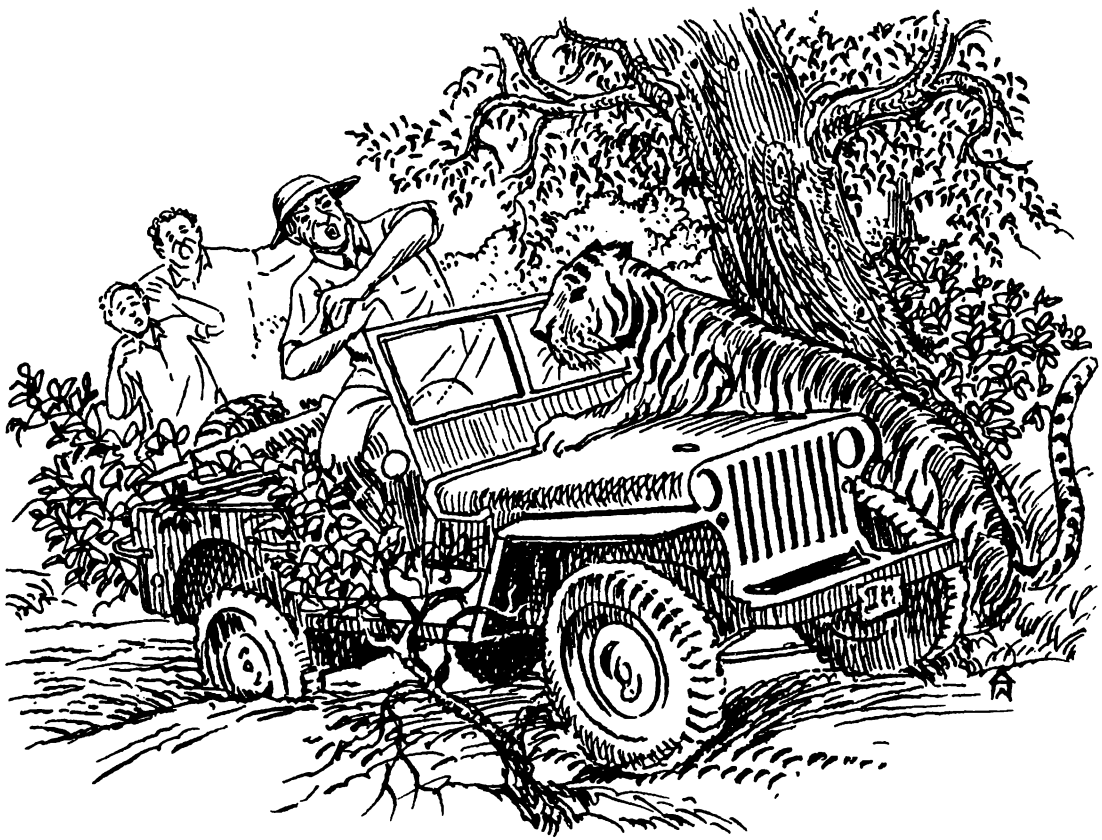

বলে। আমি একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে নিজেকে ঝাঁকালাম। হাতে শক্ত কিছু একটা ঠেকল। মৃতদেহটার প্যান্টের ভিতর পকেট ও কোমরের মধ্যে গোঁজা একটা ৩২ বোর পিস্তল। আমি কী টিপলাম, কোথায় লক্ষ করে চালালাম কিছু মনে নই। শুধু একটা তীব্র আওয়াজ আর তার প্রতিধ্বনি এই জঙ্গালের গোটা নিস্তব্ধটাকে ফালাফালা করে দিল। বাঘটা দৌড়ে লুকিয়ে পড়ল সামনের ঘাসবনের আড়ালে। হয়তো এই অপ্রত্যাশিত হঠাৎ শকটা সামলে আবার ফিরে আসার জন্যে।

'অরণ্য! সম্পদ!'

প্রথম ডাকে সাড়া পেলাম। বুঝলাম ওর দেহটা পাশে ঠেলে আমাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। আমি ঘাড় তুলে সামনের একজোড়া আলোর রেখার দিকে আঙুল তুলে বললাম, 'ওই দেখ্। কারা যেন আসছে।'

আমরা 'হেল্প, হেল্প' বলে চিৎকার করতে করতে পাগলের মতো সেই আলোর দিকে ছুটতে লাগলাম। জিপটা আমাদের কাছে এসে থামল। আমি আর নিজেকে সোজা রাখতে পারলাম না। সামনে লুটিয়ে পড়লাম।

'উঠিয়ে, আপ-লোক খুদকো ইয়ে ক্যায়া খতরনাক মুশিবত বে ডাল দিয়া।'

চোখ মেলে দেখলাম মিস্টার পরেশ পোখরিয়ালকে। তার কনুইয়ের ওপর থেকে কাঁধ পর্যন্ত ব্যান্ডেজে মোড়া। অরণ্য আর সম্পদ আমাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী করে মিস্টার পোখরিয়ালের ওপর সমস্ত ক্ষোভ, হতাশা, ভয় উগরে দিচ্ছিল।

জানলাম, চোরাশিকারিদের একটা গ্যাংয়ের কিছু লোক কয়েক সপ্তাহ আগে পোখরিয়ালের তৎপরতায় ধরা পড়ে। আজ সেই দলের লোক আবার ঢুকেছিল পোচিংয়ের উদ্দেশ্যে। মিস্টার পোখরিয়ালকে রামগঙ্গা নদীতে একা অন্যমনস্ক দেখে চপার দিয়ে আঘাত করে প্রতিশোধের নেশায়।

'আমি আঘাত পেয়ে সেন্সলেস হয়ে পড়ি। নেয়ারেস্ট ফরেস্ট-গার্ড পোস্ট থেকে বোধহয় আওয়াজটা পেয়েছিল। তারা আমায় উদ্ধার করে বাঁচিয়েছে। জ্ঞান ফিরলে আমি ওদের আপনাদের কথা জানাই। বলি, আমার সাথে ট্যুরিস্ট ছিল। ওরা আপনাদের জিপ খুঁজে পায়নি। তারপর থেকে আমরা ঘুরে চলেছি। এখন ফায়ারিংয়ের আওয়াজ পেয়ে এদিকে এসে আপনাদের পেলাম। ঈশ্বর মঙ্গলময়।'

'লেকিন ইয়ে ফায়ারিং?' গার্ড চারজন ও মিস্টার পোখরিয়াল একই প্রশ্ন নিয়ে তাকাল আমাদের দিকে।

আমরা ক্লান্তি ও অবসন্নতায় জড়ানো গলায় বললাম, 'পিস্তলের গুলি। রক্ত দেখে আপনি বাঘের পেটে গেছেন ভেবে জিপ নিয়ে নিজেরা ফেরার চেষ্টা করি। তারপর রাস্তা গুলিয়ে যায়। পথে একটা মৃতদেহকে আপনার দেহ ধরে নিয়ে জিপে তুলে নিই...।'

'ডেড বডি?'

মিস্টার পোখরিয়াল একরাশ বিস্ময় নিয়ে গার্ডদের সঙ্গে আমাদের জিপের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। 'এ তো কুখ্যাত পোচার। একে কে মারল?' এরপর তিনি নিজেদের জোরালো সার্চলাইটটা সামনে ধরে বডির নাক-মুখ পরীক্ষা করে বললেন, 'স্নেক বাইট। প্রোবাবলি কিং কোবরা।'

'আমাদের বোধহয় তাহার দর্শনও হয়েছে।' আমি বলতে যাচ্ছিলাম।

দেহটা সার্চ করে তার পকেট থেকে প্যাকেটের মোড়কে Themix 500 নাম মার্ক করা কয়েকটা ওষুধের ফাইল বেরোল। মিস্টার পোখরিয়াল সেগুলো দেখিয়ে বলল, এই লোকটা মড়িতে বিষ মিশিয়ে বাঘ মারার টার্গেট নিয়েছিল। নিজেই বিষের ছোবল খেয়ে গেছে। কিন্তু যদি ও মড়িতে বিষ মিশিয়ে থাকে, তবে বাঘটা খেয়ে মারা যাবে।

মিস্টার পোখরিয়াল উদ্‌বিগ্ন ও উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরও একটাকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না।'

'আমরা মড়িটা দেখেছি, ওইদিকে।' মৃত্যুর দরজা থেকে আবার জীবনের সান্নিধ্য ফিরে পেয়ে উৎসাহ পাচ্ছিলাম। সবাই মিলে বুনো শুয়োরের অবশিষ্টাংশটা ধরাধরি করে তুলে একটা বস্তায় ভরে নেওয়া হল। পোচারের মৃতদেহটা সঙ্গে নেওয়া হল পোস্টমর্টমে পাঠানোর জন্য।

আপাতত আমরা যাত্রা শুরু করেছি। চলেছি ধিকালা-ফরেস্ট লজের দিকে। আমি বলে চলেছি আমাদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। বাঘের মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তটা। লাকিলি পিস্তলটা না-পেয়ে গেলে!

মিস্টার পোখরিয়াল শুনতে শুনতে আমাদের সবার পিঠ চাপড়ে সাহসের প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'আপনারা নিজেরা ফাইট করে বাঁচলেন। আর বাঁচালেনও—বিষ খাওয়ার হাত থেকে, আমাদের এক গর্বের সম্পদকে।' বলতে বলতে হঠাৎ বললেন, 'আরে ওই দ্যাখো।'

আমরা একসাথে পিছন ফিরে দেখলাম বাঘিনিটাকে। আমাদের জিপের থেকে কিছুটা দূরে। চাঁদের আলোয় দুটো বাচ্চা নিয়ে খেলছে।

মিস্টার পোখরিয়াল বললেন, প্রার্থনা করি, ওর চলার পথে কোনো বিষ-মাখানা খাবার বা ফাঁদ যেন কোনোদিন না-থাকে।

আমরা এগিয়ে চললাম। বাঘিনিটা জিপটাকে যেতে দেখে একটা গম্ভীর হুংকার ছাড়ল। কে জানে বাঘেদের ভাষায় ধন্যবাদ বলল কি না!

দীপান্বিতা রায়

বাঘের শখ

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ। গায়ে তার ডোরা ডোরা দাগ। সোঁদরবনের বাঘ সে। ডোরা দাগ তা থাকবেই। তা সে বাঘ একদিন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হেলতে-দুলতে ঢুকে পড়েছে এক হাটের মধ্যে। সেদিন অবিশ্যি হাটবার নয়। হাট তাই শুনশান। বাঘ তো শুঁকে শুঁকে দেখছে পচা কপি পাতা, পোকায় খাওয়া বেগুন, ছিটিয়ে থাকা মাছের আঁশ আর ক্রমশই ভারি রিক্ত হয়ে উঠছে। হাঁস, মুরগি, ছাগলের গনূ আছে দিব্যি কিন্তু ঘুরে-টুরে বেড়াচ্ছে না একটিও। বেজার মুখে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বাঘের চোখে পড়ল একটা বাঁশের মাচা। বেঘো বুদ্ধি তো। বাঘ অমনি লাফ দিয়ে উঠতে গেছে মাচায়। তক্ষুনি লেগেছে দারুণ এক চমক।

আসলে মাচাটা হল এক নাপিতের। প্রতি হাটবারে সে লোকের চুল-দাড়ি কাটে। তার খদ্দেররা বসে ওই মাচায়। চুল-টুল কাটা হয়ে গেলে, তারা যাতে নিজেদের মুখটি টুক করে দেখে নিতে পারে, তাই মাচার সামনের বাঁশে একটা আয়না ঝুলিয়ে রেখেছে নাপিত। দিনের শেষে ক্ষুর, কাঁচি, সাবান, ফটকিরি সব বাক্সে ঢুকিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলেও আয়নাটা সে আর নিয়ে যায় না। মরচে-ধরা টিনে-বাঁধানো আয়নাটা একা-একাই সারাদিন ঝোলে বাঁশের গায়ে। লাফ দিয়ে মাচায় উঠতে গিয়ে তাতেই নিজের মুখ দেখে আঁতকে উঠেছে বাঘ। আরে, এই হোঁতকামতো, সারা মুখে বিশ্রী কালো কালো দাগ-কাটা জন্তুটা আবার কে?

প্রথমেই তো দাঁত খিঁচিয়ে, গোঁফ ফুলিয়ে অজানা জন্তুটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল বাঘ। কিন্তু জন্তুটা ভয়ও পেল না, পালিয়ে গেল না। বরং উলটে বাঘ দেখলে, সে ভেংচি কাটলেও

ও ভেংচি কাটছে, কান নাচালে, কান নাচাচ্ছে। ব্যাপারটা কী? বাঁশের খুঁটির চারপাশটা গোল গোল করে কয়েকবার ঘুরে, শেষপর্যন্ত বাঘ বুঝতে পারলে ওটা আসলে সে নিজেই। আর অমনি ভারি মন খারাপ হয়ে গেল তার। সে হল গিয়ে বনের রাজা আর তাকে কি না অমন বিচ্ছিরি দেখতে! তাদের জঙ্গালে তো হরিণ আছে, শুয়োর আছে, কই কারুর মুখে তো এমন কালো ডোরা নেই। জঙ্গালের আশপাশে এত মানুষ থাকে, কাউকে তো কখনো ডোরাকাটা দেখেনি সে। নাঃ, ডোরা মুছে ফেলার নিশ্চয়ই কোনো উপায় আছে। সবাই সেটা জানে। এবার তাকেও জেনে নিতে হবে। কিন্তু কার কাছ থেকে জানা যায়? হরিণকে তো জিজ্ঞাসা করার কোনো উপায় নেই। তাকে দেখলেই হাওয়ার বেগে পালিয়ে যাবে। শুয়োরও কেমন যেন গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের। তার থেকে মানুষই ভালো। বুদ্ধিশুদ্ধি পরিষ্কার। ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে পারবে। হাট থেকে না-নদীর ধার বরাবর রাস্তা দিয়ে কিছুদূর গেলে গ্রাম। বাঘ রওনা দিল সেদিকে।

শীতকাল। ধান উঠছে। সারাদিন ধরে ধান ঝাড়াঝাড়ি বাছাবাছির কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল পুঁটু। অন্য মুনিশরা কাজ সেরে বাড়ি চলে গেছে। পুঁটু মনিব-বাড়িতেই থাকে। তার মা রান্নার কাজ করেন। আর পুঁটু নিজে করে না এমন কাজ নেই। তা সারাদিন খাটাখাটনির পর খড়ের গাদার পাশে বসে পুঁটু একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। চোখ দুটোও লেগে এসেছে। এমন সময় কানের পাশে ঘেঁয়াক শব্দ শুনে আঁতকে উঠে দেখে, ঠিক নাকের ডগায় বসে আছে মস্ত এক বাঘ। পুঁটুর তো চুল খাড়া, হাত-পা ঢুকে গেছে পেটের মধ্যে, প্রাণ আইঢাই করছে। ভয়ে মূর্ছা যাবার জোগাড়।

বাঘটা কিন্তু মোটেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল না। বরং আর একবার ঘেঁয়াক করে দাঁত খিঁচিয়ে গুমগুমে গলায় জিজ্ঞাসা করলে, 'মুখের দাগগুলো গেল কী করে শুনি?'

পুঁটুর তখন ভয়ের চোটে দাঁতে-দাঁত লাগছে ঠক্‌ঠক্‌ করে। তবু কোনোওরকমে বললে, 'কীসের দাগ?'

'তোর মুখের কালো দাগগুলো গেল কী করে শুনি?'

একটু আগেই ধান সেদ্ধ-করা কড়াই তুলতে গিয়ে পুঁটুর মুখে ভুসো-কালির দাগ লেগেছিল। সে ভাবলে বাঘ নিশ্চয়ই সে-কথাই বলছে। তাই তাড়াতাড়ি বললে, 'সাবান দিয়ে মুখ ধুতেই উঠে গেছে।'

'তাহলে চল্‌ আমার মুখটাও সাবান দিয়ে ধুয়ে দিবি।'

শুনে তো পুঁটু অবাক, 'সে কী, তুমি আবার সাবান দিয়ে মুখ ধোবে কী গো!'

'কেন, আমার মুখে এই কালো কালো দাগগুলো কী খুব ভালো দেখাচ্ছে?'

'ও তো তোমার ডুরে দাগ, ও তো সাবানে উঠবে না।'

'আমার কথা না-শুনলে কিন্তু আমি ঘাড় মটকে দেব।'

পুঁটু আর কথা না বাড়িয়ে বাঘকে নিয়ে গেল পুকুরঘাটে। তারপর একটু করে সাবানজলে

ভিজিয়ে সেই বাঘের মুখে ঘষতে শুরু করেছে, অমনি বাঘ চেঁচিয়ে উঠল, 'উহুঁ, উহুঁ।'

'আরে আরে, চোখ বুজে থাকো, চোখ বুজে থাকো। মুখে সাবান দিলে চোখ বুজে থাকতে হয়, তাও জানো না।'

বলে উঠল। চন্দন সাবানের গন্ধটা ভারি বিচ্ছিরি লাগলেও লক্ষ্মী ছেলের মতো চোখ বুজে বসে রইল বাঘ। পুঁটু পুকুর থেকে জল এনে তার মুখটা ভালো করে ধুয়ে দিল। মুখটুক ধুয়ে প্রথমটায় বেশ খুশি হয়েছিল বাঘ। কিন্তু পুকুরের টলটলে জলে, নিজের ছায়া দেখে আবার তার মেজাজ গরম হয়ে গেল। 'দাগ তো ওঠেনি?' ভয়ে ভয়ে দু-পাশে মাথা নাড়াল পুঁটু। 'আজ রাতটা ভাবার সময় দিলাম। ভেবেচিন্তে আমার দাগ তোলার একটা উপায় বার কর্। কাল সকালে আমি তোর জন্য হাটের ধারে অপেক্ষা করব। চালাকি করার চেষ্টা করিস না যেন।' পুঁটুকে হুমকি দিয়ে শীতের মরে-আসা বেলায় হেলে-দুলে জঙ্গালেতে দিকে মিলিয়ে গেল বাঘ।

সারারাত ঘুম এল না পুঁটুর। বাঘের ডোরা কী মুছে ফেলা যায় নাকি? সে তো অসম্ভব কাজ। রাতভর এপাশ-ওপাশ করে, যখন সবে সকালের আলো ফুটিফুটি করছে, তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সূর্য উঠে, কুয়াশার চাদর একটু পাতলা হতেই চা-মুড়ি খেয়ে পুঁটু গেল কুমোরদাদুর বাড়ি। গ্রামের অন্য প্রান্তে কুমোরদাদুর বাড়ি। সারাবছর গ্রামের মানুষের জন্য সরা, হাঁড়ি, খুরি গড়ে। তবে পুজো আসলেই শুরু হয়ে যায় ঠাকুর গড়া। বুড়ো, মাথার চুল সব সাদা, তবে এখনও বেশ শক্তপোক্ত।

পুঁটু গিয়ে সব কথা খুলে বললে। শুনে তো কুমারদাদুর মাথায় হাত। 'সে আবার কীরে! বাঘের ডোরা, তা কী আর মোছা যায়?'

ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলে পুঁটু বললে, 'তুমিই একমাত্র আমাকে বাঁচাতে পারো দাদু।'

'কী করে, কী করে হবে?' ব্যস্ত হয়ে বললেন কুমোরদাদু। পুঁটুকে তিনি ভারি ভালোবাসেন।

'তোমার হলুদ রঙের বাটি আর তুলিটা নিয়ে চলো। বাঘের মুখের কালো ডোরাগুলোর ওপরে হলুদ রং লাগিয়ে দেবে। তাহলেই আর দেখা যাবে না।'

'বারে পুঁটু, তোর তো খুব বুদ্ধি।' খুশি হয়ে বললে কুমোরদাদু।

ঝোলাতে হলুদ রং, রং গোলার বাটি তুলি সব গুছিয়ে নিয়ে কুমোরদাদু আর পুঁটু চলল হাটের দিকে। সেদিন হাটবার নয়। শুনশান হাটের একপাশে গোঁফ দুলিয়ে বাঘ বসেছিল। বুক দুরদুর করলেও কুমোরদাদু খুব যত্ন করে বাঘের মুখের কালো ডোরাগুলো হলুদ রং দিয়ে ঢেকে দিল। নাপিতের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ঘেঁয়াত করে গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে জঙ্গালের দিকে রওনা দিল বাঘ। পুঁটু আর কুমোরদাদুও নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরল।

কিন্তু বাঘের দাগ ঢাকতে কুমোরদাদু তো লাগিয়েছে গোলা রং। জল লাগলেই তো সে রং উঠে যাবে। কিন্তু বাঘের তো আর সে কথা জানা নেই। সে দিব্যি নদীতে মুখ ডুবিয়ে জল

খাচ্ছে, সাঁতার কাটছে। তাই মুখের রং তো ধুয়ে গেছে পরদিনই। কিন্তু বাঘের তো সে কথা জানা নেই। সে দিব্যি ফুর্তিতেই আছে। তবে কয়েকদিন পর তার আবার ইচ্ছে হল নিজের সুন্দর চেহারাটা দেখার। তাই ভোর না-হতেই হাজির হল নাপিতের আয়নার সামনে। কিন্তু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে বাঘের তো চক্ষু চড়কগাছ। গোটা মুখ জুড়ে ঠিক আগের মতোই কালো কালো ডোরা।

পরদিন দুপুরবেলা পুঁটু যখন পুকুরে চান করতে গেছে, তখন তাকে খপ্ করে ধরে ফেলল বাঘ। তারপর এই মারে তো সেই মারে। তাকে ঠকানো। এত বড়ো সাহস? পুঁটু বেচারি অনেক কষ্টে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে তো তখনকার মতো নিস্তার পেল। কিন্তু বাঘ সেদিন আর নড়ল না। বললে, এখুনি বসে পুঁটুকে বুদ্ধি বাতলাতে হবে কী করে ডোরা মোছা যায়, কী করে বাঘকে আরও সুন্দর করা যায়!

বেচারা পুঁটু গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে, শীতকাল। ফটফট করছে, নাকের ডগায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে উত্তুরে হাওয়া, কিন্তু রেহাই নেই। অনেক ভেবে পুঁটু বললে, 'উপায় একটা আছে। কিন্তু তাতে মেলা খরচ।'

'কী রকম?' জানতে চাইল বাঘ।

'নদি পেরিয়ে ওপারে গেলে যে গঞ্জ আছে, সেখানে একটা দোকান আছে। সেখানে গেলেই নাকি সবাই সুন্দর হয়ে যায়। কালো-বোঁচা মেয়েদেরও নাকি ফরসা, হুরি-পরিদের মতো দেখতে হয়ে যায়।'

'তাই নাকি!' বাঘ তো রীতিমতো উৎসাহিত।

'না, মানে,' একটু ঢোঁক গিলে পুঁটু বলে, 'আমার মুনিব, বাড়িতে তো অনেক মেয়েরা কাজ করে থাকে। তারা না-খেয়ে-খেয়ে টিফিনের টাকা জমিয়ে চোখের নীচের, গালের পাশের কালো দাগ তুলতে যায়। দাগ ওঠে কিনা তা অবশ্য আমি তেমন ঠাহর করে দেখনি কোনোদিন। তবে তুমি যেতে পারো। টাকা লাগবে কিন্তু।'

সেদিন রাতে গ্রাম জুড়ে হৈচৈ। সুদখোর মহাজন বিষ্টু বুড়োর বাড়িতে বাঘ পড়েছে। বুড়ো তখন বসে বসে টাকা গুনছিল। বাঘের ডাক শুনে ছুটে গিয়ে গোয়ালের মধ্যে লুকোয়। বাঘ অবশ্য সেখানে তাকে খুঁজতে যায়নি। তবে টাকা-পয়সা আর বন্ধকী গয়নাগাঁটি, ভর্তি বাক্সটি নিয়ে বসে গেছে। বাঘের এমন বেঘোমি নিয়ে সবাই যখন আলোচনায় ব্যস্ত, সেই সুযোগে পুঁটু চুপিচুপি ক্যাশব্যাক্সটা লুকিয়ে রাখল পুকুরধারে একটা ঝোপের ভিতর।

কিন্তু তাতেই কী আর সমস্যা মেটে। গঞ্জে যেতে হলে নদী পেরিয়ে, ভ্যান-রিকশাতে চেপে যেতে হবে বেশ খানিকটা পথ। এতখানি রাস্তা বাঘ যাবে কী করে, শেষপর্যন্ত ভেবে-চিন্তে একটা চটের বস্তায় বাঘকে ঢোকাল পুঁটু। বস্তার মুখটা ভালো করে নিজের গামছা দিয়ে বাঁধল। তারপর অতিকষ্টে সেটাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে উঠল নৌকোয়। বস্তার গায়ে ছোটো ছোটো কয়েকটা ফুটো ছিল। তাই বাঘের নিশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়নি। তবে সে ছিলও খুব লক্ষ্মী ছেলে হয়ে। এবড়ো -খেবড়ো রাস্তায় ভ্যান-রিকশার দারুণ ঝাঁকুনি, তবু মুখ দিয়ে এতটুকু ঘেঁয়াও আওয়াজ বার করেনি।

গঞ্জের সাজগোছের দোকানটায় পুটু যখন পৌঁছোল তখন বেলা দুপুর। দোকান ফাঁকা, মালকিন নখে নেলপালিশ লাগাতে লাগাতে মন দিয়ে রেডিয়ো শুনছিল। পুঁটুকে বস্তা নিয়ে ঢুকতে দেখে

ভারি বিরক্ত হয়ে কড়া গলায় বলল, 'কী ব্যাপার, কী চাই?' বস্তা নামিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে পুঁটু বললে, 'না, মানে, কালো দাগ তুলতে হবে তাই...।'

'কালো দাগ তুলতে হবে? কার? তোমার?'

'না না...এর।' হলেই পুঁটু বস্তার মুখটা দিল খুলে। আর বস্তা থেকে ঘেঁয়াক করে বাঘকে বেরিয়ে আসতে দেখে তক্ষুনি মুচ্ছো গেল দোকানের মালকিন।

জলটল ঢেলে তার জ্ঞান ফেরাতে বেশ কিছুটা সময় গেল। তারপরেও অবশ্য হাত-পায়ের কাঁপুনি থামছিল না। কিন্তু পুঁটু তাকে বুঝিয়ে বললে যে বাঘ এমনিতে ভারি ভালোমানুষ। সে শুধু মুখের দাগ গুলো উঠিয়ে সুন্দর হতে চায়। তার জন্য অনেক টাকাও দেবে।

টাকার কথা শুনে মনে জোর পেল মালকিন। উঠে বসে বাঘকে মন দিয়ে দেখে বললে, 'উহুঁ। খুব কঠিন ব্যাপার।'

'দাগ তোলা যাবে না?' উদ্‌বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল পুঁটু।

'যাবে। কিন্তু তারপরেও কিন্তু সুন্দর দেখতে হবে না।'

'কেন, কেন?' জানতে চাইল বাঘ।

'তোমার তো রীতিমতো হোঁৎকা চেহারা। সুন্দর দেখতে হতে হলে রোগা হতে হবে। কাঠি কাঠি রোগা। না-হলে কেউ সুন্দর বলবে না।'

'কী করে রোগা হব?'

'খাবে না। উপোস করবে। মাঝে মাঝে এই ফল-টল মানে শশা-টসা খাবে।'

'শশা!' বাঘের মুখ দেখে মনে হল তার নাকের ওপর বুঝি মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে। মালকিন কিন্তু আবার বলল, 'হ্যাঁ, শসা। খিদে পেল আর অমনি একটা নধর শুয়োর খেয়ে নিলে...ওসব চলবে না। একমাস সময় দিলাম। রোগা হয়ে এসো। তারপর তোমার দাগ-টাগ তুলে এমন চেহারা বানিয়ে দেব যে জঙ্গালসুদ্ধ জন্তু-জানোয়ার ধন্য ধন্য করবে। আর মানুষরা তো তোমাকে দেখলেই টিভি সিরিয়ালের জন্য ডেকে নেবে।'

খুশিমনে জঙ্গালে ফিরে এল বাঘ। তারপর একমাস ধরে চলল কৃচ্ছ্রসাধন। নাকের ডগায় হরিণ-শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবু সে ফিরে তাকায় না। কিন্তু গাছে চড়ে ফলটল পাড়া তো আর অভ্যাস নেই। তাই বাঁদরদের সঙ্গে ভাব করতে হয়েছে। পুঁটু নিজেও মাঝে মাঝে জামরুল-সবেদা-পেঁপে এসব দিয়ে আসে। এইভাবে একমাস পেরোলে বেশ হাড়-জিরজিরে রোগা হয়ে ফের পুঁটুর সঙ্গে সাজগোজের দোকানে হাজির হল বাঘ। এবার অবশ্য তাকে বইতে পুঁটুর আর তত কষ্ট হয়নি।

বাঘকে দেখে রীতিমতো খুশি হয়ে দোকানের মালিকিন বললেন, 'বাঃ, এই তো দিব্যি হয়েছে। এবার বসে পড়ো চেয়ারে।' বাঘ অমনি লাফ দিয়ে চেয়ারে চড়ে বসল। তার দু-চোখের ওপর

দু-টুকরো টম্যাটো চাপা দিয়ে শুরু হল কেরামতি। সেসব চলল বেশ কয়েক ঘণ্টা। তারপর চোখ থেকে টম্যাটো সরিয়ে মালকিন তার সামনে আয়না ধরল। আঁতকে উঠল বাঘ। এটা আবার কে? কালো দাগ নেই বটে, কিন্তু গোটা মুখটাই কেমন যেন পাটকিলে রঙের। গোঁফগুলো ছোটো করে ছাঁটা। চোখের ওপর আবার কীসব চকচক করছে। থাবাগুলোতে একটুও কাদা-ময়লা লেগে নেই।

এমনকী নখগুলো পর্যন্ত গোল গোল, ভোঁতা ভোঁতা। একটুও পছন্দ হল না বাঘের। কিন্তু কিছু করার নেই। সবাই এমন 'আহা-আহা' করছে যে বাঘও শেষপর্যন্ত বেজার মুখে কাষ্ঠ হাসি হেসে থলিতে গিয়ে ঢুকল। টাকাপয়সা মিটিয়ে দিল পুঁটু মালকিন বললেন, 'প্রত্যেক মাসে একবার করে আসতে হবে। তাহলেই বাঘকে সবসময় এরকম সুন্দর দেখাবে।'

এক সপ্তাহ হয়ে গেল সাজগোজ সেরে জঙ্গালে ফিরে এসেছে বাঘ। কিন্তু তার মেজাজ একেবারে তিরিক্ষি হয়ে আছে। জঙ্গালের কেউ তাকে দেখে সুন্দর বলেনি! হরিণরা আঁতকে উঠেছে, শুয়োররা মুখ বাঁকিয়েছে আর বাঁদররা তো রীতিমতো ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে হেসেছে। এদিকে খাওয়া-দাওয়ারও খুব অসুবিধা। বড়ো জন্তু ধরার মতো শক্তি নেই শরীরে। নখগুলি সব ভোঁতা। তাই ছোটো জন্তুও পালাচ্ছে থাবা ফসকে। কলা-পেঁপে খেতে খেতে বাঘের এবার কান্না পাচ্ছে।

এমনি করেই কেটে গেল আরও কয়েকটা দিন। দুপুরবেলা। রোদ এখন বেশ চড়া। গাছতলায় বসে বসে ঝিমোচ্ছিল বাঘ। হঠাৎ চোখ মেলে দেখে, একেবারে তার নাকের ডগায় বসে একমনে কাঠবাদাম খাচ্ছে একটা মোটাসোটা খরগোশ। খানিকটা অভ্যাসেই থাবা চালিয়ে দিলে বাঘ। ওমা, মরে গেল খরগোশটা। চমকে উঠে বাঘ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলে নিজের থাবা। দশ দিনে নখ আবার অনেকটা বড়ো আর ছুঁচলো হয়ে গেছে। অনেকদিন পর খরগোশের মাংস খেয়ে সেদিন নিশ্চিন্তে ঘুমোল বাঘ।

ঠিক ছিল একমাস পরে পুঁটুর সঙ্গে বাঘ আবার যাবে গঞ্জের দোকানে। সেই মতো মাস ফুরোলে পুঁটু এসে অপেক্ষা করছে হাটের ধারে। একটু পরেই জঙ্গাল থেকে হেলেদুলে বেরিয়ে এল বাঘ। তাকে দেখেই আঁতকে উঠলে পুঁটু, 'এ কী! তুমি তো আবার সেই হোঁৎকা হয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ হয়েছি তো। বেশ হয়েছি। ঠিক হয়েছি। মোটেই আমি আর সুন্দর হতে চাই না। সুন্দর হতে গিয়ে মরি আর কী!' রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললে বাঘ। পুঁটু তো ভয়ে-ময়ে চুপ। 'তা ছাড়া ওরকম হাড়-পাঁজরা বের করা চেহারায় আমাকে একটুও সুন্দর দেখাচ্ছিল না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। এখন মুখের এই পাটকিলে রংটা কোনোরকমে উঠলে বাঁচি।' বাঘের মনের কথাটি এতক্ষণে ঠিকঠাক বুঝল পুঁটু। ভারি আনন্দ হল তার। পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, 'ঠিক বলেছ। তোমার তাগড়াই চেহারায় হলুদের ওপর কালো ডোরা কী সুন্দর দেখায়! চিন্তা কোরো না। নোনা জলে মুখ ধুলে ওই পাটকিলে রংও ক-দিন বাদেই উঠে যাবে। তবে তুমি কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান। একবার গিয়েই সার কথাটি বুঝেছ। মানুষরা তো দেখি বারে বারে যায় আর রাশি রাশি টাকা দিয়ে বোকা বনে।' পুঁটু মুখে নিজের প্রশংসা শুনে ঘেঁয়াও করে হাসলে বাঘ। তারপর গলা নামিয়ে বললে, 'ক্যাশবাক্সের বাকি টাকাগুলো তুমিই নিয়ে নিও। ভালোমতো খেয়েদেয়ে চেহারাটা তাগড়াই বানাও। খবরদার গঞ্জের দিকে যেন পা বাড়িও না। খরখরে জিভ দিয়ে পুঁটুর হাতটা একটু চেটে দিয়ে দুলকি চালে জঙ্গালের দিকে এগোতে এগোতে বাঘ ভাবলে, 'নাঃ, জব্বর খিদে পেয়েছে। আজ একটা নধর শুয়োর না-মারলেই নয়।'

চিন্ময়কুমার দাস

মাছগুলো কোথায় পালিয়ে গেল

গুয়াহাটির পাণ্ডু লোকনাথ মন্দিরের পাশের বাগানে তিনটি বিড়ালের বাচ্চা একমনে খেলা করছে। তাদের মধ্যে একটা বাচ্চার রং অদ্ভুত হলুদ। নরম তুলতুলে বিড়ালের বাচ্চা কোনো কিশোরের পছন্দ হবে না, তা কী হয়! অথচ প্রতীক সেদিক থেকে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিল।

লোকনাথ মন্দিরকে বাঁয়ে রেখে দশ-বারো পা এগিয়ে গেলেই একটি তিনকোনা পুকুর। টলটলে সবুজ তার জল। সেখানে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে ছোট্ট জাল ফেলে মাছ ধরছে একটি লোক। লোকটির খালি গা। পরনে সবুজ গামছা।

প্রতীক পায়ে-পায়ে সেই পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াল। তার উপস্থিতি টের পেয়ে জাল টানার এক ফাঁকে মাথা ঘুরিয়ে লোকটি তার দিকে চেয়ে একবার হাসল। বলল, 'কীগো খোকা, মুখটা ওইরকম শুকনা-শুকনা ক্যান? তুমার বুঝি মন খারাপ?'

একথার জবাব না-দিয়ে প্রতীক নিরুত্তাপ গলায় অন্য কথা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী কী মাছ ধরো?'

লোকটি বলল, 'তা অনেক মাছ। কত শুনবা। খইলস্যা, ট্যাংরা, পুঁটি, বইরাল্যা, রুইয়ের পনা...। মাছের কী কম জাত আছে খোকা?'

লোকটি একটু বাদে জাল গোটাতে গোটাতে জল থেকে পাড়ে উঠে এল। তারপর জালটাকে ঢালু পাড়ের সাদা মাটিতে বিছিয়ে দিল। প্রতীক দেখল জালের মাঝখানে অজস্র কচুরিপানা

আর কাদা। তার ফাঁক-ফোকরে লাফাচ্ছে অজস্র ছোটো- ছোটো মাছ। লোকটি মাটিতে বসে জালের কাদা আর কচুরিপানার মধ্যে থেকে মাছ বেছে-বেছে একটি মুখভাঙা মাটির হাঁড়িতে তুলে রাখতে লাগল।

লোকটি বলল, 'তুমারে যে জিগাইলাম, মুখে হাসি নাই ক্যান?'

লোকটির প্রশ্নকে এবারও পাত্তা দিল না প্রতীক। সে বরং মাটির হাঁড়ির দিকে ঝুঁকে চেয়ে থাকতেই বেশি আগ্রহ দেখাল।

জাল থেকে মাটির হাঁড়িতে উঠে এসেও ছোটো-ছোটো রকমারি মাছগুলির যেন একটুও বিরাম নেই! হাঁড়ির ওইটুকু জলের মধ্যেই সাদা-কালো মাছগুলো খলবল-খলবল করছে।

লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে খোকা তুমার? ছোটো পোলাপাইনের মুখে হাসি না-দেখলে যে আল্লার বড়ো কষ্ট হয়!'

এতক্ষণে প্রতীক কিছুটা অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, 'কে তোমার আল্লা? তোমার বন্ধু আল্লা কী জানে না যে, আজ আমার মন ভালো নেই?'

লোকটি বলল, 'ক্যানরে খোকা, মন ভালো নেই ক্যান? কেউ তুমারে বকছে? বাবা-মা...'

প্রতীকের মন বারবার মাটির হাঁড়ির মধ্যে নৃত্যরত মাছগুলোর দিকেই চলে যাচ্ছে। সেদিকে চেয়েই সে বলল, 'মাছগুলো এত লাফাচ্ছে কেন? আমার তো মন খারাপ। কিন্তু আজ ওদের কীসের এত আনন্দ?'

লোকটি বলল, 'খোকা, তুমি শুধু মাছগুলারেই দেখলা! আল্লার আদেশ আছে, এই দুনিয়ার সবারই ডেইলি ডেইলি খুশিতে থাকন উচিত।'

প্রতীক আবারও জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমার আল্লা? তাকে পেলে একবার জিজ্ঞেস কোরো, আমার কেন কোনো আনন্দ নেই।'

ইতিমধ্যে জাল থেকে মাছ বাছা হয়ে গিয়েছিল। কচুরিপানাগুলোকে পাড়ের অদূরে ছুড়ে ফেলে, জালটাকে পুকুরের জলে ধুয়ে এনে রোদের মধ্যে বিছিয়ে দিতে-দিতে লোকটি বলল, 'অল্প দাঁড়াও।' তারপরই হঠাৎ করে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রতীককে দারুণ অবাক করে দিয়ে পরক্ষণেই লোকটি আবার তার কাছে হাজির হল।

প্রতীক চেয়ে দেখল, লোকটির হাতে একটুকরো কচি কলাপাতা। সেই কলাপাতাকে অসাধারণ দক্ষতায় বাদামের ঠোঙার মতো করে ভাঁজ করল লোকটা। তারপর এগিয়ে গেল পুকুরের দিকে। কলাপাতার ঠোঙাটিতে অঞ্জলিবদ্ধ ডান হাত দিয়ে খনিকটা জল তুলল। এরপর জল থেকে পাড়ে উঠে এসে, মাটির হাঁড়ি থেকে চোদ্দো-পনেরোটা মাছ তুলে কলাপাতার ঠোঙার জলে ছেড়ে দিল। এবার সেটা অতিসাবধানে তুলে দিল প্রতীকের হাতে।

হাতে নিয়ে প্রতীক দেখল, কলাপাতার ঠোঙার সবুজ জলে ছোটো ছোটো মাছগুলো যেন আরও-আরও বেশি পুকুরের আনন্দে সাঁতার কাটছে। মাঝে-মাঝে জলের উপরে লাফ দিতেও কোনো কসুর ছাড়ছে না তারা। যেন এক্ষুনি মাছগুলো জল থেকে উপরে উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার হলুদ শার্টে। দৃশ্যটা সত্যিই মজার। প্রতীকের অন্ধকার মুখে এতক্ষণে কিছুটা হাসির আভাস ফুটে উঠল।

এই ভাবান্তর লক্ষ করে লোকটি এবার প্রতীকের কাঁধে হাতের খোঁচা দিয়ে একটা ইশারা করল। তারপর লোকটি আবার পুকুরের দিকে নেমে গেল। প্রতীকও তাকে অনুসরণ করল। পুকুরের জল যখন প্রতীকের কোমর প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে, তখন লোকটি তাকে থামার ইশারা করে বলল, 'এইবার একখান-একখান কইর‍্যা মাছগুলানরে জলে ছাইড়্যা দাও। দ্যাখবা কী মজা, কী আনন্দ!'

প্রতীক বাধ্য ছেলের মতো তা-ই করল। কলাপাতার ঠোঙাটাকে বাঁ-হাতে ধরে, ডান হাত দিয়ে একটা-একটা করে মাছ তুলে জলের মধ্যে ছেড়ে দিতে থাকল। সে এক ভারি মজার দৃশ্য! মাছগুলো জলের মধ্যে পড়েই, তার দিকে ফিরে, ফ্যালফ্যাল করে দেখতে লাগল। তারপর কোনো কোনো মাছ টুপ করে জলের অন্ধকার গভীরে হারিয়ে যেতে লাগল। আবার কেউ-কেউ তার কোমরের চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করল। ছোটো-ছোট মাছগুলোর এই কীর্তি দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না প্রতীক। প্রথম বারের মতো সে হো হো করে হেসে ফেলল।

লোকটি খুশি হয়ে মজা করে বলল, 'কী খোকা! আমার আল্লা তুমার মুখে কীরকম হাসি আইন্যা দিল দ্যাখলা!'

প্রতীক উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'মাছগুলো ভারি দুষ্টু তো! ওদের একটু বকে দেব নাকি?'

লোকটি বলল, 'সেইটা তুমার কথা। আনন্দও তুমার। মাছগুলানও তুমার। তুমি ওরারে আদর করব্যা না বকবা, সেইটা আমারে জিগাও ক্যান খোকা?'

প্রতীক বলল, 'আচ্ছা কাকু, এই যে মাছগুলো আমাকে দেখে-দেখে চলে যাচ্ছে, ওরা ওদের বন্ধুদের সঙ্গে দেখাটেখা করে, আমি ওদের অপেক্ষায় এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি কিনা, তা দেখার জন্য আবার এখানে ফিরে আসবে না?'

লোকটি বলল, 'ক্যান আইব না? হেরা তুমার বন্ধু হইয়্যা গেছে। দ্যাখবা, ঠিক তুমারে খুঁজতে আইব। কিন্তু তুমি কী তারারে চিনতে পারবা? মাছগুলানের চেহারা যে এক!'

প্রতীক চিন্তিত হয়ে বলল, 'তাহলে কী হবে এখন?'

লোকটি তার কথার কোনো জবাব না-দিয়ে ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলে জলের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কৌতূহলী হয়ে প্রতীকও জলের দিকে চোখ ফেরাল। সে মুগ্ধ হয়ে দেখল, তাদের সামনে একঝাঁক মাছ। মানুষের মতো মাছেদের চেহারা আলাদা-আলাদা হয় না ঠিকই, কিন্তু প্রতীকের দৃঢ় বিশ্বাস, একটু আগে যে দশ-পনেরোটা মাছকে সে জলের মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছিল, তারা ওই ঝাঁকের মধ্যেই মিশে আছে। তাদের এক-দুটোকে যেন সে চিনতেও পারছে! তার কেবলই মনে হচ্ছে, তার ছেড়ে দেওয়া মাছগুলো তাদের বন্ধুবান্ধব সমেত তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

লোকটির চোখ বিস্ফারিত। মাছগুলোকে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে দেখতে স্বগতোক্তির মতো করে বলতে লাগল, 'হে আল্লা, এই কাণ্ড আমি জীবনে দেখি নাই! মাছগুলান পোলাডারে ভালোবাইস্যা আবার ফির‍্যা আইছে!'

মাছগুলো প্রতীকের দিকে ঢ্যাবঢ্যাব করে তাকিয়ে দেখছিল। তাদের হালকা শরীরগুলো পুকুরের জলতরঙ্গে তিরতির করে কাঁপছিল। এমন সময় আচমকা কাছেপিঠে কোথা থেকে একটা মস্ত গর্জন ভেসে এল—হুম-আঁ। সঙ্গে-সঙ্গে মাছগুলো ভয় পেয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটে পালিয়ে গেল। পুকুরের চারপাশের বড়ো বড়ো গাছগুলোতে এতক্ষণ

যে-সমস্ত পাখিরা বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, তারা এবার অদ্ভুতভাবে কিচিরমিচির করতে করতে আকাশে পাক খেতে লাগল। দূরে অনেকগুলি কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠল।

লোকটি পিঠ টানটান করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর সন্ত্রস্ত মুখে দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগাল। তখন আবারও উঠল সেই বীভৎস গর্জন—হম-আঁ। তা শুনে লোকটি ভয়ার্ত গলায় বলল, 'হে আল্লা, বাঘ এইখানে কী কইর‍্যা?' তারপরই সে প্রতীকের ডান হাত শক্ত করে ধরে, ঘুরে, পাড়ের দিকে এগোতে থাকল।

প্রতীক অবাক হয়ে বলল, 'আপনি কাকু বাঘের কথা বলছেন? কিন্তু বাঘ এখানে কী করে আসবে? ওরা তো জঙ্গালে থাকে।'

লোকটি তার দিকে না-তাকিয়েই বড়ো বড়ো পা ফেলে হাঁটতে-হাঁটতে বলল, 'জঙ্গাল কী আর আইজ জঙ্গাল আছে? সবই তো মাইনসের দল দখল কইর‍্যা ফেলছে। বাঘের আর দুষ কী? হেরা যাইব কই? মাইনসের সমাজে নাইম্যা আইছে তাই।'

ওরা ইতিমধ্যেই জল থেকে উঠে, পুকুরপাড় পেরিয়ে পিচের সরু রাস্তায় উঠে এসেছে। কয়েকজন মহিলা 'বাঘ-বাঘ' চিৎকার করতে-করতে বাঁদিকে মন্দিরের দিকে ছুটে গেল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'খোকা, তুমার ঘর কুনখানে কও দেহি।'

প্রতীকের ঝলমলে চোখমুখটা হঠাৎ করে যেন নিভে গেল। সে সংক্ষিপ্ত করে জবাব দিল, 'জানি না।'

লোকটি তুমুল ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'অমা, ইটা কীরকম কথা। আইচ্ছা হইব। তুমি অহন আমার লগে চলো। তুমারে একা ছাড়ন যাইত না। পরে তুমারে বাড়ি দিয়া আসুম।'

প্রতীক অবশ্য এই কথার কোনো বিরোধ করল না। সে লোকটার সঙ্গে সঙ্গে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল।

লোকটি নিজের মনে বলতে লাগল, 'বাঘের পেটে ক্ষুধা। আইজ কারে নিব কে জানে!'

প্রতীক অবশ্য সেই কথার কোনো মানে বের করতে পারল না। সে ভাবতে লাগল, বাঘ মানুষ খায়, একথা সে জানে। কিন্তু সে মানুষকে তুলে নিয়ে যাবে কেন? বাঘ কী আজকাল মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছে?

এমন সময় ফের সেই ডাক—হুম-আঁ।

কিন্তু এবার ডাকটা এত কাছ থেকে শোনা গেল যে, গর্জনের তীব্রতা আর ভয়ের মিশেলে ওদের দুজনেরই শরীর কেঁপে উঠল। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটি প্রতীকের হাত আরও শক্ত করে ধরে, বাঘের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার জন্য অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর তাকে নিয়ে যে-ই ডানদিকে পালাতে যাবে, ঠিক সে-সময় বাঁদিকের সরু গলিটা থেকে অনেক মানুষের গুঞ্জন আর আর্তনাদ ভেসে এল। অতঃপর তাদের আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

লোকটি এবার সেই গলির দিকে পা বাড়াল। পিছন-পিছন প্রতীক। তাদের বেশিদূর এগোতে হল না। একটু গিয়েই তারা একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্যের মুখোমুখি হল। ঘটনাটা একই সঙ্গে দারুণ ভয়ংকরও বটে।

গলির মধ্যে একটি টাইপ ওয়ান রেল কোয়ার্টার। তার খোলা দরজা ও জানলার সামনে লাঠি হাতে অজস্র মানুষের জমায়েত। তাদের হইহই রইরই চিৎকারে কান পাতা দায়। এরই মাঝখানে কয়েকজন মহিলা বিলাপ করছে।

লোকটির পিছন-পিছন প্রতীকও সেই ভিড়ের কাছে এগোল। তারপর সেই কোয়ার্টারের খোলা জানলা দিয়ে যা দেখতে পেল, তাতে গোটা শরীর হিম হবার উপক্রম হল।

ঘরের ভিতর একটি বিছানা। সেখানে শুয়ে আছে একটি এক-দেড় বছরের শিশু। আর সেই বিছানার সামনে, নীচে বসে আছে একটি মস্ত বাঘ। শিশুটি মোটেও ভয় পায়নি। সে শুয়ে-শুয়ে একবার বাঘটাকে দেখছে, আরেকবার জানলার বাইরের অস্থির মানুষদের দেখছে। তার চেয়েও বড়ো আশ্চর্যের, বাঘটা বাচ্চাটার কাছে বসে আছে, অথচ তাঁকে ছুঁচ্ছে না। আক্রমণও করছে না।

বাইরের মহিলাদের মধ্যে একজন পাগলের মতো কাঁদতে-কাঁদতে বলছে, 'আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ও আমার বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলবে। ওটাকে মারুন।'

মানুষও কী চুপ করে বসে আছে? যেই দরজা দিয়ে লাঠি হাতে কেউ ঢুকে পড়তে চাইছে, অমনি বাঘটা 'হুম-আঁ' গর্জন তুলে তার দিকে তেড়ে আসছে। ফলে কেউ আর ভিতরে ঢোকার সাহস করছে না।

এরই মধ্যে দু-একজন বলাবলি করতে লাগল যে, বাঘটার নাকি একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে। তাতেই তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে ওভাবে বাচ্চাটার সামনে কেন যে বসে আছে বাঘটা, কেউ তার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছে না। অনেকেই উপায়ান্তর না—পেয়ে অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে, একে-তাকে ডাকছে। তবু কিছুতেই বাঘের সামনে থেকে বাচ্চাটাকে উদ্ধারের মতো কোনো উপায় মিলছে না। মাছধরা লোকটিও হঠাৎ করে কখন যেন সেই দলে মিশে গিয়ে ছোটাছুটিতে লেগে গেছে।

ভিড়ের ওই হুলুস্থূল পরিবেশের মধ্যে, এর-তার ধাক্কা খেতে-খেতে, অনেকগুলি মানুষকণ্ঠের একত্র কান্না আর আতঙ্কের কথা শুনতে-শুনতে, অনেকক্ষণ ধরে কী-একটা কথা যেন প্রতীক মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তার একটু বাদেই হঠাৎ তাকে ভিড় থেকে বেরিয়ে গলির রাস্তার দিকে ছুটে যেতে দেখা গেল।

পাণ্ডু লোকনাথ মন্দিরের পাশের বাগানে, সেই ঘণ্টা-দুয়েক আগে দেখে যাবার মতো করেই, এখনও দিব্যি খেলা করে চলেছে খয়েরি, কালো আর হলুদ রঙের বিড়ালছানা তিনটি। বাচ্চাগুলো যাতে ভয় না-পায়, সেইমতো পা টিপে-টিপে সেদিকে এগিয়ে গেল প্রতীক। খুব কাছ থেকে

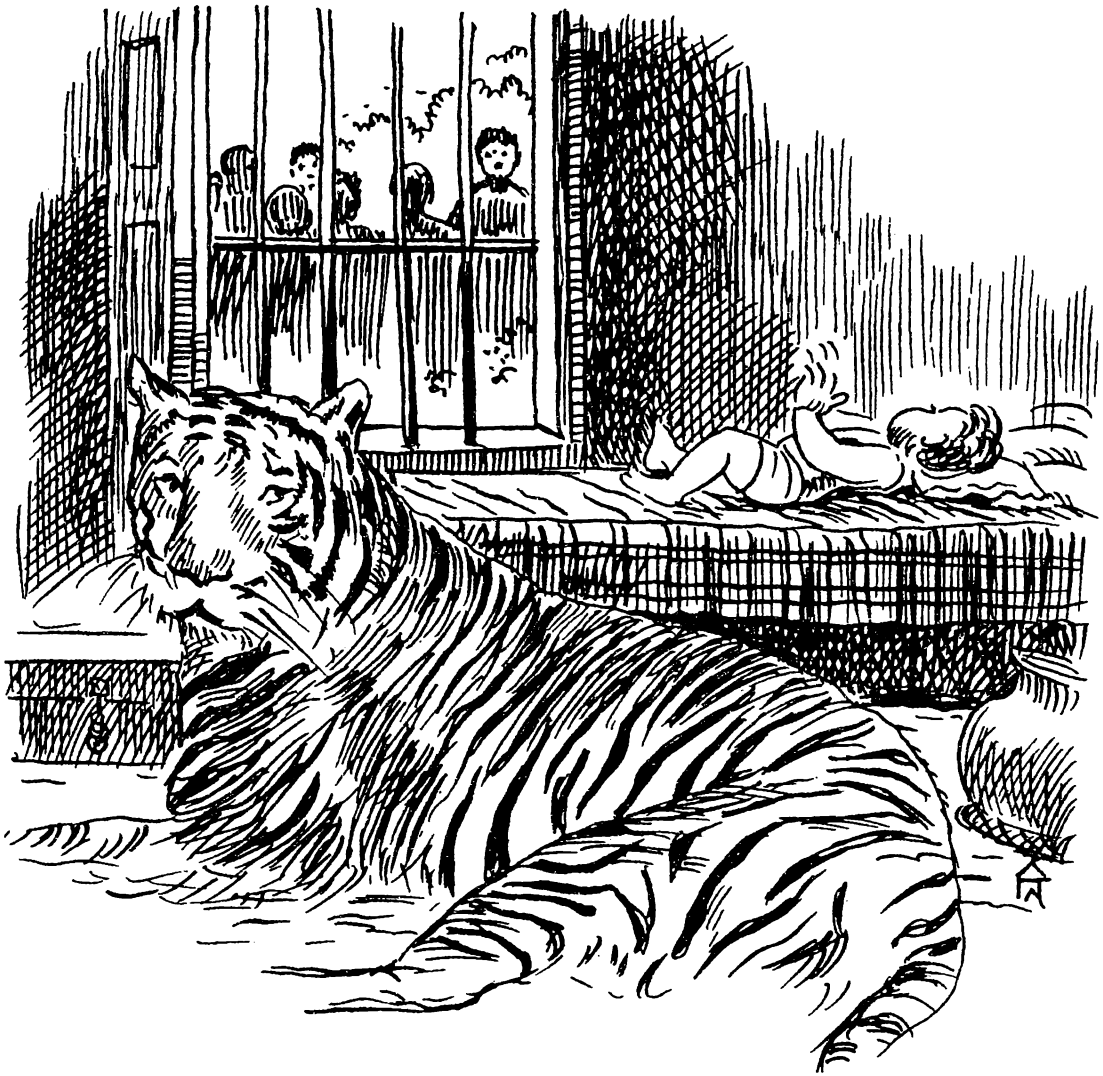

হলুদ বাচ্চাটাকে লক্ষ করে দেখল, তার শরীরে হলুদের উপর ডোরাকাটা অনেকগুলো কালো রেখা। সে যেটা ভেবেছিল, সেটাই ঠিক। দুটো বিড়ালের বাচ্চার সঙ্গে সেই কখন থেকে একমনে খেলা করে চলেছে একটি বাঘের বাচ্চা। বাঘের বাচ্চাটা তার মা-কে হারিয়ে ফেলার পর সম্ভবত খুঁজে পেয়েছে দুজন পরম বন্ধু।

প্রতীক আর দেরি করল না। বাঘের বাচ্চাটাকে মাটি থেকে কোলে তুলে নিল। এই আকস্মিক

ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিড়ালের বাচ্চা-দুটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। সেই দু-জোড়া চোখের দৃষ্টিতে ঠিক কী লেখা ছিল, তা পড়ে নেবার মতো সময় অবশ্য ছিল না প্রতীকের হাতে। সে ছুটে গেল তিনকোনা পুকুর-সংলগ্ন পিচরাস্তার দিকে।

টাইপওয়ান সেই রেল কোয়ার্টারের সামনে ইতিমধ্যে ভিড় আরও বেড়ে গেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে চিৎকার- চেঁচামেচি আর কান্না। প্রতীকের অবশ্য কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বাচ্চাটাকে শার্টের নীচে আড়াল করে ভিড়ের মধ্যিখানে ঢুকে পড়ল। সে কোনোক্রমে দরজার সামনে পৌঁছে গেলেই বাচ্চাটাকে ঘরের ভেতরে ছেড়ে দেবে। কিন্তু দেখা গেল, সেটা সে কিছুতেই করে উঠতে পারছে না। একেই তো সে ছোটো। তার ওপর এত মানুষের ভিড়। প্রতীক তবু হার মানল না। সে বারবার এগোনোর চেষ্টা করে যেতে লাগল। আর এই চেষ্টার ফলশ্রুতিতেই হঠাৎ এক ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ভিড়ের প্রবল ধাক্কায় টাল সামলাতে না-পেরে প্রতীক দরজা ডিঙিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ল। বাঘ তার দিকে ফিরে তীব্র হুংকার ছাড়ল—হুম-আঁ। উদ্যত বাঘটির সঙ্গে প্রতীকের ব্যবধান মাত্র পাঁচ হাত। যেকোনো মুহূর্তে বাঘটি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতক্ষণে তার শরীর কাঁপতে শুরু করল। সে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু পারল না। বাঘটি আবার গর্জন করে উঠতেই প্রতীক জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

একটু বাদে যখন চেতনা ফিরল, প্রতীক দেখল, সে একটি বিছানায় শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে অনেকগুলি মুখ তার উপর ঝুঁকে আছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসে চিৎকার করে উঠল, 'বাঘ!'

তার কথা শুনে একটা লোক বলে উঠল, 'বাঘটা সেই কখন তার বাচ্চাকে নিয়ে চলে গেছে। বাব্বা! তোমার যা সাহস!'

একজন মহিলা ভিড় ঠেলে তার দিকে এগিয়ে এল। তার চুল ও শাড়ি অবিন্যস্ত। চোখের নীচে জলের ধারা। কোলে একটি শিশু। শিশুটিকে ঠিক চিনতে পারল প্রতীক। এই বাচ্চাটাকেই বাঘটা ঘরের মধ্যে বন্দি করে রেখেছিল। তাহলে বাচ্চাটার কোনো ক্ষতি হয়নি! স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল প্রতীক। মহিলাটি বলছে, 'বাবা, আজ তুমি যে আমার কী উপকার করলে! আমার সোনাটাকে ফিরিয়ে এনে দিয়ে কী যে উপকার...' —কথা শেষ করতে না-পেরেই মহিলাটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আবারও।

প্রতীক দেখল, সেই মাছধরা লোকটিও তার কাছেপিঠেই দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি এবার এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রাখল। প্রতীক তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে?'

লোকটি বলল, 'তুমি হইল্যা আল্লার দোয়া। তুমারে রাইখ্যা আমি আর যামু কই। আইচ্ছা, একটা কথা কও দেখি, ওই বাঘের বাচ্চাটারে তুমি পাইলা কই?'

প্রতীক বলল, 'আমি তো সকালে আসার সময়ই দেখেছিলাম, ও দুটো বিড়ালের বাচ্চার সঙ্গে খেলছে মন্দিরের বাগানে।'

লোকটি বলল, 'বাঘটা যখন তুমার উপর প্রায় লাফ দিয়াই ফালছে, আমি চোখ বুইজ্যা, দুই হাত তুইল্যা আল্লারে কইলাম, আল্লা, পোলাডারে বাঁচাও। তারপর চায়া দেখি, তুমার জামার তল থেইক্যা কুঁ-কুঁ করতে-করতে একটা বাঘের বাচ্চা বার হইয়্যা বাঘটার দিকে দৌড়াইয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই বাঘটার রাগ পইড়্যা গেল। অমা, বাচ্চাটারে জিভ দিয়া চাইট্যা-চাইট্যা বাঘটা কী আদর করল! মাইনসের বাচ্চাও বুধহয় অত আদর পায় না। তারপর বাচ্চাডার ঘাড়ে কামড় দিয়া তুইল্যা লইয়া বাঘটা সুড়সুড় কইর‍্যা দরজ্যা দিয়া বারইয়া পিছনের জঙ্গালের দিকে পালাইয়া গেল। কিন্তু তুমি কী ভাইব্যা বাচ্চাডারে লইয়্যা ঘরে ঢুইক্যা পড়লা খোকা, কও অহন দেহি?'

প্রতীক বলল, 'আমি বাঘটার মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, ওর বাচ্চাটাকে ফিরে পেলেই সে এখান থেকে চলে যাবে।'

এমন সময় ভিড় ঠেলে প্রতীকের সামনে হুড়মুড় করে এসে পড়ল তারা বাবা-মা। মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, 'রেজাল্ট খারাপ হয়েছে বলে বাবা না-হয় একটু বেশিই বকাবকি করে ফেলেছেন। তাই বলে রাগ করে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে একেবারে বাঘের কাছে চলে এলে? এটা তুমি কী করলে বাবাই?'

বাবা প্রতীকের পিঠে হাত রেখে বলল, 'আমাকে তুই ক্ষমা করে দে বাবাই। আমি ভুল ভাবছিলাম। আমি তোকে অকর্মণ্য বলেছিলাম। কিন্তু আজ তুই যে কাজটা করলি, নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে একটা বাচ্চাকে বাঁচালি, তাতে তোর বাবা হিসেবে আমি গর্বিত। তুই পরীক্ষায় ফেল করেও আজ আমাদের সবার মধ্যে ফার্স্ট। চল্ বাবাই, এবার বাড়ি চল্।'

প্রতীক একে-একে তার মা ও বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে কী যেন দেখল। তারপর সেই মাছধরা লোকটির দিকে ফিরে, বিছানা থেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে নামতে-নামতে বলল, 'আমাকে প্লিজ ওই পুকুরে নিয়ে চলো। মাছগুলো তখন বাঘের ডাকে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। ওদের সঙ্গে আমার অনেক-অনেক কথা বলবার আছে!'

বুদ্ধদেব গুহর জন্ম ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন কলকাতায়।

বুদ্ধদেব গুহর জঙ্গল আর শিকার কাহিনি বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

পূর্বভারতের বনজঙ্গল, পশুপাখি ও বনের মানুষদের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের নিকট পরিচয়। তিনি অনেক দিন বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আফ্রিকার জঙ্গলেও ঘুরে এসেছেন।

পেশার দিক থেকে তিনি একজন বিখ্যাত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগের বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড ও পর্যটন বিভাগের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য পদ অলংকৃত করেছেন। তাঁর আরণ্যক অভিজ্ঞতায় সৃষ্ট চরিত্র ঋজুদা বাঙালি পাঠকের কাছে খুবই জনপ্রিয়। ছোটোদের জন্যে তাঁর প্রথম বই *ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিল।

জঙ্গলপ্রেমী এমন মানুষটি সতর্কতার সঙ্গে এই বইয়ের পঁচিশটি জমজমাট বাঘের গল্প বেছে দিয়েছেন শুধুমাত্র পাঠকের মনোরঞ্জনের কথা মাথায় রেখে। প্রবীণ ও নবীন লেখকদের বাছাই করা এই গল্পগুলি পাঠক মুগ্ধ হয়ে পড়বেন, আমাদের এমনই বিশ্বাস।

একনিশ্বাসে পাঠকের পড়ে ফেলার মতো বাঘের গল্প নিয়ে এমন রোমাঞ্চকর সংকলন

শিবরাম চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার,
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়,
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ,
শৈলেন ঘোষ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়,
নির্বেদ রায়, এরকম পঁচিশজন লেখকের
কলমে রোমাঞ্চকর পঁচিশটি মনকাড়া
বাঘের গল্পের এই সংকলন।

Parul Prakashani Pvt Ltd
ISBN 978-93-82300-72-4
9 789382 300724
₹ 150.00
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
নির্মলেন্দু মণ্ডল